Biswakosh Prabartak Rangalal Mukhapadhaya Smaranika Edited by Sirajul Haque

প্রকাশক : বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি
লাভপুর, বীরভূম

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : সিরাজুল হক

মুদ্রণ সৌকর্যে : এমদাদুল হক নূর

প্রকাশকাল : রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১৫৭ তম স্মরণোৎসব দিবস
১ অক্টোবর ১৯৮৯, ১৪ আশ্বিন ১৩৯৬ রবিবার

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

আলোক চিত্র : বদরুদ্দোজা মল্লিক চিত্র নিকেতন-বোলপুর,
লাভপুর চিত্রকলা স্টুডিও, লাভপুর মা ফুল্লরা স্টুডিও বীরভূম

মুদ্রণ :
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪ / ১ই বিডন রো, কলিকাতা-৬

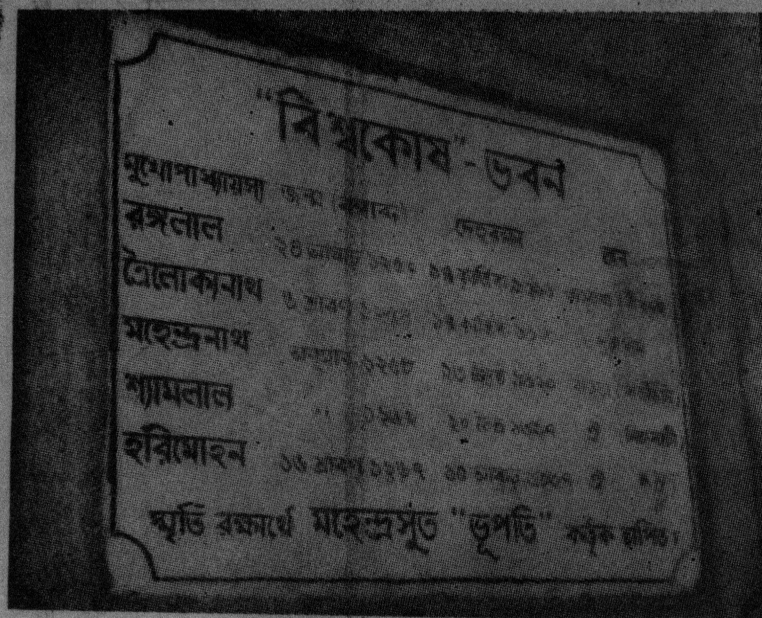


রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় জন্ম ঃ ১২৫০ বঙ্গাব্দ, ২৪ আষাঢ় স্থান ঃ রাহুতা, ২৪ পরগণা
মৃত্যু ঃ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ১৭ কার্তিক স্থান ঃ লাঘোষা, থানা—লাভপুর, বীরভূম



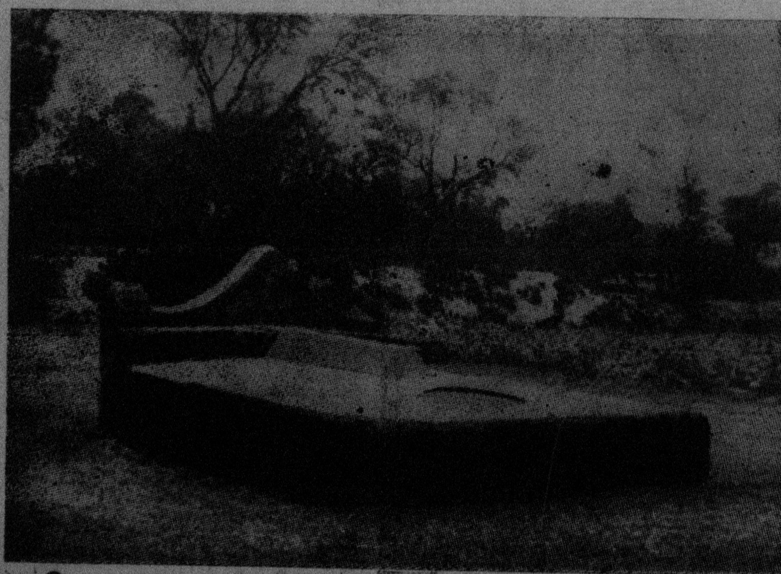
রঙ্গলালের ব্যবহৃত পাথরের থালা গ্লাস ও পূজার কুশাকুশি।

সূচীপত্র



রাহুতায় আজও বিদ্যমান বিশ্বকোষের নামাঙ্কিত 'বিশ্বকোষ ভবন'-এর প্রাচীর গাত্রের মর্মরফলক ।

আলোকচিত্র ঃ বদরুদ্দোজা মল্লিক, অ্যাডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট, তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯



দাঁড়কা গ্রামে রঙ্গলালের মরদেহ ধারী সমাধি বেদী ।

[illegible]

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের হস্তলিপি। এটি দিবাকর পানের সৌজন্যে

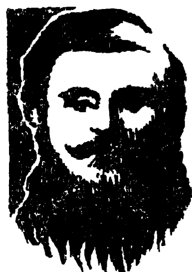


শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্র ভবনের প্রধান শিল্পী শ্রীসোমেন
অধিকারী নির্মিত রঙ্গলালের প্রতিমূর্তি।



লাঘোষা গ্রামে এই খানেই ছিল একদিন তাঁর
চিকিৎসালয় ও শব ব্যবচ্ছাদাগার।

সম্পাদকের নিবেদন



রীতি-অনুসারে স্মরণিকা সম্পাদকের ভূমিকা একটি বরণীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়িকার আনুষ্ঠানিক সসম্ভ্রম উপস্থাপনা এবং এতদ্দুদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের বিদ্বজ্জন সমীপে অনুরোধ-উপরোধক্রমে আমন্ত্রিত ও সমাহৃত রচনাবলীর যথাযথ বিন্যাসকরণ এবং সেগুলি মুদ্রিতাকারে দেশবাসী ও সুধীজন সমীপে পরিবেশন করা। অথবা চয়নকৃত নানা রঙের নানা সুরভির একগুচ্ছ পুষ্পের একটি মালিকাগ্রন্থনের শিল্পকর্ম। এ-ব্যাপারে আমার অযোগ্যতা সুপ্রচুর জেনে-ও তা'তে আমি হস্তক্ষেপ করেছি, আত্মনিয়োগ করেছি এবং সেকাজে প্রথমাবধি নিরন্তর একটা দুর্নিবার তাগিদও অনুভব করেছি অলক্ষ্য এক মহাশক্তির আধার থেকে—হয়ত তাঁর অমোঘ বিধানে সেই গুরুদায়িত্বভার এক এসে সময় পড়ল এই অভাজনের দুর্বল স্কন্ধে—দীর্ঘ আশি বৎসর পর; শতাব্দীর এক সংক্রান্তীয় সীমারেখায়। সার্বভৌমিক জ্ঞান বা নিখিলশাস্ত্রবিষয়ক অভিধান, বঙ্গভাষায় 'বিশ্বকোষ' নামক এক মহাগ্রন্থের প্রবর্তক, কাব্যরত্নাকর মহাত্মা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৩৭তম স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত আজিকার এই স্মারকগ্রন্থটি কোন একজন স্বনামখ্যাত সাহিত্যসাধক কর্তৃক সম্পাদিত হলে তা' হ'ত অধিকতর গৌরবময় ও মহিমোজ্জ্বল। এটা আমার বৈষ্ণবোচিত কোনো বিনয়বচন নয়; এটা আমার একান্ত অন্তর-কথারই উন্মোচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই মহৎকর্মে কোন একজন সহৃদয় মানষীপ্রবরকে এগিয়ে আসতে অথবা যোগ্যতর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখিনি। সুতরাং সাহিত্যের শাহী দরবারে 'দীন যথা যায় রাজেন্দ্র সঙ্গমে দূর তীর্থ দরশনে' এই ভীরু ও সঙ্কোচ—সমীহভারাবনত মানসিকতা সম্বল করে বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণিকা নির্মিতিতে আমার এ সঙ্কুণ্ঠ কিঞ্চিৎ প্রয়াস-প্রচেষ্টা। এই যখন অবস্থা তখন অনন্যোপায় হয়ে লক্ষ্য করেছি সার্বিক অবক্ষয়প্রাপ্ত বর্তমান লোকসমাজে বুদ্ধিজীবিগণ শুধুমাত্র কমলার প্রসাদ লাভ ও লোভের বশবর্তী দিন রাত্রিই। অর্থসর্বস্বজীবন এবং আর্থিক কৌলিন্য অর্জনের ধ্যানধান্দা গ্রাস করেছে সমগ্র মনুষ্যসমাজের শুভ বুদ্ধিকে শুভ চেতনাকে। তৎস্থলে দেখা দিয়েছে ঢালাও সংস্কৃতিহীনতার প্রতি প্রবল আসক্তি, অনুক্ষণ আত্মোন্নতির চিন্তাভাবনা, বিচ্ছিন্ন ভোগ আর বিলাসব্যসনাসক্তির অসুস্থ



১৯৮৩ সালে ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'দাঁড়কা গ্রামের কথা' শীর্ষক বেতার অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীবৃন্দ। উপবিষ্ট বাঁ দিক হতেঃ চতুর্থ—গ্রন্থক ও কথক সিরাজুল হক, পঞ্চম সঙ্গীত শিল্পী পূরবিকা মুখোপাধ্যায়।



লাঘোষা গ্রামের পথের ধারে রঙ্গলালের সমাধি।

প্রতিযোগিতা—চাই-আরও চাই—আরও-আরও। সন্তোষ নাই। নিবৃত্তি নাই। সেই সঙ্গে সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে নিদারুণ অনীহা, তার দায়দায়িত্ব থেকে সুকৌশলে পলায়নপর এক পরমাশ্চর্য্য মনোভাব। মানুষ যেহেতু একটি সামাজিক সৃষ্টি অতএব সমাজ ও জাতির কাছে সে অবশ্যই দায়বদ্ধ; কেউ-ই স্বয়ংকৃত অথবা স্বয়ংসিদ্ধ নয়, ঋণী। বিশেষতঃ তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণীর একথা মনে রাখা উচিত অথচ সামাজিক তথা জাতীয় ঋণপরিশোধে তাঁরা ভয়ানক পরাঙ্মুখ। পূজ্যপূজার ক্ষেত্রে তো বটেই। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রকাব্যের আশ্রয় নিয়ে আমার মনে হয়েছে, "সংসারে সবাই যবে শতকর্মে রত, তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত সারাদিন বাজাইলি বাঁশী।" সবারে আহ্বানের সেই বংশীবাদন একদিন, দু'দিন নয়—দীর্ঘ দুটি বছর ধ'রেই। আশানুরূপ না হলেও যাঁরা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাসকে ভালবেসে, প্রীতিভরে স্নেহভরে সাড়া দিয়েছেন তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধেয়া, বরেণ্য-বরণীয়া, তাঁদের অন্তরস্পর্শী সাহায্য-সহানুভূতি-সহযোগিতা শুভাকাঙ্ক্ষা-শুভাশীষ লাভ ক'রে আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

আমার যে ক'টি কথা ছিল বলার তার হয়ত এইখানেই ইতি করা যেত, পূর্ণচ্ছেদ টানা যেত। কিন্তু না। আরও কিছু বলার আছে নইলে নিজের কাছে নিজেরই ক্ষুদ্রমনের গ্লানি বহন করতে হবে। অকৃতজ্ঞ হওয়ার দায় থেকে মুক্ত হতে চাই। সেগুলি হল এই:

রঙ্গলাল অজ্ঞাত! বলতে পারি সর্বথা। বাংলা সাহিত্য জগতের খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির কাছে শুধুমাত্র তাঁর নামটিই জানা। লাভপুর ও সন্নিহিত এলাকার মানুষের কাছে রঙ্গলাল সবিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ডাক্তার হিসাবে—সামগ্রিকভাবে নয়। সেল্‌ফ্‌মেডম্যান—আত্মসাধনাকৃত একটি উজ্জ্বল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মেডিকেল স্কুল কলেজে নিয়মমাফিক পড়াশুনা না করেও ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক—শারীরবিজ্ঞানী। কিন্তু আর একটি অমরকীর্তির দিক আছে তাঁর জীবন সাধনায়। পূর্বাপর চিন্তা করে দেখলে বিরল দৃষ্টান্ত, অভাবনীয়, বিস্ময়কর. সেই দিকটি সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়,—যাঁদের জানা উচিত ছিল তাঁরাও তাঁকে অজ্ঞাতবাসে অথবা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ লিপিবদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ক্ষেত্রে—নবীনদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু প্রবীণদের মধ্যে স্বনামেই খ্যাতকীর্তি কবি সাহিত্যিক সমালোচক পণ্ডিত গবেষক আচার্য্য যাঁরা, তাঁরাও রঙ্গলাল সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকি-বহাল নন ব'লে স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করলেন যখন, তখন একটি ঘোরতর



বরেণ্য কবি স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বজনাদৃত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতনের বাস ভবন 'কর্ণিকায়' গৃহীত—ডান দিকে সিরাজুল হক, বাম পার্শ্বে প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়।



কলালের মূর্তির নির্মাণরত সৌমেন অধিকারী মার্চ ১৯৮৬

সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল আমাদের। এতে অবশ্য অগৌরব বোধ করার কিছু নাই তবে যে-ঘরে বাস করা সে ঘরটিই ফাঁকা। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ-উৎসব করতে হবে অথচ তাঁর জীবন ও সাহিত্যসাধনার চিত্র তুলে ধরা যাবে না জনসমক্ষে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে? প্রশ্নটি রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠল আমাদের কাছে। বীরভূমের বেদব্যাস পণ্ডিত-প্রবর হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের 'বীরভূম বিবরণ' এ 'তাঁর কবিত্বশক্তির পরিমাপ করেছেন দুটি কবিতায়/যেমন, 'একদিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই,/কহিলেন, শুন শুন প্রাণের কানাই। ইত্যাদি, আর 'গোদাপতি বাম-বিধি দিলেন আমায়,/ গোদের ভারেতে সদা প্রাণ যায়।/ নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাঁড় শশা-ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সুবিপুল বহুমুখী সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্যায়ন বটে! অতএব শরণাপন্ন হলাম প্রাচীন বই-পত্রের সযত্ন সংরক্ষিত ধনাগার আলীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের। এইখানেই পেলাম রঙ্গলালকে। রঙ্গলাল স্মরণোৎসবের একান্ত প্রযোজনীয়তার আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে আলীপুর জাতীয় গ্রন্থাগারের মাননীয় ডিরেক্টর ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, মাননীয়া গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্তা কল্পনা দাসগুপ্তা রঙ্গলাল লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও শতবর্ষ পূর্বের পত্র-পত্রিকা দেখতে পড়তে অনুমতি দিয়েই কর্ত্তব্য সম্পাদন করলেন না, দিলেন তাঁর রচনাগুলির যান্ত্রিক অনুলিপি আর মাইক্রোফিল্ম। আর এ-কাজে পরম আন্তরিকতা সহকারে সাহায্য করলেন সহ-গ্রন্থাগারিক সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল মৈত্র, ব্যোমকেশ মাইতি, হরিশ চক্রবর্ত্তী ও মাইক্রোফিল্ম ফটোগ্রাফার মিঃ কোটনালা। রঙ্গলাল রচনার দুষ্প্রাপ্যতার ব্যাপারে ছিলাম কাঙাল, হলাম ধনী। এঁদের সকলের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপ সহানুভূতি লাভ করেছি শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেনের কাছ থেকে। পুনঃ পুনঃ যখনই গিয়েছি তিনি খুব তৎপরতার সঙ্গেই যান্ত্রিক অনুলিপি করিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ রইল। বলাবাহুল্য, এইসব রঙ্গলাল বিষয়ক কাগজপত্র না পেলে আলোচ্য স্মরণিকার পরিকাঠামো তৈরী করা মোটেই যেত না, করা যেত না তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ। কাজেই আজকে স্মরনিকাটি উপস্থাপন করার যে সৌভাগ্য আমাদের হল তার উৎসশক্তির যোগানদার উপরোক্ত শ্রদ্ধাস্পদগণই।

স্মরনিকায় আলোকচিত্রগ্রহণকারী জনাব বদরুদ্দোহা মল্লিক সাহেবের



বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি সমিতির সদস্যবৃন্দ। উপবিষ্ট ডান দিক হতেঃ সহসভাপতি অধ্যাপক সুভাষ মহান্তি, সম্পাদক সিরাজুল হক, কল্যাণী রাণা, বদরুদ্দোজা মল্লিক ও অপূর্ব কৃষ্ণ সিংহ।

সাহায্য সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আইন ব্যবসায়ী তিনি সুতরাং তাঁর পেশাসুলভ দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রামাণ্য ছবিগুলি অধিকতর, প্রমাণপঞ্জী সম্বলিত করতে নিজের অর্থকরী মূল্যবান সময় ব্যয় করে 'লাখোবা' ও 'রাহুতায়' গিয়ে পরমযত্ন নিয়েই ছবিগুলি তুলে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলেন।

জীবন ও জীবিকার তাগিদে সদা কর্মব্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় থেকেও রঙ্গলাল বিষয়ক রচনাদির মুদ্রণরূপ দেওয়ার কলকাতায় যাবতীয় যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মুদ্রক নির্বাচন, ব্লক নির্মাণ দুরূহ প্রুফ দর্শন ইত্যাদি কাজগুলি অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন স্নেহভাজন তরুণ সাহিত্যসেবী এমদাদুল হক নূর। স্মরণিকার নিন্দা-স্তুতি যদি কিছু হয়; নিন্দার প্রাপ্তি আমারই আর স্তুতি যদি কিছু হয় সর্বাংশে তাঁরই। স্নেহভাজনকে অশেষ আশীর্বাদ জানাই তাঁর এই অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতির জন্য।

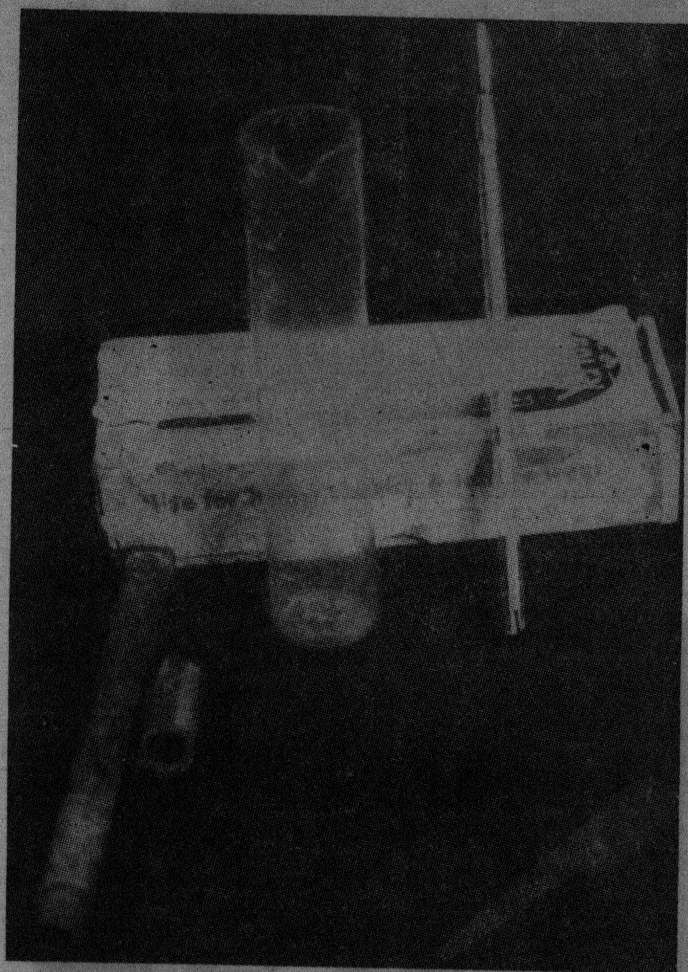
স্মরণিকা প্রকাশনায় যে সকল মাননীয় লেখক লেখিকা, শুভেচ্ছাবাণী ও মূল্যবান চিঠিপত্র দিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতিই রইল আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

স্মরণিকা প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভার নিয়ে আমি যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন অপ্রত্যাশিত আর্থিক সাহায্যের উদারহস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছেন প্যাটেলনগর মিনারেল প্রডাক্টসের কর্ণধার তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক শ্রীস্বপন ঘোষ মহাশয়/ বলাবাহুল্য, তাঁর সাহায্য না পেলে স্মরণিকাটি এরূপ সমৃদ্ধ-কলেবরে মোটেই বের করা যেত না। তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ধন্যবাদ জানাই, সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা ও এককালীন অর্থসাহায্যদাতৃগণকে— তাঁদের সাহায্য-সহানুভূতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মর্তব্য। তাঁদের প্রতিও আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে স্মরণিকা ছাপতে গিয়ে স্থানে স্থানে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে। এজন্য পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণেই ক্ষমা করবেন আশা করি। স্থানাভাববশতঃ কয়েকটি লেখা আমরা ছাপতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

কলকাতার নিউ ঘোষ প্রেসের কর্ণধার অনিলকুমার ঘোষ ও তার কর্মীবৃন্দ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম আর্ট ডিরেক্টর অমিয় ভট্টাচার্য স্মরণিকার প্রচ্ছদ অঙ্কনের সৌকর্যে যে প্রযত্ন নিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।



ডাক্তার রঙ্গলালের ব্যবহৃত থার্মোমিটার ও হাইড্রোমিটারের আলোকচিত্র। এ দুটি রঙ্গলালের ভ্রাতুষ্পৌত্রে শ্রীশৈলেন কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন এই স্থানের পাদদেশের ভূমিতে ছিল
একদিন গ্রাম বাংলার সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ যন্ত্রের গৃহটি।



১৩৯৫ সালে ২৪ শে আষাঢ় লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজ হতে বহির্গত
পদযাত্রী দল। ডানদিক হতে যথাক্রমে সিরাজুল হক, অরবিন্দ রায়
ও অধ্যাপক সুভাষ মহান্তি প্রমুখ।

শুভেচ্ছাবাণী

From

No. 293 ps

Shri Tapan Kumar Maitra

Addi. Secretary to the Hon'ble the Chief Justic,

High Court, Calcutta

Calcutta, the 2I. st. December 1988

To

Mr. Sirajul Haque,

Secretary,

Rangalal Mukherjee Smriti Samity,

Vill—Bamnigram,

P. O—Labpur,

Dist.—Birbhum.

Sir,

With reference to your letter dated 15th December, 1988. I am directed by the Hon'ble the Acting Chief Justice to send here with a Message dated 19th December, 1988 from his Lordship as desired in your letter under reference.

Thanking you,

Encl : As above.

Yours faithfully,

Addi. Secretary.

CHIEF JUSTICE HIGH COURT CALCUTTA

Calcutta

December 19, 1988.

MESSAGE

I am happy to know that Rangalal Mukherjee Smriti Samity of Labpur, Birbhum, is going to publish a souvenir containing the literary works of late Rangalal Mukherjee, who was a man of literary genious. Shri Rangalal Mukherjee is not only the author of the great Bengali Encyclopaedia 'Vishwakosh', but he was also a great poet, essayist, dramatist and biographer. The souvenir, if published, will be a valuable document of Bengali literature.

I highly appreciate the noble venture of the Smriti Samity and send my best wishes for the success of their efforts.

(Manashnath Roy)
Acting Chief Justic.

HIGH COURT CALCUTTA

Paritosh K. Mukherjee

21/2, Gorachand Road,
Calcutta – 14.
Phones : 29 – 1000
29—3865

December 22, 1988.

The Secretary,
Vishwakosh Prabartak Rangalal
Mukherjee Smiriti Samity,
Vill—Bamnigram, P O. Labpur,
District—Birbhum.

Dear Sir,

My message for the occasion is being sent separately.

However, I regret my inability for not being present due to some urgent pre-occupations.

Yours faithfully,
(Paritosh K. Mukherjee)
Judge,
High Court, Calcutta.

HIGH COURT CALCUTTA

Paritosh K. Mukherjee

21/2, Gorachand Road,
Calcutta – 14.
Phones : 29—1000
29—3865

December 22, 1988.

The Secretary,
Vishwakosh Prabartak Rangalal
Mukherjee Smiriti Samity,
Vill—Bamnigram, P. O. Labpur,
District – Birbhum.

I am glad to learn that Vishwakosh Prabartak Rangalal Mukherjee Smriti Samity has arranged a programme for ensuing commemoration of a great Bengali Literature Kavya Ratnakar Rangalal Mukhopadhyay, who has published Encyclopaedia (Vishwakosh) about 100 years back.

I also admire the attempt on the part of the organiser of the said Rangalal Mukherjee Smriti Samity that they have decided to publish a souvenir containing may articles from current poets, essayists, dramatics etc. which would be included in the said souvenir.

I wish all success of the said venture.

(Paritosh K. Mukherjee)
Judge,
High Court, Calcutta.

HIGH COURT CALCUTTA

Samir Kumar Mukherjee

৭ই পৌষ ১৩৯৫

শুভেচ্ছা

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখার্জী স্মৃতি সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁদের প্রস্তাবিত লেখক কবি প্রয়াত রঙ্গলালের ১৪৫তম স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত স্মারকগ্রন্থে আমার শুভেচ্ছা জানাতে। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর লেখনী সাহিত্য চর্চায় কখনও বিরত হয়নি। সে কোন জাতির তথা দেশের কৃষি ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তার অতীত দিনের গুণীজনের রচনা সম্ভার। লেখক বাগ্‌দেবীর বরপুত্র রঙ্গলাল বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন যদি না কৃষি ও সংস্কৃতির বর্তমান ধারক ও বাহকেরা এই অতীতের স্মৃতিটাকে রক্ষা করার প্রয়াস না করেন। সেই প্রয়োজনীয় কিন্তু দুরূহ কার্যভার গ্রহণ করে স্মৃতি সমিতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন বিশ্বপিতার আশীর্বাদ সমিতির সভ্যবৃন্দ ও কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই পাবেন আমি তাঁদের প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতি : জনাব সিরাজুল হক

HIGH COURT CALCUTTA

সামসুদ্দিন আহ্‌মদ ২৩.১২.৮৮

বিচারপতি

পরলোকগত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ বাঙালীর জীবনে প্রায় বিস্মৃত। বিরল প্রতিভা সম্পন্ন এই ব্যক্তিত্বকে আবার নূতন করে আমাদের কাছে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, একাধারে ধন্বন্তরি চিকিৎসক, কবি, চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বকোষের মত আকর গ্রন্থের রচয়িতাকে নূতন করে স্মরণ করা এবং শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

তাঁদের এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সামসুদ্দিন আহ্‌মদ

প্রতি : সিরাজুল হক

Syed S. A. Masud M. A. LL. B.
Barrister-At-Law
Former Judge, High Court
Calctta

Phone : 44-3541
15 Nasiruddin Road
Calcutta 700017

সাহিত্য-স্রষ্টারা দেশের মানুষকে শাশ্বত আদর্শ ও মূল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ; সেজন্য তাঁরা চিরস্মরণীয়। বিশ্ব-কোষ ও তাঁহার রচিত অন্য গ্রন্থ প্রকাশনে, শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর ১৪৫তম স্মরণোৎসবে যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা কৃতকার্য হোক এই কামনা করি।

এস, এ, মাসুদ

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮

শ্রী সিরাজুল হক

লাভপুর, বীরভূম

VIDYASAGAR UNIVERSITY
Midnapore

Phone : Mid.-2329

Prof. Manas Kumar Chatterjee
Vice-Chancellor

Residence
AD – 138
Saltlake
Calcutta-700064

Date 11. 10. 1988

Dear Sir,

I am glad to learn that your organisation have decided to compile and publish a souvenir containing different literary compositions of the great poet, Rangalal Mukherjee.

I wish the great endeavour of the organisation a grand success.

With heartful congratulations.

Yours sincerely,
(Prof. M. K. Chatterjee)

Shri Sirajul Haque,
Secretary,
Vishwakosh Prabartak,
Rangalal Mukherjee Smiriti Samity,
P. O. Labpur,
Dist. Birbhum.

D. O. No. DIR/40/554

NATIONAL LIBRARY

Prof. Ashin Das Cupta,
Director.

Belvedere
Calcutta-700027
21. 12. 1988

Dear Shri Haque,

I am glad to know that the Vishwkosh Prabartak Rangalal Mukherjee Smriti Samity is going to compile and publish a Souvenir containing the literary work of the great poet Rangalal Mukherjee. This is the kind of work which needs doing but for which there are no workers. I wish you all success in this laudable venture.

Yours sincerely,
Ashin Das Gupta

Shri Sirajul Haque,
Secretary,
Vishwakosh Prabartak
Rangalal Mukherjee Smiriti Samity,
Vill. Bamnigram, P. O. Labpur,
Dist. Birbhum.

NATIONAL LIBRARY

Belvedere
Calcutta-700027

Sm. Kalpana Dasgupta
LIBRARIAN **DEC 1988**

D. O. No. Lib/62/436

Dear Shri Haque,

This is response to your letter dated 6. 12. 88. Kindly see the attached note which self explanatory.

With regards,

Yours sincerely,

(Kalpana Dasgupta)

Shri Sirajul Haque
Secretary
Vishwakosh Prabartak Rangalal Mukherjee Smiriti Samity, Labpur, Birbhum.

NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

The Natioal Library has had the opportunity of of playing a very minor role in the commemoration celebration of the great Bengali Litterateur Kavy ratnakar Rangalal Mukherjee by giving some bibliographic help. I on behalf of the National Library consider this as our great privilege.

I fervently wish that the celebration organised by the Vishwakosh prabartak Rangalal Mukherjee Smiriti Samity will be a great success.

LABPUR

22. 1. 89

To

Sri Sirajul Haque

Secretary,

Biswakosh Prabatak Rangalal Smriti Samity,

Labpur.

Dear Sri Haque,

I am glad to learn that you are going to publish a Souvenir of the writings of the celebrated poet and litterateur late Rangalal Mukherjee as the noted initiater of Biswakosha. His commemoration celebration including the publication of this Souvenir will be a great achievement. He is remembered here as a wonderful physician, but he should be honoured and cherished in our hearts as a great literary creator as well. Your endeavours in this direction deserves commendation from all cultred Indians, particularly Bengalees.

Yours sincerely

Apurbo Krishna Sinha

Retired Headmaster

OFFICE OF THE
LABPUR PANCHAYET SAMITY
Labpur Birbhum.

লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি কার্য্যালয়

লাভপুর, বীরভূম

স্মারক নং তারিখ ২১/১/৮৯

সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান বা নিখিল শাস্ত্রবিষয়ক বৃহদাভিধান বিশ্বকোষের প্রবর্তক, কাব্য রত্নাকর, চিকিৎসাক্ষেত্রের প্রবাদ পুরুষ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৫তম স্মরণোৎসব প্রত্যাসন্ন—এটি বাঙলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের কাছে একটু সুসমাচার বিশেষ—এই সংবাদটি বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখাপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রী সিরাজুল হক মহাশয় যখন আমাকে জ্ঞাপন করলেন তখন যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল না হয়ে পারিনি। বিস্ময়বোধ জাগ্রত হওয়ার কারণ এই যে, এই মহামানুষটি এতদিন অজ্ঞাতই ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁর সার্বিক পরিচয় ও তাঁর কালজয়ী সৃষ্ট সাহিত্যের বিবরণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করার যে নিরলস প্রয়াস প্রচেষ্টা ও শ্রমস্বীকার ক'রে আসছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদেরই পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত লাঘোষা নামক গ্রামে তাঁর নরদেহধারী পবিত্র সমাধি বিদ্যমান। আমরা দেশবাসী তাঁর স্মৃতিতর্পণে অংশ গ্রহণ করতে পারছি, তার জন্য নিজেদের ধন্য মনে করি এবং রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মারকগ্রন্থ সর্বাঙ্গ সুন্দর হোক এই কামনা করি ; সেই সঙ্গে স্মরণোৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য।

প্রণব রায়
২১/১/৮৯
সভাপতি
লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি
লাভপুর, বীরভূম।

প্রতি : সিরাজুল হক

৪০/১ ট্যারা রোড, ব্লক ভি, ফ্ল্যাট-১২ : ৭০০০১৫

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রায় বিস্মৃত এই মনীষীর সামগ্রিক কাজকে সুধী সমাজে প্রকাশ করার যে নিরলস প্রচেষ্টা রঙ্গলাল জন্মোৎসব সমিতির সম্পাদক দীর্ঘদিন চালাচ্ছেন তা আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। যা আমাদের সকলের তা তিনি প্রায় এককভাবে করে চলেছেন। বীরভূমবাসী হিসেবে সেজন্যও আমি গর্বিত। অনুষ্ঠান সুন্দর সার্থক হোক।

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
(প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা)
২৬ মাঘ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

VISVA-BHARATI SANTINIKETAN 731235
West Bengal, India
Founded by Telephone : Bolpur 451 (6 lines)
Rabindranath Tagore

শুভেচ্ছা

একটি কথা ভাবতে ভারি ভালো লাগে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে ১৯৮৩ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে পল্লী-সংগঠন বিভাগ—বিশ্বভারতী প্রযোজিত শ্রীনিকেতন বেতার অনুষ্ঠানে আমরা সমগ্র জাতির সামনে জ্ঞানসাধনা আর্তসেবায় নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিস্ময়কর প্রতিভার বেশ কয়েকটি দিক তুলে ধরবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। সেদিনকার সেই বেতার অনুষ্ঠানে মূল বক্তা ছিলেন আমাদের অগ্রজপ্রতিম শ্রীসিরাজুল হক সাহেব—আজ যিনি বিশ্বকোষ-প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির সম্পাদক।

তারপর যতই দিন যাচ্ছে ততই এই নিভৃতচারী মহাতপস্বী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ নানা সৃষ্টকর্মকে শ্রীসিরাজুল হক সাহেব গভীর অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসছেন। সব দেখে শুনে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ছি।

বিচিত্রকর্মা মহাপ্রাণ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার পরম পবিত্র জাতীয় কর্তব্যটি পালনে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন—তাঁদের সব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক—আজ এইটিই আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

শুভার্থী
শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী
সদস্য
বিশ্বভারতী বেতার অনুষ্ঠান সমিতি।

শ্রীনিকেতন
২৮. ৪. ৮৯

Ranjit Chattopadhyay
M. A. B. ED. LL. B. W. B. R. S.
Ex, Lecturer & Advocate.
SUB REGISTRAR.

Resi :-
DANGALPARA.
P. O. SURI-731101
Dt. BIRBHUM

শ্রদ্ধেয় সিরাজুল হক মহাশয়,

বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণয়নের দুরূহ সাধনায় আজীবন ব্রতী ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আপামর দেশবাসীর নিকট বরেণ্য করে তোলার একনিষ্ঠ ও নিরলস সাধক হিসাবে আপনার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠুক, একান্তভাবে তাই কামনা করি।

বিনয়াবনত
শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়।
লাভপুর, বীরভূম।

বিশ্বকোষ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি,
আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও
তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায়
ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত, বৈদিক,
পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয়
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, বেদাঙ্গ,
পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা,
ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন,
ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী
মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব
পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা-
শাস্ত্রের সারসংগ্রহ
অকারাদি বর্ণানুক্রমিক
বৃহদভিধান ।

প্রথম খণ্ড

শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ।

কলিকাতা
৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামাপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেস
বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত
১৩০৯
[illegible] সাল

(নামপত্র)

হরিদাস

(সাধু)

—০—

মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা

করিয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান।

শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

৩৮/২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী, ষ্টীম

মেসিন প্রেস

শ্রী কুঞ্জবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১০

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি তত্ত্বচিন্তামণি

শব্দরত্নাকর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের

প্রথম ভাগের

বক্তব্য

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ১ম সংস্করণ প্রথম সংখ্যা ৫১ বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রাম হইতে ১২৯১ সালে ১ম সংস্করণের ১ম সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং ১২৯৩ সালে উভয়ের যত্নে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হয়

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়

৮।১বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা

২০এ শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার

[কাব্য]

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

শ্রীহরি মোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত

—০—

ভবানীপুর সোম প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত

—০—

১২৮৫ সাল

মূল্য এক টাকা

পৃঃ—৵.

গ্রন্থস্থিত বিষয় পুঞ্জ

কবিতা দেবীকে উদ্বোধনান্তর গ্রন্থ সূচনা—নৃপতিকে প্রবোধন—নৃপতির স্বপ্নদর্শন—তপস্বীর বেশে নৃপতির অরণ্যে গমন—যোগারম্ভ—ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান—স্তুতি মঞ্জরী—ষড় ঋতুর ও ত্রিকালের সুখ—তত্ত্বদর্শন—প্রাকৃত জ্ঞান লাভ—যোগ ভঞ্জনার্থ রতির ছলনা—রাজা রাণী ও মন্ত্রীর সহিত নৃপতির সাক্ষাৎ—নৃপতির গৃহে প্রত্যাগমন।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার

[কাব্য]

প্রথম সর্গ

কর অকিঞ্চন দাসে করুণা কটাক্ষ
মধুময়ি কবিতা-সুন্দরি
করি মনে শঙ্কা ; কিন্তু যদি দীন জানি
দেহ মা অভয়, পূজি তব পা দু'খানি
দুঃসহ এ ভব তাপ নিবারণ করি।

তোমার প্রসাদে মাগো বল কে না ভবে
ভুঞ্জিয়াছে আনন্দ সুন্দর
বররুচি, বরপুত্র কালিদাস কবি
ভারত সরসে কাব্য পদ্মোত্থান রবি
সাজাতেন ও রাঙা চরণ নিরন্তর।

ধন্য শিল্পী সেই প্রিয়তম পুত্র তোর!
বাখানি গো কারিগরি তার
কোন রত্নাকর সিঁচি চুনি চুনি মণি
আনিলেন সাজাইতে ও পদ জননি?
সে রত্ননিধি কি অন্যে দেখাইবে আর?
পৃ—১—২

নবম সর্গ

মঙ্গল আচার করে আনন্দে সকলে
সকলের মুখে সুখ-ধ্বনি।
মন্ত্রির সুযুক্তি ভূপ লইয়া নিয়ত
পালন করেন সুখে প্রজাগণ যত
পালিলেন প্রজা যথা রঘুকুল মণি
সম্পূর্ণ।
১৩৯ পৃঃ

রঙ্গলাল স্মরণে

—প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(শান্তিনিকেতন)

ক্ষুদ্রতৃণ গুল্মাবৃত প্রান্তরে উত্তুঙ্গ মহাকায়
বনস্পতি দর্শকের সসম্ভ্রম বিস্ময় জাগায়,
তেমনি বিস্ময়কর মনে হয় শৃঙ্খলিত দেশে
সহস্র কুপ্রথা-অন্ধ-সংস্কার-সন্ত্রস্ত পরিবেশে
একশত চত্বারিংশ বর্ষ পূর্বে বঙ্গ-পল্লীগেহে
তব পুণ্য আবির্ভাব, শিক্ষক, ভিষক্ একদেহে,—
রঙ্গপ্রিয় কবি, কর্মী, সাধক, পণ্ডিত, রঙ্গলাল,
ভাটুকলিকাসুন্দর জঙ্গলে নিঃসঙ্গ সুবিশাল,
মহীরুহ সম। দৈন্য ব্যাধির কণ্টকব্যূহ ভেদি'
কর্মকুণ্ঠ নিরুদ্যম বামন সঙ্ঘেতে অভ্রভেদী
মহিমায় দাঁড়াইলে আশ্চর্য জীবনাদর্শ ল'য়ে,—
সর্ব খর্বতার ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিঃশঙ্ক উচ্চ শির।
'চেষ্টার অসাধ্য কর্ম নাহি' শিখাইলে, কর্মবীর,
নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত চিত্তে-ধূলি-শয্যাশায়ী ক্লীবদলে—
আমৃত্যু-সংগ্রামে জিনি' শত বিঘ্ন—মানব মঙ্গলে।
সৌম্যমূর্তি হে ব্রাহ্মণ, গৌরকান্তি গৈরিকবসন
লক্ষ গুণগ্রাহী বক্ষে পেতেছ শ্রদ্ধার পদ্মাসন—
অনায়াসে যেথা গেছ। রোগার্তের আর্তি বিদূরিয়া,
কবিতা-প্রবন্ধে-গানে ভারতীরে গেছ অর্ঘ্য দিয়া।
জ্ঞান ভক্তি কর্মে করি' সম্মিলিত তুমি একাধারে—
আপন চরিত্রে—গেছ মূর্ত করি' গীতার শিক্ষারে।

বাল্যে মাতৃপিতৃহীন, সংসারে অনুজ পাঁচ ভাই:
প্রাথমিক শিক্ষা লভি' পল্লী-বিদ্যালয়ে মিটে নাই
দুর্নিবার জ্ঞান-তৃষ্ণা। এদিকে সংসারে অনটন,

অনুজ ত্রৈলোক্য সহ দীর্ঘ পথ করি' পর্যটন
গেছ দূর মানভূমে অনুকূল-আত্মীয়-আশ্রয়ে —
উচ্চশিক্ষালাভাশায় ; ইংরেজী সংস্কৃতে পাঠ ল'য়ে—
পাঠ ল'য়ে গণিতজ্ঞ শিক্ষকের কাছে কিছুকাল
ফিরিলে দক্ষিণ বঙ্গে সংসারের ধরিবারে হাল।
নিলে শিক্ষকের বৃত্তি বালুটিতে, চন্দননগরে ;
সেথায় আক্রান্ত হ'লে নিদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে
প্রথম যৌবনে ; তবু মুক্তি নাই অর্থার্জন ছাড়া।
ব্যাধিজর্জরিত দেহে গেছ ইছাপুর, মালিয়াড়া,
কলিকাতা, পুরুলিয়া, গাজিপুরে—শিক্ষাদান-সহ
ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায়। জীবন দুর্বহ
যে রোগের যন্ত্রণায়—তুমি তার নিরসন-তরে
যে কোনো উপায়ে, নিত্য পড়িয়াছ কর্ম-অবসরে
নানা গ্রন্থ আয়ুর্বেদ, অ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথির,
আয়ত্ত করেছ তথ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির
চিকিৎসাশাস্ত্রের তুমি অভ্রান্ত-প্রয়াসে রাত্রিদিন
পাঠাগারে, গুরু-পাশে, তারি সঙ্গে বিরামবিহীন
চলেছে সংস্কৃত-চর্চা। পুলিশের কেরাণীগিরিতে
কর্মরত গাজিপুরে শিক্ষা ভাগবতে পাণিনিতে।
ব্রহ্মাবর্তে নয়াগ্রামে কাব্য, নাট্য, আগম, পুরাণ
ভারতের মহোজ্জ্বল অতীতের দিয়াছে সন্ধান।
যেখানে যে কর্মে ছিলে, সে ছিল অন্তর জুড়ি' সাথে—
সাগ্নিকের হোমবহ্নি, শক্তি দিতে, প্রেরণা যোগাতে।
স্বচেষ্টায় সুপণ্ডিত হলে ক্রমে জ্ঞান-অনুরাগে।
কলিকাতা টঙ্কশালে অধ্যক্ষতা মুদ্রণ-বিভাগে
করেছিলে কিছুকাল ফিরি দেশে ; তারপর এলে
পুনঃ পল্লী-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হ'য়ে ; পেলে
আপনারে ফিরি তুমি বীরভূমে। বিধাতার দান
স্বভাব-কবিত্ব তব আবাল্যের স্বরচিত গান
জিনিল জনতাচিত্ত, হ'ল বহু ভক্ত-বন্ধু লাভ।

সহস্র ছাত্রের চিত্তে তব জ্ঞানস্পৃহা ধর্মভাব
হ'ল সঞ্চারিত ; বিজ্ঞ সভা মধ্যে সাহিত্যালোচনা
নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তোমার রচনা
হ'ল সমাদৃত দেশে। মনীষী ভূদেব উচ্ছ্বসিত
করিলা প্রশংসা ; 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি ভূষিত
করিলেন বর্ধমান-মহারাজ। ভরিল না মন ;
সদ্‌গ্রন্থ প্রচার লাগি' মুদ্রাযন্ত্র করিলে স্থাপন
কলিকাতা নগরীতে ; ক্ষতি সহি' গ্রামে ল'য়ে এসে
যন্ত্র সেই আরম্ভিলে জ্ঞানালোকবঞ্চিত এ দেশে
জ্ঞান-যজ্ঞ ; দিতে খুলি' নিখিলের জ্ঞানের ভাণ্ডার
সঙ্গে নিলে 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলন মুদ্রণের ভার
অমিতসাহসে। ছিল বহুখণ্ডে মহাগ্রন্থ সেই
মুদ্রিত হ'বার কথা ; একখণ্ড বাহির হতেই
অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ আবাল্য সুহৃৎ সাহিত্যিক,
অকুণ্ঠ নির্ভর ছিল যাঁর পরে—দাবী সর্বাধিক,
যাঁর সহায়তা জানি স্বতঃসিদ্ধ তুমি যাঁর সনে
একত্রে নামিয়া ছিলে দুরূহ কর্তব্য সম্পাদনে
অতর্কিতে করিলেন আয়োজন ইংলণ্ড যাত্রার
না শুনি নিষেধ তব, সঁপি গ্রন্থ সঙ্কলনভার
নির্দ্বিধায় তব স্কন্ধে—আপনার পদোন্নতি লোভে
আরব্ধ উদ্যোগ রাখি অসমাপ্ত। নিরুপায় ক্ষোভে
তখনি বিক্রয় করি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয়স্বত্ব সহ
নগেন্দ্র বসুরে ডাকি' দেশত্যাগী হ'লে সুদুঃসহ
অভিমানে। এলে চলি বীরভূমে ময়ূরাক্ষী তীরে
ছিলে শিক্ষাব্রতী হ'লে সেবাব্রতী ভিষক্‌ অচিরে
স্বচেষ্টায় পর্ণগৃহে বৈদ্যশাস্ত্র অধিগত করি
নবোদ্যমে নানা গ্রন্থ করি পাঠ ; ঘৃণা পরিহরি
সদ্য-সমাহিত শব গোপনে সমাধি গৃহ হ'তে
আনি' ঘরে নিজ হস্তে ব্যবচ্ছেদ করি বিধিমতে
শিখিলে শারীর বৃত্ত ; হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী

যকৃৎ অন্ত্রাদি যন্ত্র কে কোথা সংস্থিত ; রক্ত চলি
কী-ভাবে ধমনী পথে নিরন্তর অস্থি-পেশী মাঝে
মানবে জীবিত রাখে। সে প্রত্যক্ষজ্ঞান এ'ল কাজে
শল্যচিকিৎসায় গ্রামে। বহু রোগী করি নিরাময়
ধনীদীননির্বিশেষে হ'লে তুমি আর্তের আশ্রয়,
সবার আত্মীয়। হ'লে দেশপূজ্য। জনহিতে
চব্বিশ বছর যাপি' লাভপুরে 'লাঘোষা' পল্লীতে
যোগসাধনায় সিদ্ধ যোগী তুমি সমাহিত হ'লে
আপন সাধনপীঠে বীরভূমি জননীর কোলে—
চিতানলে দেহ শেষ না সঁপিতে বলি ; সেথা তব
সমাধি স্তম্ভের লিপি আছে জাগি আজো অভিনব ;

জানাইছে 'বিশ্বকোষ-প্রবর্তক' সিদ্ধ যোগিবর
বিশ্ববাসিহৃদয়েতে চিরজীবি আত্মায় অমর
রঙ্গলাল। ত্রি-সপ্ততি বর্ষ পূর্বে তুমি গেছ চলি
দেখিনি তোমারে তবু আত্মার আত্মীয় মম বলি'
তোমারে স্মরণ করি, নত শিরে প্রণাম জানাই।
স্বাধীনতা আসিয়াছে দেশে—কিন্তু চিত্তে শান্তি নাই,
কাপট্য যথেচ্ছাচার সগৌরবে সর্বত্র বিরাজে ;
ধার্মিক ব্যঙ্গের পাত্র। অমানুষ এ ভ্রষ্ট সমাজে
নিরীশ্বর বিশ্ব বলি' নর-নারী সবার ধারণা
বাড়িতেছে। এ দুর্দিনে একবার ফিরিতে পারোনা—
আশ্চর্য গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রত্যক্ষ প্রতীক,—
কর্মবীর, ধর্মবীর, জ্ঞানবীর, ভারতপথিক—
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অপ্রমেয় প্রজ্ঞা মূর্তিমান্—,
পথভ্রষ্ট বঙ্গ জনে দিতে সত্য পথের সন্ধান ?

বন্দনা

[চিকিৎসা জগতের প্রবাদ পুরুষ-বিশ্বকোষ-প্রবর্তক
কাব্যরত্নাকর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কে স্মরণ ক'রে]

—শ্রীবসন্ত কুমার কবিরাজ

মঙ্গল শাঁখ হয় নি ধ্বনিত সেদিন তোমার নামে—
যেদিন দেখেছো জগতের আলো সুদূর রাহুতা গ্রামে ;
রূপোর চামচ দেয় নি তো বিধি তোমার ও মুখে তু'লে
চলার পথটি সযতনে কেউ ঢেকে রাখেনিকো ফুলে।
অর্ধ অশন, অনশন জ্বালা কত না তীব্র ময়
বাল্যে হয়েছে তাদের সঙ্গে সনিবিড় পরিচয়।
হরেক ব্যাধির বেদনাও তুমি সয়েছিলে সেই সাথে
ব্যাধি সম যা'রা বধিতে তোমারে চেয়েছিল শরাঘাতে।
ঘূর্ণি হাওয়ার কেন্দ্রে বৃন্ত ছিন্ন পাতার মত
বিধাতা তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছে অবিরত।

রাঢ়ের রুক্ষ মাটির বক্ষে গৈরিক বেশে এলে
আলোকের দূত নাশিলে তমসা জ্ঞানের মশাল জ্বেলে,
গুরু রূপে শুরু জীবনের ব্রত পরে ধন্বন্তরি
বিশ্ববাসীরা তাই যে তোমায় রাখিয়াছে বুকে ধরি
আর্ত এবং নিঃস্বের তরে তোমার দরদী মন
অবিরল ধারে করিয়া গিয়াছে অশ্রু বিসর্জন।
'বিশ্বকোষ'টি দিয়েছো উজাড়ি দীন হীনদের লাগি
আপন প্রভায় করেছিলে বহু মনীষীরে অনুরাগী।
শব-সাধনায় নূতন সিদ্ধি দেয়ালে কাহাকে বলে,
হার মেনে ফিরে যেত মহাকাল তব রণ কৌশলে।

আপনার তনু ক'রে গেছ দান দধিচী মুনির সম,
গ্রাম লাঘোবায় ভূতল শয়ান রচিয়াছ অনুপম।
উদয় হইতে অস্ত অবধি সূর্য-আলোক স্নানে
অম্লান তব শয্যার পরে মাতে বিহগেরা গানে।
তোমার বদন সস্নেহে চুমি গোঠে যায় যত ধেনু
অঙ্গে তোমার দেহ এলাইয়া রাখাল বাজায় বেনু।
অদূরে বাহিতা ময়ূরাক্ষী যে গেয়ে চলে তব গীতি
শ্যাম শোভাময় বিটপী বিছায় ছায়ায় সৌধে নিতি
হংস বলাকা যশোগাথা তব গেয়ে ফেরে কোলাহলে
পরমাত্মীয় তৃণেরা তোমায় ঢেকে রাখে মখমলে।
সন্ধ্যা হইতে নীহার বিন্দু ঢালে শান্তি বারি
জোনাকিরা এসে প্রদীপ জালিয়ে রেখে দেয় সারি সারি
গভীর নিশায় পেচক ও শিবায় তোমায় নমিতে আসে
অনিমেষে চেয়ে চন্দ্র তারায় বন্দে মৌন ভাষে।

তোমার লেখনী প্রসূত ফসলে করি নব রূপায়ন
হে মহামানব সাজাবো তোমার অর্ঘ্যের উপায়ন।

রঙ্গলাল স্মরণে

নির্মলশিব দত্ত

কণ্টকআকীর্ণ পথ
দুর্গম দুস্তর
ভাগ্যাকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘ।
বিড়ম্বিত অদৃষ্টের
ভ্রূকুটী ভয়াল
কুজ্ঝটিকা সমাবৃত
স্বর্ণাভ সকাল।
মাতাপিতৃহীন শিশু
চব্বিশপরগণা জেলা
রাহুতা গ্রামের রঙ্গলাল
বারোশত পঞ্চাশের
চব্বিশে আষাঢ়
এ বঙ্গের শ্যামল অঙ্গনে
তব আবির্ভাব তিথি
অবিস্মরণীয়।
মণীষার মধ্যমণি
তুমি বরণীয়।
জীবন সৈকতে যারা
রেখে গেল পদচিহ্ন
অনুসরণীয়।

ধন্বন্তরী সম তুমি
ব্যাধির নিদানে
জীবন্তই প্রবাদ পুরুষ।
ধ্যানসিদ্ধ মহাযোগী
ধূর্জটি প্রতিম
স্বয়ম্ভু গৌতম সম
দৃষ্টি অন্তর্লীন,
শালপ্রাংশু মহাভুজ
বারিধিবিশাল বক্ষে
করুণা নিঃসীম।
মহারথ সাহিত্যের
নব পথিকৃৎ
গুণনিধি রসিক সুজন।
বহুমুখী প্রতিভার
সৃষ্টি অভিনব
সুধীজন সমাদৃত
শতকৃতি তব।
বিরচিলে বিশ্বকোষ
বিশ্ববিদ্যা কল্পবৃক্ষ
বোধিদ্রুম নব।

রাঙামাটির রঙ্গলাল

বিজয় কুমার দাস

নাগরিক অহঙ্কার ছিলনা
সেই মানুষটির মনের গভীরে,
অথচ অন্তরে ঐশ্বর্য ছিল
যেমন ফুলের গন্ধ থাকে
ফুলেরই বুকে, পরাগে।

দুপায়ে গ্রামের ধূলো ছিল
সেই মানুষটা খ্যাতির কাঙাল হয়ে
ফেরিওয়ালার মত কখনও ছোটেনি
সাহিত্যের বাণিজ্য বাজারে।

আজীবন আন্তরিক সাধনা
এই রাঙামাটির বুকে
সে এক আশ্চর্য তাপস
রাঙামাটির রঙ্গলাল
বিশ্বকোষে বিশ্বে খ্যাত।

হৃদয়ে আছো, থাকো চিরকাল।

রঙ্গলাল বন্দনা

শ্রীগৌরগোপাল পাল

বিশ্ব কোষের প্রবর্ত্তক হে তোমায় আমরা প্রণমি আজ।
আষাঢ়ের এই পুণ্য দিনে, এসেছিলে তুমি ধরার মাঝ ॥
হে জ্ঞানী তাপস, খেটে নিরলস,
করে গেছো এই ধরাকে সরস,
তাইতো আজিও গাহি তব যশ—হেরিয়া তোমার অতীত কাজ
'শরৎ শশী' 'চিত্তচৈতন্যোদয়' তব 'হরিদাস সাধু' আর,
আছে 'বিজ্ঞান দর্শন' আরো 'বৈরাগ্য বিপিন বিহার',
মনে রেখে তব সেই সাধনায়,
তোমারে আমরা আজো ভুলি নাই,
বারে বারে তাই স্মরিহে তোমায়-ঢাকিতে মোদের লাজ ॥

শ্যামা সঙ্গীত

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

কালোর রূপে জগৎ আলো
শ্যামার রূপে জগৎ আলো ॥
সে হয় কুৎসিত কিসে, মনে যারে লাগে ভালো ॥

ভালবাসার অনুরাগে, ভালবাসায় ভালো লাগে।
ভালবাসার ভালো সবই কালোকে না লাগে কালো ॥
নিয়ে আমার যুগল আঁখি শ্যামের পাণে চাহ দেখি,
ভাল লাগে কি কালো লাগে আমার চোখে দেখে বলো ॥*

* বিগত ১৯৮৩ সালে ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যারাতে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সমপ্রচারিত সম্পাদকের গ্রন্থনা ও কথকতাকৃত রঙ্গলাল আলোচনা প্রধান "দাঁরকা গ্রামের কথা" শীরোনামীয় দীর্ঘ একটি বেতার অনুষ্ঠানে উপরোক্ত সঙ্গীতটি বীরভূমের খ্যাতনাম্নী সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতি পুরবিকা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

—সম্পাদক

গান

মালতী রুদ্র

বঙ্গমাতার কৃতি সন্তান তোমায় স্মরণ করি।
ধূপ-দীপ-চন্দন-ফুল দিয়ে বরণ করি
তোমায় স্মরণ করি ॥

রঙ্গলাল অমর নাম
ক'রে গেলে হরেক কাম
অসহায়ের সহায় ছিলে
দীনের ছিলে হরি
তোমায় স্মরণ করি ॥

এই দেশেতে এসে তুমি
এই দেশেরই ছেলে হলে
এরই তরে মনঃ প্রাণ
তাই যে গো সঁপে গেলে।

সর্ববিজ্ঞ রঙ্গলাল
ভোলেনি তোমায় কাল
এ শুভক্ষণে মোদের বুক গর্বে উঠ্‌ছে ভরি ॥

সঞ্চিত থাকিবে সমাধি ভাণ্ডারে ;
আসি কত লোক ভাবিবে তোমারে।
মৃত কাছে পাবে অমৃত সংবাদ
অশ্রু-জলে মিশি বাড়িবে আহ্লাদ।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ফুটেছে কার্পাস যেন আকাশ জুড়িয়া,
কভু নানা বর্ণে মেঘ যাওরে ভাসিয়া।
কখন মাণিক মালা ফুটে দেহময়,
কখন আঁধার সব দেখে ভয় হয়।
তেমতি কি অবনীতে জীবের জীবন,
সুখে দুঃখে জড়িত রেখেছে অনুক্ষণ ?

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ভাষার নমনীয়তা

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বসন্ত কাল। পল্লবিত নিকুঞ্জ কাননে প্রকৃতি-দেবী ভুবনখানিকে হাসাইতেছেন। আবার কৌতুকপ্রিয় বনদেবতা যেন মনুষ্যনয়নের অগোচরে থাকিয়া রসপূর্ণ ভাবময় চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তুলিকাটি টানিতেছেন,—কেমন সুদৃশ্য বর্ণের বিচিত্রতা সম্পন্ন হইতেছে—দেখ! কোন খানে নীহারধৌত শুভ্রপুষ্প, কোন খানে অলক্ত-নিষ্ঠ্যূত রক্তপুষ্প চিত্র করিবার বর্ণ দিতেছে; কোথাও অভিনব কিসলয় তুলীর কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বাহির করিতেছে—স্বয়ং বনদেবতা চিত্রকরী; নিপুণ হস্তে ধীরে ধীরে কেমন কোমল তুলিকায় বর্ণ ফলাইতেছেন, প্রতি অঙ্গে নব জীবনের সতেজ জ্যোতি ঢল ঢল করিতেছে,—তবু চিত্রাঙ্কের রেখাপাত হয় নাই,—কেবল জগৎ জুড়িয়া একটি শ্যামল সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে। চারিদিকে বসন্তের উৎসব,—মধুর কলরবে স্বভাবকে যেন জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে। শুন দেখি, গাছের শাখায় ও কি ডাকিল?—পাখীর রব? তুমি মনে ভাবিতেছ, পাখী বলিতেছে—"বউ কথা কও"। কিন্তু, পাখীর কি বউ আছে,—তা সে কথা কবে? ঢেঁকীর কচ্‌কচি, মনে যা ভাব কাণে তাই শুনায়। পাখীর বাক্‌শক্তি নাই, সে আপন মনে নিজের বুলি বলিতেছে, তুমি কিন্তু,—"বউ কথা কও," "বউ কথা কও"—শুনিতেছ।

অনেকগুলি পাখীর বুলি ঠিক মানুষের কথার সদৃশ। চাতকে পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকে,—"ফটীক জল, ফটীক জল"। আবার ষড়জসিদ্ধ পাপিয়া সুর তুলিয়া কেমন স্পষ্ট বলিতে থাকে—চোক্ গেল, চোক্ গেল।" পক্ষীর আকার অবয়ব,—ঠিক মানুষের মত না হউক, যদি বানরেরও কিছু অনুরূপ হইত, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রের কল্যাণে অনেকগুলি পাখীর সঙ্গে আমরা কুটুম্বিতা করিতে পারিতাম। পাখীগুলি বাঙ্গালা কথা কয়—"চোক্ গেল"—বলে, "ফটিক জল,—বলে, "বউ কথা কও"—বলে। আমরাও বাঙ্গালা কথা কই; ফল্‌গুৎসবে চক্ষুতে আবীর দিলে,—"চোক্ গেল"—বলি; পরিষ্কার জল দেখিলে,—"ফটিক জল"—বলি; আবার ঘরের গৃহলক্ষ্মী মনের মত অলঙ্কার না পাইলে যখন মানভরে

ভারী হন, তখন আমরা ঘোমটাটি খুলিয়া বলি—"বউ কথা কও"। তবে কি পাখীর বুলির সঙ্গে আমাদের ভাষার সাদৃশ্য নাই? অবশ্য আছেই? অতএব কতকগুলি ভিন্ন জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এককালে উহারা সকলেই একভাষী ও একজাতি-নিবিষ্ট না থাকিলে কোন ক্রমেই সেরূপ ঘটিতে পারে না, তবে পাখীর সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা কেন না হইবে? কারণ পাখির বুলির সঙ্গের আমাদের অনেক বাক্যের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

ইউরোপে বিদ্যার বড় আদর। সেখানে আজ কাল প্রাচীন ভাষার সবিশেষ অনুশীলন চলিতেছে। পণ্ডিতেরা অনেক দেখিয়া, অনেক শুনিয়া অবশেষে একটি কল্পতরুর ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছেন -তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। এই দেবমাতৃক ভাষার শব্দগুলি সর্ব্বফলপ্রদ। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে প্রায় সকল ভাষার শব্দগুলি অনায়াসে সাধিতে পারা যায়। সংস্কৃত শব্দের মত কোন ভাষার শব্দ এত কোমল নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক নহে। উহাকে সংকুচিত কর, সম্প্রসারিত কর, ফিরাও, ঘুরাও, কিছুতেই উহা ভাঙ্গিবে না,—মচ্‌কাইবে না। এতএব অন্য ভাষার শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের যে সৌসাদৃশ্য হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। শাব্দিকেরা এখন এই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, যে যে জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে, মূলে তাহারা এক অভিন্নজাতি ছিল। কাজেই আমরা দেখিতেছি—"গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়"—সংস্কৃত শব্দের কোমলতাই পবিত্র আর্য্যজাতিকে ম্লেচ্ছ জাতির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিতেছে। নরম দেখিলেই সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরে। ভারতের ত সব গিয়াছে, এখন জাতি ও ভাষা টুকুও থাকা দায়—তাহাতেও অনেকে আসিয়া ভাগ বসাইতেছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র সুশোভিত শব্দ—নিকুঞ্জবনের "বউ কথা কও" পাখীর বুলি। এই নিকুঞ্জবন কোথাও বাক্‌পল্লবে আলো করিয়া আছে, কোথাও ভাবরসময় কুসুমমঞ্জরীর গন্ধামোদে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে;—আবার শাখার মধ্যে ব্যাকরণসূত্র—পাখীর রব,—মনে যা ভাবিবে, সেই সূত্র তোমাকে তাই শুনাইবে। যমুনা পুলিনের কদম্ব ডালে বসিয়া রাখাল-রাজ বাঁশীটি বাজাইতেন, ব্রজের রাখালে শুনিত বাঁশী বলিতেছে—"আয় ভাই, গোঠে যাই, শ্যামলী ধবলী ডাকিছে অই।" রাই গৃহকর্ম্ম করিতেছেন—মন যমুনা তটে। বঁটী পাতিয়া বেসাতি কুটিতেছেন, আন মনে আঙুল কাটিয়া ফেলেছেন,—ভ্রূক্ষেপ নাই, কাণ তুলিয়া

কেবল এক মনে একধ্যানে ভাবিতেছেন—বাঁশী কি বলিতেছে ; রাই শুনিতেছেন—"তোমার হয়ে আর কোথায় বা যাব রাই, বল প্রিয়ে আমি কার কাছে দাঁড়াই, হারাই বলে আমি সদাই বলি রাই, ধবলী চরাই, বেড়াই তোমার গুণ গেয়ে বৃন্দাবন ধাম।" প্রাণের ছেলে বাথানে, যত বেলা হইতেছে, যশোদারাণীর হৃদয় ফাটিতেছে ; তিনি শুনিতেছেন—"আমায় দে মা জননি। ক্ষীর সর ননী, গোঠে গোঠে ফিরি, ক্ষুধায় সারা হই"। যাঁর যেমন প্রবৃত্তি, তিনি সেইরূপ শুনিতেছেন, তিনি সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইতেছেন। বাঁশী কিন্তু আপন স্বরে ভোর।

সংস্কৃত শব্দ যাহা বলে, সে আপনার বুলিই বলিতেছে। তবে তুমি যদি তাহা হইতে নূতন কিছু বাহির করিতে পার ; সেটি সংস্কৃতের নমনীয়তা ; আর তোমাকে অধিক কি বলিব ?—তোমার সেটী অসামান্য গুণপনা। কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি নিখিল বিদ্যার পারদর্শী হইয়া কি করিতে পারিয়াছিলেন? যদি জর্ম্মণে জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তবে তাঁর এক আনা বিদ্যাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একছত্র করিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের সূত্রানুসূত্র ব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থি, চর্ম্ম, তন্তু পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—শেষ বিধবাবিবাহ আর বহু বিবাহবাদ ভিন্ন আর ত কিছু ক্ষমতায় আসিল না! বাচস্পতি মহাশয়ের বাচস্পত্যই কাঙ্গালের ধন! সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় চিরকাল কলম পিসিতেছেন, কিন্তু কি করিতে পারিলেন? আর আমি যে ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুপাত হং কং সং উল্টাইয়া লম্বা লম্বা কথা কই, আমিই বা কি করিতেছি? যদি আর দুহাত পশ্চিমে গিয়া জন্ম লইতাম, তবে এক এক কথা কাহন দরে বিক্রয় হইত। কত জাতির জন্ম-কোষ্ঠী নিরূপণ করিতাম—গঙ্গাজলের সঙ্গে কূপোদকের আদৃশ্য দেখাইতাম। কিন্তু, কি করিব ?—যে দেশের ভাষা, সেই খানেই জন্ম লইয়াছি ;—বিদেশী হইতে পারি নাই, এ জীবনে শব্দবিদ্যার মর্ম্ম জানা হইল না, মনের খেদ মনে রহিল।

জগৎ চিত্র বিচিত্র বিবিধ পদার্থের ভাণ্ডার। সরলচরিত আদিম কবিগণ জগতের এক একটী বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেন ; ভাব স্রোতে মন ভাসিয়া উঠিত, কল্পনা-লহরীতে দুলিতে থাকিতেন। কোন্ পদার্থের কিরূপ ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, কতই তাহা ভাবিতেন। চন্দ্রে কলঙ্করেখা,—ভাবুক কবি নূতন জগতে নূতন চক্ষে নূতন ব্যাপার দেখিলেন, কেন এ কলঙ্ক ? —কবির চিত্তে নূতন ভাব ভাসিয়া উঠিল। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, অতএব

ক্ষয়রোগের লক্ষণ, কাজেই মৃগ কোলে না রাখিলে পীড়ার প্রতীকারের উপায় কি? তাই চন্দ্র মৃগ ধারণ করিয়া থাকেন,—তাই জগতের নয়নানন্দ সুধাংশু কলঙ্ক দোষে দূষিত।

যেখানে যেমন পদার্থের অবয়বের সঙ্গে যেমন ঘটনা সংগত হইতে পারে, সেখানে সেই প্রকার ঘটনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝাড়বাগ্নি, ইন্দ্রধনু, মেঘ-গর্জ্জন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সকল আশ্চর্য্য বিষয়ের এক একটা কবিকল্পিত কারণ দেখা যায়। পূর্বে পদার্থ বিশেষের উপর এক একটি কল্পনার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহা এখন পুরাতন হইয়াছে, পুরাতনের আদর থাকে না। আজ কাল তাই কল্পনা-দেবী শব্দশাস্ত্র হইতে একটা নূতন সৃষ্টির পত্তন করিতেছেন।

শাব্দিকেরা বলেন, অনেকগুলি জাতিমূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল। কাল সহকারে তাহাদের ভাষার অনেক বিভিন্নতা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আমি, তুমি প্রভৃতি সর্বনাম; এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যাবাচক এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি সম্পর্ক-বাচক শব্দগুলির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যথা—

সংস্কৃত	পারসীক	গ্রীক	লাটিন	জর্ম্মাণ	ইংরাজি
পিতা	পদর্	পাটর্	পাটর্	ফাতের	ফাদর
মাতা	মাদর	মাটর্	মাটর্	মুতের	মদর
ভ্রাতা	ব্রাদর্	ফ্রাট্রিয়া	ফ্রাটর্	ব্রুদের্	ব্রদর্
অহম	মা	,,	,,	,,	আই
ত্বম্	তু	স্থ	টু	,,	দৌ। ই
দ্বি	দো	ড্ও	ড্ও	,,	টু

পাঠকের গোচরার্থ এখানে কেবল এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত শব্দ এত কোমল, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক যে উহা ফিরাইলে, ঘুরাইলে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। মনুষ্যের কথা কি?—পশু পক্ষীর বুলির সঙ্গেও সংস্কৃত শব্দের অনেক সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়।

বাঙ্গালি	ইংরেজ	মেষ	ছাগ	গো	পারসী	সংস্কৃত
মা	মামা	ম্যাঁ	ভ্যাঁ	হম্বা	আম্মা	অম্বা

চাতকাদির বুলি পূর্বে কথিত হইয়াছে। উপরে পিতা, মাতা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ তদর্থ প্রতিপাদ্য অন্য অন্য ভাষার যে সকল শব্দ লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়ে অনেক বর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সংস্কৃত পিতৃ, ইংরাজি ফাদর,

এখানে ও স্থানে ফ, ত স্থানে দ, এবং ঋ স্থানে র হইয়াছে। পারসীক—পিদর এখানে ঋ স্থানে র এবং ত স্থানে দ হইয়াছে। গ্রীক পাটর, ত স্থানে ট এবং ঋ স্থানে র হইয়াছে। সর্বত্রই ইকারের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত অহম্। পারসীক মা, এখানে আদির দুই বর্ণ অ ও হ্ এককালে লুপ্ত হইয়াছে, কেবল শেষের ম বর্ণটি দীর্ঘ হইয়াছে। ইংরাজি—আই, এখানে কেবল আদ্য অকারটি আছে। সংস্কৃত—ত্বম্, পারসীক তু—এখানে (ব) এই বর্ণের সম্প্রসারণ (১) হইয়া উকার হইয়াছে; এবং অপর দুইটি ভাষাতে ত বর্ণ স ও ট হইয়াছে। যদি সর্বত্র বর্ণ ব্যতিক্রম, বর্ণ লোপ, বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, (২) অসরূপ প্রত্যয়, নিপাতন এবং কৃদন্তের (৩) বাহুলক বিধির অনুসরণ করা যায়, তবে সংস্কৃত সূত্রানুসারে সকল ভাষার শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। সেটি সংস্কৃত ভাষারই গুণ। সংস্কৃত শব্দ গম্ভীর অথচ কোমল, আবার উহাকে রূপান্তরিত করিবার অনেক উপায় আছে, কাজেই নানাজাতীয় ভাষার শব্দের সদৃশ হইতে পারে। তবে আমরা এককালে এমন কথা বলি না, যে কোন সংস্কৃত শব্দই অন্য ভাষায় প্রবেশ করে নাই। অবশ্য কার্য্যের অনুরোধে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর ঘনিষ্ঠতা

(১) ইক্‌যণঃ সম্প্রসারণম্। পা। ১। ১। ৪৫।

য ব র স্থানে যে ই উ ঋ হয়, তাহাকে সম্প্রসারণ বলে।

(২) বাহসরূপোঽস্ত্রিয়াম্। পা। ৩। ১। ৯৪।

কোন ধাতুতে একটি প্রত্যয় প্রতিষেধ করিয়া অন্য প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিলেও প্রত্যয় প্রযুক্ত হইতে পারে।

(৩) ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ
ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য
চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।

কৃদন্তে অনেক প্রকার প্রত্যয় ব্যবস্থিত হয়। যেখানে কোন কোন প্রত্যয় প্রয়োগের নিয়ম নাই, সেখানে সেই সেই প্রত্যয় তবু ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার যেখানে ঐ সকল প্রত্যয় প্রয়োগের বিধি আছে, সেখানে প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। আবার কখন কখন উহাদের বিধান বিকল্পে হয়; আবার কখন কখন এই তিন প্রকারেরও বিভিন্ন ব্যবহার হয়। এই চতুর্বিধ বিধানকে বাহুলক বলে।

জন্মে, তখন এক জাতির ভাষার শব্দ অন্য জাতিতে ব্যবহার করে। মুসলমানদের রাজত্বকাল হইতে আমরা অনেক যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। আবার এখন ইংরেজদের সময় কত ইংরাজি শব্দ আমরা অহরহঃ কথা-বার্ত্তায় ব্যবহার করি। ইংরাজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিলে এখানে আর ইংরেজ থাকিবে না, কিন্তু অনেক ইংরেজি শব্দ থাকিয়া যাইবে। ইংরেজেরা স্বদেশে চলিয়া যাইবেন,—মনে করিয়াছ কি, তাঁহারা কেবল ভারতের রত্ন-রাজি লইয়াই সাগরের হৃদয় আলো করিতে করিতে ভাসিয়া যাইবেন?—তা নয়। এদেশের অনেক শব্দ তাঁহাদের অনুগমন করিবে। যদি সকল জাতির ইতিহাস ধ্বংস হইয়া যায়, তবে পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কোন বৈদেশিক বিদ্যাবিশারদ অবতীর্ণ হইয়া সপ্রমাণ করিবেন—হিন্দু ও ইংরাজ মূলে এক অভিন্ন জাতি ছিল।

শাব্দিকদিগের মতে আর্য্যবংশীয়েরা ভারতবর্ষের আদিনিবাসী নহেন। তাঁহারা প্রথমে আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থলে বাস করিতেন। শাব্দিকেরা আর্য্য শব্দের এক আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। (৪) লাটিন, গ্রীক, রুশ, ইংরাজি প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি-বাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "ঐ অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ।" শাব্দিকেরা অনুমান করেন যে, প্রথমে আর্য্যেরা কৃষিকর্ম করিতেন, তাই তাঁহাদিগকে আর্য্য বলে। পাণিনীয় ধাতুপাঠ ও কবিকল্পদ্রুম পাঠকরিয়াছি কিন্তু অর্ ধাতু কোথাও দেখি নাই—অতএব শাব্দিকদিগের মতে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নূতন ধাতু ও নূতন শব্দ কল্পনা করা হয়। পাণিনি একটি সূত্রে লিখিতেছেন—

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। ৩। ১। ১০৩।

ঋ ধাতুর অর্থ যাওয়া এবং প্রাপ্ত হওয়া (ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ)। যখন স্বামী এবং বৈশ্য বুঝাইবে, তখন ঐ ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া অর্য্য শব্দ সিদ্ধ করিতে হইবে। বাণিজ্যের কারণ বৈশ্যেরা দেশ বিদেশে যাইয়া থাকেন, তৎকারণে তাহাদিগকে অর্য্য বলে (বাণিজ্যার দেশান্তরমৃচ্ছতীতি অর্য্যঃ)।

আবার ঐ ঋ ধাতুর অর্থ যখন প্রাপ্ত হওয়া হইবে, তখন উহার উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ হয়। আর্য্যবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির নিকট পূজা ও

(৪) Lectures on the science of language by Max Mulle ; Bopp's comparative gammar ; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দেখ।

দান পাইতেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিত। (আর্য্যো ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ। ভট্টোজিদীক্ষিতঃ)।

ব্রাহ্মণেরাই আর্য্যজাতির মধ্যে প্রধান। তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কখন কৃষিকর্ম্ম করেন নাই। সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় যখন আতিথ্যসৎকার ছিল না; কেহ অভ্যাগত ক্ষুধাতুরকে আপনার অর্জ্জিত কোন দ্রব্য দান করিত না; তৃষ্ণার্ত্ত হও ক্ষুধার্ত্ত হও, স্বয়ং তার জন্য চেষ্টা কর, যখন এইরূপে সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিল, কেহ কাহারও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিত না, তখন আর্য্যজাতিরা পশু পালন করিতেন এবং বনের ফল, মূল, পত্রাদি ভক্ষণ করিতেন। উড়ি ধান্য ও অন্যান্য ধান্যও স্বভাবতঃ প্রচুর জন্মিত, কেবল পর্জ্জন্যদেব কৃপা করিলে খাদ্যসামগ্রীর কিছুই অসদ্ভাব থাকিত না।

ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাহাতে কস্মিন্‌ কালে যে তাঁহারা চাষ করিতেন, এমন বিশ্বাস হয় না। আবার দশ জনের কুহকে পড়িয়া যদি আমরা তেমন কথায় বিশ্বাস করি, তবে তাঁহাদের ধর্ম্মকুণ্ঠতাকে অঙ্গহীন করা হয়। ভূমিকর্ষণের সময় কৃষক ভূমি ভেদ করিয়া, বৃক্ষ ছেদন করিয়া, এবং কৃমি কীটাদি নাশ করিয়া অনেক পাপে লিপ্ত হয়। সে কারণে ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম্মে দোষ দেখাইতেছেন—

ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাৎ তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ। (পরাশরঃ)

ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিলে মহাপাতক হয়।

কিন্তু যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করেন, তবে স্বহস্তে করিবেন না, শূদ্র কৃষক দ্বারা চাষ করাইবেন—

ষট্‌কর্ম্মসহিতোবিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ। (পরাশরঃ)

ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া কৃষিকর্ম্ম করাইবেন।

কৃষিকর্ম্মের আনুষঙ্গিক গুরুতর দোষের কথা কহিতেছেন—

সম্বৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

মৎস্যঘাতী জেলে এক বৎসরে যে পাপ করে, কৃষক লাঙ্গলের মুখে এক দিনে সেই পাপ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্বারা চাষ করাইয়া লইবেন বটে, তবু ভূমিকর্ষণজাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। সেই জন্য খলযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইতেছে—

কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। (পরাশরঃ)

খামারে ধান্য দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম্মের নিষেধ দেখা যায়। যে ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ, তিনি কখন কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হন নাই, ইহা যখন সপ্রমাণ হইতেছে, তখন আর্য্যজাতীয়েরা কৃষিকার্য্য করিতেন বলিয়া আর্য্যনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাব্দিক-দিগের এই ব্যুৎপত্তি বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। যদি বল সভ্যতা উদিত হইলে এই সকল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, উহাতে আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম অবস্থা ঠিক হয় না। সে কথা সত্য; কিন্তু অক্ষয় বাবু লিখিতেছেন—"মনুষ্যেরা প্রথমে আসিয়াখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ একটি জনপ্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য ঋষিগণও ফল, মূল, কন্দ, নীবার এবং দুগ্ধ সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, এ প্রবাদও কি সর্ব্বত্র প্রথিত নাই? দুষ্মন্ত রাজা কুলপতি কাশ্যপের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন, আশ্রমের নিকটে শুকপক্ষীর শাবকদিকের মুখ হইতে নীবরকণা পড়িয়াছে দেখিয়াই জানিতে পারিলেন—তপোবন অতি নিকটে—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ। (অভিজ্ঞানশকুন্তলং)

ইউরোপীয় শাব্দিকেরা অন্য ভাষার সঙ্গে মেলন করিবার জন্য সচরাচর যে সংস্কৃত শব্দগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেগুলি বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত শব্দ। সংস্কৃত ভাষা যখন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সেই সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কথাবার্ত্তা মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একটি সামান্য সঙ্কেতমাত্র, এ ভাবিয়া আর্য্যেরা যখন আর চুপ করিয়া ছিলেন না, ভাষা একটি উপাদেয় সামগ্রী; ভাষাকে বেশভূষায় সাজাইতে হয়, রসাল করিতে হয়, এ বোধ যখন তাঁহাদের হইয়াছিল সেই সময় ঐ সকল শব্দের গঠন হইয়াছে। মাস, গো, অশ্ব, বরাহ, ক্রমেলক (উষ্ট্র), অবি, হংস, রাজা, রাজ্ঞী, নৌ, পিতৃব্য, শ্বশ্রূ, মধু প্রভৃতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি কেবল যে প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তা নয়, এখনও ঐ সমুদায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি শাব্দিক-দিগের মত সমূলক ও প্রামাণিক বোধ কর, তবে বল দেখি—যে যে জাতিকে আর্য্যবংশসম্ভূত অনুমান করিতেছ, তাঁহারা কোন্ কোন্ সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উপনিবেশ করিয়াছেন? কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অন্য জাতির ভাষার কতকগুলি শব্দের সদৃশ দেখাইতেছ, তাহাই বলবৎ প্রমাণ, সেই প্রমাণের সহায়তায় বলিতেছ লাটিন, গ্রীক, কেল্টিক টিটোনিক প্রভৃতি জাতি আর্য্যবংশসম্ভূত। তবে দেখ তোমার প্রস্তাবিত তর্ক কি বলিয়া দিতেছে—

আর্য্যেরা যখন সংস্কৃত ভাষা মার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় জ্ঞান হইয়াছিল ও ধাতু বিভক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছিল, সেই সময়ে আর্য্য জাতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া দেশ বিদেশে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। বাক্‌শক্তির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের অনুগামিনী হইল।

তোমার কথা মানিলাম। ভাল, এখন তোমার কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতেছি—ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখ দেখি চরম ফল কি হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, গুজরাটি, তৈলঙ্গী, প্রভৃতি নানা ভাষা হইয়াছে। ঐ ভাষাগুলিতে প্রসূতি-সংস্কৃত ভাষার স্পষ্ট আকার ও অবয়ব প্রতীয়মান হয়। তদ্ভিন্ন, ভারতে সেই আদিম সংস্কৃত ভাষার অদ্যাপি সমধিক চর্চা রহিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা হয় না, কিন্তু ভারতে তাহার অনুশীলনের ত্রুটি হয় নাই। তোমার কি এটি কৌতুককর বোধ হইতেছে না?—দশটি সম্প্রদায় এক সংস্কৃত সম্বল লইয়া দশটি ভিন্ন দেশে উপনিবেশ করিলেন। ভারতবাসিরা যেমন, তাঁহারাও সেইরূপ—সকলের সমান ভাষা, সমান আচার ব্যবহার। আশ্চর্য্যের বিষয়,—সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন কেবল ভারতবাসীদের কাছেই থাকিয়া গেল,—আবার সংস্কৃত হইতে যে সকল শাখা—ভাষা উৎপন্ন হইল, ভারতেই মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য রহিল; অন্য দেশে আদিম সংস্কৃত ভাষার চর্চা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল,—আবার যে নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল, সংস্কৃতের সঙ্গে তার কিছুই সাদৃশ্য নাই। বিদেশে সংস্কৃত ভাষার একখানি পুস্তকও নাই,—পূর্বতন কোন চিহ্নও নাই।

যদি বল ইউরোপে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও রাজ-বিপ্লব বশতঃ প্রাচীন আচার, ব্যবহার, ভাষা সমস্তই এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—ভারতে কি রাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটে নাই? বোধ করি ভারতের রঙ্গভূমিতে সমর-তরঙ্গ যত খেলা করিয়াছে, এখানে নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, পৃথিবীর কোন খণ্ডের কোন অংশে কখন এমন ঘটে নাই। সেই জন্যই ত ভারত একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বিদেশীয় শূরগণরূপ শনির দৃষ্টি ভারতকে কেবল দগ্ধ করিতেছে। তাহার উপর আবার ঘরাও বিবাদ—ভারতে আছে কি? দিন দিন ভারত কেবল শ্রীহীন ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। এত বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তবু তপোবনবাসী ঋষিগণ বুকে করিয়া সংস্কৃতরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য দেশেও যত বিঘ্ন বিপত্তি ঘটুক না, যদি

সংস্কৃত তথাকার সম্পত্তি হইত, কোন না কোন সম্প্রদায়ে তাহার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ থাকিত সন্দেহ নাই।

আর এক কথা—প্রাচীন জাতিদিগের বর্ণমালা দেখ, লিখিবার ধরণ দেখ। আর্য্য, ইহুদি, আরবি, পারসী এবং মিসর দেশীয়েরাই প্রাচীন জাতি। আর্য-দিগের সংস্কৃত ভাষার অক্ষর সর্বাপেক্ষা অধিক এবং সংস্কৃত ভাষায় বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যাইতে হয়। ইহুদি, আরবী, পারসীর অক্ষর অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প এবং ঐ সকল ভাষায় দক্ষিণ দিক হইতে বাম ভাগে লিখিয়া আসিতে হয়। সংসারে সকল বিষয় কেবল উত্তরোত্তর উন্নতিমুখে ধাবিত হইতেছে। আজ একটি বিষয় একরূপ, কাল দেখিবে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু বাড়িয়াছে, আবার দশ বৎসর পরে দেখিবে, তাহার কোনখানে একটু অঙ্গহীনতা নাই। কিন্তু উপরে যে সকল প্রাচীন জাতির কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র ভাব। বাকট্রীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যদি আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থান হইত, তাহা হইলে পারস্যদিগের বর্ণমালায় এবং লিখিবার ধরণে আমরা সংস্কৃতের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। দুই একটি শব্দ এবং ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া অধিক বাগাড়ম্বর করা উচিত নহে। চারিদিক দেখিয়া বিচার করাও কর্তব্য। বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া আসিতে যেমন সুবিধা হয়, তদ্বিপরীত প্রণালীতে লিখিতে তেমন সুবিধা হয় না। তবে বলিবে, অভ্যাসে সকলই সহজ হইতে পারে। সে কথা সত্য; কিন্তু বস্তুতঃ প্রথমে কোনটি সহজ ও সুগম, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ ভিন্ন যে ভাষায় অধিক বর্ণ, সেই ভাষাই অধিকতর মার্জিত ও বিশুদ্ধ। মুখ নাসিকা তালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রযত্নে নানা প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে। নানা প্রকার বর্ণ থাকিলে সেই সকল শব্দ শুদ্ধরূপে লিখিতে পারা যায়। ইংরাজিতে চ, ঠ, ধ প্রভৃতি অনেক বর্ণ নাই; এটি ইংরাজী ভাষার অভাব। আজি কালি সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার শব্দ লিখিবার জন্য দুই তিন ইংরাজি বর্ণ একত্র করিয়া ঐ অভাব মোচন করিতে হইয়াছে। যে সকল জাতি প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন বিশ্বাস কর, কই তাঁহাদের বর্ণমালাতে ত কোন উন্নতি দেখা যায় না। উন্নতির কথাই কেন?—সংস্কৃত অপেক্ষা সে সকল জাতির বর্ণও সর্বাংশে অসম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে মূল সংস্কৃত হইতে অনেক প্রকার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে—বাঙ্গালা দেখ, উড়িয়া দেখ, গুজরাটি দেখ—এমন অনেক আছে। কিন্তু, সর্বত্রই মূল বর্ণের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উর্দ্দু, আরবি ও

পারসী হইতে উৎপন্ন ; ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার বর্ণ লাটিন ও গ্রীক হইতে উৎপন্ন। দেখ দেখি, মূল ভাষার বর্ণের সঙ্গে এই সকল আধুনিক ভাষার বর্ণের সম্বন্ধ আছে কি না ? টানে টানে, মাত্রায় মাত্রায় সম্বন্ধ ; লিখিবার সময়, উচ্চারণ করিবার সময় লৌহকীলকে সে সম্বন্ধ নিবন্ধ করা আছে। তবে ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণে প্রাচীন আর্য্যেরা যাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচাইলেন কেন ? বিদেশে যাইয়া কি সব ভুলিলেন ? পৈতৃক সম্পত্তি কি কিছুই রাখিলেন না ?—সম্পর্কের নাম গন্ধও রাখিলেন না ?

আমরা তবে ত ভারতবাসিদের প্রশংসা করিতে পারি। তাঁহারা পূর্বপুরুষদের পরিচয় বিস্মৃত হন নাই, এখন সেই সংস্কৃত ভাষা কণ্ঠের মালা করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও তাঁহারা পিতৃধন মাথায় করিয়া আছেন। না, এ পৌরুষের কথা নয়.—লাভের বিষয়ও নয় ? পিতৃধনে যাহাদের অধিকার, সেই আর্য্যসন্তানেরাই তাহা ভোগ করিতেছে। পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করা সন্তানেরই কর্তব্য কর্ম,—যে সন্তান, সে সেই কর্তব্য কর্ম স্মরণ রাখিবে ;—কাজেই অন্যে ভুলিবে। (ক্রমশঃ)

—কল্পদ্রুম পত্রিকা থেকে সংকলিত।

এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি ?

শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

আমরা স্বভাবতঃ বাগ্দেবীর বরপুত্র, কবিতা সুন্দরী বশগা কামিনীর ন্যায় আমাদের অনুসরণ করিয়াছেন; আমরাও তাঁহার যথাযোগ্য বেশভূষার বিধান করিয়াছি। কাব্যের চরিত্র-চিত্রে বর্ণবিন্যাস করিতে ক্রটী করি নাই; আমাদিগের অঙ্গুষ্ঠ তূলিকা-তাড়নে ক্লিষ্ট হইয়াছে,—আর কাজ নাই। কবিতা দেবী যে আভরণ পাইয়াছেন, তাই এখন খুলুন আর পরুন; —আর তাঁহার অঙ্গে হাত দিয়া কাজ নাই। দর্শন শাস্ত্রেরও আমরা যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়াছি, তিনিও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। আনুমানিক শাস্ত্রানুচর্চায় কালক্ষেপ করিব, আর আমাদের তেমন অবসর কৈ? আমরা নিৰ্জ্জনে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্ফল আমোদে কালাতিপাত করিব, আর আমাদের তত অবকাশ নাই। এখন ব্যবহারিক শাস্ত্রের অনুশীলন কর। যে বিদ্যার আলোচনায় দারিদ্র নির্ম্মোক হইতে নির্মুক্ত হইয়া সাংসারিক উন্নতি বিধান করিতে পারিবে এক্ষণে তাহাতে মনোনিবেশ কর। শাস্ত্রানুশীলন এবং পঠন পাঠন বিষয়ে যাবৎ আমাদের রুচি পরিবর্ত্তিত না হইতেছে, তৎকাল পর্যন্ত আমাদের অবস্থারও উন্নতি নাই,—হিম-ক্লিষ্টা কমলিনীর ন্যায় সৌভাগ্য লক্ষ্মী দুঃখে মুহ্যমানা হইয়া আমাদের গৃহে অবস্থিতি করিবেন।

ভারতের সুবিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত কর, নানা জাতি প্রস্ফুটিত পুষ্পদাম দেখিতে পাইবে, তাহাদের সৌরভ ভর্ ভর্ করিতেছে, ক্ষেত্র আলো করিয়া আছে; কিন্তু তাহাদিগকে চয়ন করা যায় না,—তুলিতে গেলে পাপড়ী খসিয়া যায়, তাহাতে মাল্যরচনা হয় না; তাই মালাকারের কোন কাজে আইসে না। দেখিলে চক্ষুর প্রীতি জন্মে—এই কেবল সুখ। আবার মধু আছে, তাহার মদিরায় মন মাতিয়া উঠে; কিন্তু সে মধু আহরণ করা যায় না, তাহা মহৌষধের অনুপানও হয় না। মধুকর গুঞ্জনধ্বনি করিতে করিতে শিশিরভারাবনম্র পুষ্পভারে আসিয়া বসে, মধু সংগ্রহ করিতে পারে না। সেই কুসুম সম্পত্তি বিফলে যায়, কালে তাহাতে

(১) কল্পদ্রুমের কোন কোন পাঠক মহোদয় কৌতুককর প্রস্তাব লিখিবার নিমিত্ত মধ্যে আমাকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়া থাকেন কিন্তু এই রুচি আমাদিগের অবনতির কারণ, তাহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই।

ফলও ধরে না। যণ্ডকোষ প্রকাশিত হইল, শুকাইল,—ফল প্রদান করিল না,. কাহারও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে পারিল না। উর্বরা ভূমিতে পুষ্পবৃক্ষ জন্মিল, উর্বরা ভূমির ফলোৎপাদিনী শক্তির হ্রাস হইল, কিন্তু ফল দিল না।

আর্যদিগের ফলগর্ভা ধীশক্তি কেবল অনুমানকল্প পুষ্পরাশি প্রসব করিয়াছে, কিন্তু একটিও ব্যবহারিক বিদ্যা উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই বার এই বহ্নি· এই লৌহ সেই – কিন্তু তবু আমরা বাষ্পপোতে নির্মাণ করিতে জানি না। আজ আমরা নূতন এই অয়সমণির মুখ দেখিতেছি না; অয়সকে চিনি; অয়স্কান্ত লৌহকে বড় ভালবাসে, পাইলে অনুরাগভয়ে টানিয়া বসায়,—তাহা আমরা অনেক দিন হইতে জানি, প্রণয় কয় দিন লুকান থাকে? কিন্তু সেই অকপট পবিত্র প্রেম যে, দিঙ্‌নিরূপণের পরিচায়ক, তাহা ত আমরা বুঝি নাই। সেই প্রণয় যে, উত্তর দিগ্‌ভাগস্থ ধ্রুবনক্ষত্রকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া দেখাইয়া দেয়,—"আমাদের ভালবাসা ঐরূপ নিশ্চল,"—এত দিন আমরা তাহা বুঝিয়াছি কই? বিদ্বজ্জন কত শাস্ত্রে মস্তিষ্ক ঘুরাইয়াছেন, মাথা ঘামাইয়াছেন, কই—একটি কম্পাসের সৃষ্টিও কেহ করিতে পারেন নাই? ভারতবর্ষে অনুমানকল্প বিদ্যারই ভূরি আদর, ব্যবহারিক শাস্ত্রানুশীলনে কেহ কখন বুদ্ধি ব্যয় করেন নাই।

এ দেশে বিদ্যানুশীলন ছিল না, এমত নহে। বিদ্যার আদর; বিদ্যার গৌরব ভারতবাসিরা বিলক্ষণ জানিতেন; বিদ্যাকে তাঁহারা দেবতা-তুল্য পূজনীয় জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা মণ্ডলেশ্বর নৃপতি অপেক্ষাও পণ্ডিতের অধিক সমাদার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্যানুশীলন কেবল ব্যসনে এবং আনুমানিক সুখোপভোগে পর্যবসিত হইয়াছে। চিরকাল বিদ্যালাপ করিলেন, সরস্বতীর সাধনা করিয়া শব্দমন্ত্রে সিদ্ধ হইলেন; কিন্তু ফল কিছুই নাই। সে বিদ্যার জ্যোতি নিকটস্থ কোন দ্রব্যকে আলোকিত করিল না। সে জ্যোতি কোন নিষ্প্রভ পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইল না। যিনি বিদ্যালাভ করিলেন, রাজদ্বার ভিন্ন তাঁহার গতি নাই, জীবিকা লাভেরও উপায় নাই। এক একটি উদ্ভট কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিতেন। নৃপতি পারিষদ্‌গণ লইয়া আমোদে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেন, কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতেন। বিদ্যাবত্তার চরম ফল এই, তাঁহার পৌরুষের পর্য্যন্ত। ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের গুণানুকীর্তন এবং কৌতুককর বাক্য দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করাই পণ্ডিতদিগের বিদ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং আয়ুর্বেদ-বিদ্যার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনুমানসিদ্ধ মীমাংসা লূতাতন্তুর

ন্যায় সর্বত্র সূত্রজাল বিস্তার করিয়া আছে। পরীক্ষা দ্বারা কোন বিষয়ের ভ্রম-সংশোধন করিতে আমাদের তাত্ত্বিকেরা কখন অগ্রসর হন নাই। সিদ্ধান্তপথে কোন সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল, করপুটে কল্পনা-দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভারতের প্রতি কেমন তাঁহার শুভদৃষ্টি, তাত্ত্বিকেরা অমনি একটা মীমাংসা করিয়া বসিলেন। গৃহে থাকিয়া কোটি যোজনের সংবাদ দিলেন। এদেশীয় চিন্তাশীল তাত্ত্বিকেরা অসামান্য ধীশক্তিবলে অনুমান-সিদ্ধ বিদ্যার যাদৃশ উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, যদি বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহাদের মন নিবিষ্ট থাকিত এবং পদ পদার্থ ও তত্ত্বনির্ণয় হেতু যদ্যপি তাঁহারা যথোপযুক্ত পরীক্ষাকে সহায় করিতেন, তবে আজ কোন্ জাতি আমাদের সমকক্ষ হইতে পারিত ?

আমরা অনুসন্ধিৎসু এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সে পক্ষে আমাদের কোন দোষ নাই। কোন একটি অলৌকিক অদ্ভুত বিষয় দেখিলেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে অনিবার্য্য ঔৎসুক্য জন্মে। আমাদের দোষ আমরা কল্পনার প্ররোচন-বাক্যে ভুলি। আমরা অনুমানকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি, অল্পেই আমাদের পরিতোষ হয় ; অনুমান যা বলিলেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলাম।

কি কারণে আমরা অনুমানসিদ্ধ বিদ্যার এতাদৃশ আদর করি ? কায়িক শ্রমসাধ্য ব্যাপারে কি কারণে আমাদের বিজাতীয় ঔদাস্য ? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ (২) কহেন যে, ভারতের উপভোগ্য দ্রব্যের সচ্ছলতাই আলস্যের মুখ্য কারণ, এবং অলস ব্যক্তিরাই নিশ্চিন্ত চিত্তে আনুমানিক বিষয়ের কল্পনা করিতে অবসর পায়। ভরতবাসীকে যদ্যপি অর্থাগমের কোন সদুপায় দেখাইয়া দাও, শ্রমসাধ্য হইলে অমনি বলিয়া বসিবেন—অত হঙ্গাম কে করে ?

এ কথা তুমি বল না, আমি বলি না ; তোমার প্রতিবেশীকে বলিতে শুন, কিন্তু তাহারাও বলে না। তুমি, আমি ও অন্যান্য সকলে, কেবল উপলক্ষ মাত্র, আলস্যই দীক্ষাগুরু হইয়া সকলকে এমন কথা বলাইতেছে। কেন—আলস্য বলাইলে আমরা বলি কেন ? ঈদৃশ অযৌক্তিক বাক্য আমাদের জিহ্বাগ্রে কেন উচ্চারিত হয়। শাকান্নে কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত হইতেছে, তাই বলি ; সে কারণ এ প্রকার অসদৃশ (৩) বাক্য উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু কোন প্রকারে জীবিকা লাভের উপায় না দেখিলে, বিজ্ঞানের আনুকূল্য গ্রহণ করিতে হইত ; সুতরাং নানাদিকে বুদ্ধি প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইয়া পড়িত।

---

(2) Buckle's history of Civilization.

পরন্তু ইউরোপীয় তাত্ত্বিকেরা আমাদের নিশ্চিন্ততা এবং আলস্যের যে রূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমরা আর একটি বলবত্তর হেতু দেখিতেছি। কেন আমরা আত্মোৎসর্গ করিয়া অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্তের পদানত হইয়া থাকি, তাহার আর একটি প্রধান কারণ আছে। সে কারণটির যথোচিত সদ্ব্যবহার করা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু অসদ্ব্যবহার তেমনি ঘৃণার্হ ও উপহাসজনক। গোপন রাখিব না, বলি,—হিন্দুদিগের দৈবশক্তির প্রতি অচলা শ্রদ্ধার কথাই আমরা উল্লেখ করিতেছি। হিন্দুদিগের বিষয়-ব্যাপারে, রোগ শোকে কিম্বা বিপত্তিকালেই হউক, যখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া পড়েন, তখন প্রতিবিধান চেষ্টা করেন,—কিন্তু দৈবানুষ্ঠার দ্বারা, মানবশক্তিকে আর বিশ্বাস করেন না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনীতে পুনঃপুনঃ যদ্যপি তরণী জলমগ্ন হয়, এমনি আমরা ভক্তিপরায়ণ ও সরলপ্রকৃতি লোক, নৌবিদ্যায় এবং পোতনির্ম্মাণের উপকর্ষসাধনে কিছুতেই মনোনিবেশ করিব না. একাসনে নিরশনে পরিত্রাতা জগৎপতির কেবল নাম স্মরণ করিতে বসিব,—জপমালা ঘুরাইয়া দশ লক্ষ বার তাঁহাকে ডাকিতে থাকিব। তরুণী কেন জলমগ্ন হইল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিরূপ উন্নতিবিধান করিলে, কি কৌশলে নৌকা চালাইলে আর বিপদ ঘটিবে না, স্ফুরদ্বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্যও সে চিন্তা চিদাকাশে উদিত হইবে না; জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার্চ্চনা দ্বারাই বিঘ্নোপশান্তি করিব, এই আমাদের কামনা। কেহ উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন, চিকিৎসকের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; তখন আর উপায় কি?—পুরোহিত

(৩) স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন, বহুকাল পূর্বে উক্ত পণ্ডিতকুলতিলক সেই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সারউলিয়ম জোন্স জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—পণ্ডিত। এদেশে ত এমন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান আছেন, তবে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অনুশীলন নাই কেন? জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন উত্তর করিলেন,—বোধ হইতেছে আপনাদের রাজ্য অত্যন্ত দরিদ্র। আমরা শাকান্ন ভোজন করি, সামান্য বস্ত্র পরিধান করি; আপনারা নানা দুর্লভ দ্রব্য ভোজন করেন, এবং নানা প্রকার দুর্মূল্য বস্ত্র পরিধান করেন, তথাপি আমাদের অপেক্ষা আপনি দরিদ্র। উদর জ্বালায় কত দূরে আসিয়াছেন! আমাদের অভাব স্বল্পায়াসে বিদূরিত হয়, নহিলে আমরাও বিজ্ঞানবলে কতদূরে গিয়া পড়িতে শিখিতাম।

বলিহোমাদি দৈবক্রিয়া করিতে বসিলেন। যে বিপৎকাল অন্যজাতিকে নূতন আবিক্রিয়ার পথ প্রদর্শন করে; আমরা বনবাসী ঋষিকুমার—সংসারে আমাদের তিতিক্ষা, দৈবকার্য্যে অচলা ভক্তি,—সেই বিপৎ কাল আমাদিগকে ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দারুময় ক্ষুদ্র তরণী প্রবল সাগরবেগ সহিতে অক্ষম; ভাঙ্গিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া জলমগ্ন হয়; আমরা তাহা দেখিব না, ক্ষীণ উপাদানের পোত সাগরের যোগ্য নহে, সে কথা আমরা শুনিব না,—দৈববলে তাহাকেই সাগরে ভাসাইব। আমরা দৈববলকেই সার ভাবিয়াছি, নিজ শক্তির প্রতি আমাদের আস্থা নাই, সে কারণ আমরা সাংসারিক উন্নতি করিতে পারি না। ঐশী-শক্তিকে সহায় করিয়া যাবৎ আমরা আত্মবিক্রম বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রসারণ করিতে যত্নবান না হইব, তৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতি হইবে না।

এক্ষণে আমাদের অবস্থার নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। আর যে আমরা অনুমানসিদ্ধ রসবোধক, হাস্যোদ্দীপক, কূটার্থক কাল্পনিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিব, সে দিন নাই। শিশিরোন্মথিত সুখের শতদল ম্রিয়মান হইয়াছে, নিবিড় কুজ্ঝটিকা সৌভাগ্যসূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আর আমরা দুটি রসাত্মক শ্লোক লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, দুটি কৌতুককর উপন্যাস পাঠ করিয়া কাল কাটাইতে পারি না। "ঘটাকাশ" আর আমাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখিতে পারিবে না; তৈলই পাত্রের আধার হউক, আর পাত্রই তৈলের আধার হউক, সে অনর্থক, কচকচিতে আর আমাদের কোন ফলোদয় নাই। এখন সাংসারিক উন্নতিবিধায়ক ব্যবহারিক শাস্ত্রের অনুশীলন করা আবশ্যক। পাঠক! ইংলণ্ডের এখন যদ্রূপ বৈজ্ঞানিক উন্নতি দেখিতেছেন, লর্ড বেকনের পূর্বে তদ্দ্বীপের এমন অবস্থা ছিল না। তদানীন্তন ব্রিটিশজাতি আমাদের ন্যায় কেবল অনুমানসিদ্ধ কাল্পনিক তত্ত্বানুশীলনে অনুরক্ত ছিলেন, কূটতর্ক ও কূটমীমাংসাতেই তাঁহারাও সম্প্রীত হইতেন। সুতরাং সমাজের অবস্থা কিছুমাত্র মার্জিত বা উন্নত হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক পণ্ডিতেরা কল্পনার বড় সোহাগের পুত্র ছিলেন; কল্পনা তাঁহাদের অঙ্গুলি ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিতে শিখাইতেন,—তাঁহাদেরও সমস্ত সিদ্ধান্তে কল্পনার আকারেঙ্গিত প্রকাশিত আছে, সে কারণ আর্য্যজাতি অপেক্ষা তাঁহারাও উন্নতিমার্গে অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, গ্রীশ এবং রোমবাসিরা নানা বিষয়ের পরীক্ষা করিতেন, তজ্জন্য কোন কোন ব্যবহারিক বিদ্যায় তাঁহাদের গুণবত্তার এবং সামাজিক উপকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮২৩ অব্দে কলিকাতায় একটি উপযুক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপনের কল্পনা করা হয়।

বিদ্যালয়ে কি প্রকার বিদ্যা অধ্যাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে মতবৈষম্য ঘটিতে লাগিল। যে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রচারে আজ আমাদের মুকুলিত নয়নযুগল প্রস্ফুটিত হইতেছে, তদানীন্তন বাঙ্গালিরা তাহার ঘোর বিদ্বেষ্টা ছিলেন। তাঁহাদের এতাদৃশ দৃঢ়তর কুসংস্কার ছিল যে, ঘুণাক্ষরেও হঠাৎ একটি ইংরাজি শব্দ হিন্দুজাতির মনে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের চিত্ত কলুষিত করিয়া দিবে। সে কারণ সংস্থাপ্য বিদ্যালয়ে যাহাতে সংস্কৃত এবং পারসিক বিদ্যার অধ্যাপনা চলে অনেকেই তন্মতের পক্ষপাতী হইলেন। এ দেশে যাহাতে পাশ্চাত্যজ্ঞান প্রচারিত এবং ব্যবহারিক বিদ্যার অনুশীলন হইতে থাকে, তৎপক্ষে মৃত মহাত্মা রামমোহন রায় বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। (৪) সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনে পাঠকেরা কিছুমাত্র সারগর্ভ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। যাহাতে এ দেশীয় লোকে গণিতশাস্ত্র, প্রাকৃততত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি মহোপকারী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন, তজ্জন্য সানুনয় নির্ব্বন্ধ সহকারে রামমোহন রায় লর্ড অক্‌লাণ্ডকে এক খানি পত্র লেখেন তিনি যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎই বিলক্ষণ সসার এবং যুক্তিসঙ্গত।

এ দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া যিনি যতই কেন পাণ্ডিত্য লাভ করুন না,

(4) We find that .the Government are establishing a Sanskrit School under Hindu Pandits to such knowldedge as is already current in India. This seminary similar in Character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth wish grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to Society. + + × But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics Natural philosophy Chemistry Anatomy with other useful Sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning Edueated in Europe and providing a collegefurnished with necessary books, instruments and other apparatus.

কিন্তু তদ্দ্বারা মনুষ্যের অবস্থার কিছুই উন্নতি বিহিত হয় না। কেহ অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন; কাব্যের দোষ গুণের বিচার করিলেন, শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিলেন, মর্মভেদক দুইটি রসময় কবিতায় মন মোহিত করিলেন। কেহ স্মৃতিশাস্ত্রে দক্ষ হইয়া পঞ্চবর্ষ বয়স্ক মৃত শূদ্র বালকের অগ্নিসৎকার্য্য বিধি আছে কি না, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি, এই সকল মাথামুণ্ড কতকগুলো ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। যিনি সার্বভৌম নৈয়ায়িক হইলেন, তিনি ত একেবারে আলমাটী চাল করিয়া তুলিলেন। শিখার ঝাপটে, হাতের চাপটে, মুখের দাপটে আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিলেন, এক ধূমের ব্যভিচার দেখাইয়া জগৎকে ধোঁয়া দেখাইলেন। এইরূপ মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের যতগুলি উচ্চ অঙ্গে বর্ত্তমান আছে, তদনুশীলনে সমাজের উন্নতি বা ইষ্টসিদ্ধি নাই।

আমাদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে শ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ প্রকার ব্যবহারিক শাস্ত্রের অনুশীলন করা চাই। সমাজের এতাদৃশ উৎসাদ দশায় যদ্যপি আমরা মিথ্যা আমোদে বিহ্বল থাকি তবে এই খানেই আর্য্যজাতির অন্তিমকাল উপস্থিত। যেমন সুমধুর গীতবাদ্য শুনিলে দেহে বলাধান হয় না, ক্ষণকালের জন্য মনের তৃপ্তি জন্মে এই মাত্র। আমাদের প্রচলিত অধীত্য সংস্কৃত শাস্ত্রগুলিও তদ্রূপ, তাহাতে ক্ষণিক মনের প্রীতি জন্মে, কিন্তু কোন প্রকার সাংসারিক উপকারসিদ্ধি হয় না। এক্ষণে প্রত্নতত্ত্বানুশীলন, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা, দেহতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যাধ্যয়ন না করিলে আমাদের কল্যাণ সাধনের আর উপায়ান্তর নাই। ভোজনান্তে যেমন অম্লরসের ছিটা মুখের স্বাদ পরিবর্ত্তন এবং পরিপাক ক্রিয়ার অনুকূল, কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তির অম্ল ভোজন কেবল রোগের কারণ; এখন কৌতুককর উপন্যাস এবং কাব্যালোচনা আমাদের পক্ষে ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে। সমাজের এই আসন্ন দশায় কাব্যাদি পাঠে মনুষ্যকে কেবল বৃথা রসের রসিক করিয়া ফেলিবে, শ্রমসাধ্য প্রকৃত বিদ্যানুচর্চ্চায় যত্নবান্ হইতে দিবে না। নানাবিধ নীরস শাস্ত্রানুশীলনে চিত্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সময়ে সময়ে দুই এক খানি কাব্য পাঠ করিলে মনের স্ফূর্ত্তি পুনরুদ্রিক্ত হইতে পারে, আবার নূতন কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার শক্তি জন্মে।

সমাজের উৎসাদদশায় প্রত্নতত্ত্বানুশীলন মহোপকারী। যাহার পূর্বতন জাতীয় গৌরব ও প্রতিপত্তি নাই, তাহার অভিমানও নাই,—তাহার আসন্ন চিত্তকে উত্তেজিত করিতে আর উগ্র ঔষধও নাই। মহদ্বংশজাত কোন ব্যক্তি হীনাবস্থায়

পতিত হইলেও যত্তপি তাঁহাকে একটি অমর্য্যাদার কথা বলা যায়, অমনি তিনি বলিয়া উঠেন,—"জানিস্ না, এখনও আমি মরি নাই।" সেই পূর্ব্ব প্রতিপত্তি স্মরণে তাঁহার হৃদয় অভিমানে স্ফুরিত হইয়া উঠে। তিনি আপনার কুলগৌরব রক্ষা করিতে উৎসাহিত হন। যাহার এমন অভিমান নাই, সে মানুষ নয়—নিতান্ত অপদার্থ, তাহার কিছুই নাই (৫)।

জার্ম্মণ রাজ্যের নিতান্ত পতনদশা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা অতিশয় হীনবীর্য্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকৃতকলাপের আলোচনা করিয়া, পূর্ব্বগৌরব, লইয়া আন্দোলন করিয়া দিন দিন নবোৎসহে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন, আজ তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য লইয়া উঠিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বপুরুষের সাহিত্যসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অস্তমিত গুণ গরিমার আলোচনা করিতেছি, খরোষ্ণ বীরশোণিত যেন আমাদের শিরাকে উত্তেজিত করিয়া নাবাইয়া দিতেছে, আবার যেন সেই গভীর পাঞ্চজন্য নিনাদ হৃদয়ে আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে। বীরাত্মজ, বীরবংশধর, ভারতের বীরমাটীর বরপুত্রেরা আজ ধূলায় ধূসর ; আবার যেন সকলে বিস্ফারিতচক্ষে অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া উঠিতেছেন। কর্ণ পাতিয়া শুন দেখি, সেই কপিধ্বজ রথের চক্র সংক্রমণজনিত ঘর্ঘর ঘোর সংঘর্ষধ্বনি শুনিতেছ না ?—আবার কি আখণ্ডল-ত্রাস প্রচণ্ড গাণ্ডীব-নির্ঘোষ কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে না ? মনকে নাচাইতেছে, আবার সেই বীরমদে মাতাইতেছে। আবার সেই শূরদর্পের বীজমন্ত্র কাণে আসিয়া পড়িয়া দিতেছে। নীরবে স্তব্ধ আছে—ক দিন থাকিবে ? নিদ্রা-ভরগুরু পক্ষ্মপুট কতক্ষণ আলস্যে ঢুলিবে ? এখনি নিদ্রাভঙ্গ হইবে, অঙ্গের সাপটে এখনি মেদনী ফাটাইয়া দিবে।

প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে সমাজের এই গৌণ ফল। মুখ্যফল আর একটী আছে। সমাজে যাহা ভাল ছিল, এখনও থাক,—যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া থাকিব। যে তেজস্কর অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জাতীয়ভাব নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পড়িতেছে, পুনর্বার তাহাকে

(5) A people that could feel no hride in the past, in its history and literature lost the mainstay of its national character, when Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the study of the future from the past. Something of the same kind was now passing in India.

Max Muller

সঙ্কুচিত করিব। যে সমস্ত আচরণ গ্লানিকর, সমাজ হইতে তাহাদিগকে বিদায় দিব। যাহা নাই, আর্য্যসমাজে এখনও যে সদাচরণ প্রবেশলাভ করে নাই, অপরের নিকট তাহা ঋণ করিব। এই মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমরা স্বজাতি পুরাবৃত্ত পাঠ করি।

ইতিহাস মনুষ্যের উন্নতিমার্গের প্রধান পথপ্রদর্শক। কোন্ জাতি কি উপায়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কোন্ জাতির কীদৃশ দুর্নীত জন্য অধঃপতন হইয়াছে, পুরাবৃত্ত আমাদিগকে সেই সকলের যথাযথ পরিচয় দিয়া থাকে। ইতিহাস আমাদিগের কার্য্যকলাপের আদর্শ, ইতিহাস দৃষ্টে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্বপরীক্ষিত পথে বিচরণ করিতে পারি। আমাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রথমানুষ্ঠান হইতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় না, পুনঃপুনঃ আমাদিগকে অবিচার্য্যপথে প্রতারিত হইতে হয় না। পূর্বপুরুষেরা পরীক্ষা দ্বারা যে পথ সুগম দেখিয়া গিয়াছেন, আমরা এককালে সেই পথে গিয়া দাঁড়াইতে পারি। যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহাদের সকলকেই নতুন নতুন পথে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়, বারম্বার ভ্রমে পড়িতে হয় উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।

এখন প্রাণীতত্ত্ব, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের মহোপকারিতা দেখুন। এই কয়েকটি বিদ্যাশিক্ষার দূরতরবর্ত্তী গৌণ ফল দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, আমরা ইহার একটি সাক্ষাৎ ফল দেখাইতেছি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিকার্য্যই এতদ্দেশীয় লোকের উপজীব্য। কিন্তু কৃষিকার্য্যে মণ্ডল মহাশয়ের কৃষক যাহা করে তাহাই হয়। আলকাতরা অনুলিপ্ত তনু কৃষক সমূহ বুদ্ধিতে হস্তীর স্থূলতা বিধান করিতে করিতে, লাঙ্গল লইয়া বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল,—বুদ্ধিতে বল, বিবেচনায় বল, সকল বিষয়ে সে বৃষেরই পশ্চাদ্গামী,—প্রত্যুষে উঠিয়া মাটে চাস দিতে চলিল। কোন্ দিকে যাইতেছে, জানে ; প্রত্যহ যে দিকে যায়, সেই দিকে যাইতেছে ; সে উত্তর পূর্ব জানে না, প্রত্যহ যাতায়াত করে, তাই বৃষভের ন্যায় একটা দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার জন্মিয়াছে। সে ক্ষেত্রে গেল। প্রতি বৎসর ভূমি কর্ষণ করে, এবারও করিল ; ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাই গৃহে আনিল। অধিক ফসল হইল যদি, লোকে বলিল এবার সুজন্মা ; অল্প ফসল হইল যদি, লোকে বলিল এবার দুর্বৎসর। কেন ?—কলিতে বসুমতীর শস্য হরিয়াছে।

চাস হইল, চাসের ফলাফল এবং তাহার কারণ ব্যাখ্যা হইয়া গেল ; কিন্তু কলির ধর্ম রোধ করিতে কেহ যত্ন করিল না। কে করিবে ?—হস্তি-মূর্খ কৃষক তাহার কি জানে ? পূর্বে ঋষিরা স্বয়ং কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতেন ; এখন তাঁহারা সকাল

সকাল গঙ্গাস্নান করেন, শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পুণ্ড্র টানিয়া ফোটা করেন, গোহত্যা হইলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন।

এই কৃষিকার্য্যে যথোচিত উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রথমে রসায়ন বিদ্যার আবশ্যক। কোন্ ভূমিতে কিরূপ সার দিলে ক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি হয়, রসায়ন বিজ্ঞান দ্বারা তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোন্ ভূমিতে কিরূপ শস্য কিম্বা বৃক্ষাদি প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে; কোন্ বীজের কিরূপ গুন; কোন্ বীজ উৎকৃষ্ট ও কোন্ বীজ অপকৃষ্ট, উদ্ভিজ্জবিদ্যা দ্বারা এই সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কৃষিকর্মোপযোগী মহিষাদি কি রূপে সুস্থ থাকিবে, শস্যে কীটাদি লাগিলে কি কৌশলে তাহাদের ধ্বংস হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় প্রাণিতত্ত্বের অধীন। আমেরিকাবাসী কৃষকগণ এইরূপ বিজ্ঞান বলে কৃষিকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে, তজ্জন্য আজ তাহাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার উপকারিতা অকথনীয়। এই তাড়িতবার্ত্তাবহ, এই বাষ্পযান সকলি গণিত শাস্ত্রের এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইউরোপের আজ এত সমারোহ এত সুখ সমৃদ্ধি বিজ্ঞানানুশীলনই তাহার একমাত্র উপায়। ইউরোপীয়েরা যদ্যপি আজ আমাদের মত কেবল ব্যাকরণের সূত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, টিকার উপর টিপ্পনী করিতেন, সংসারের অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেন, তবে কি আমরা তদ্দেশকে এতাদৃশ সমৃদ্ধ দেখিতে পাইতাম? লর্ড বেকনের সময় পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বড় একটা প্রভেদ ছিল না। অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডাই তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার সারভূত ছিল, অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে পারিলেই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত; সুতরাং তৎকালে ইউরোপের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। যে দিন তথায় বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হইল, বাষ্প কলে করুণ ব্রহ্মা আসিলেন, তাড়িতকলে সৌদামিনী আসিলেন, কমলা আর কোথায় থাকিবেন?—তিনিও বিজ্ঞানবলে ইউরোপের হিমার্দ্র মৃত্তিকায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মী ইউরোপের মৃত্তিকা আলো করিয়া বসিলেন।

পাঠক! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, ক্ষণেক তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আর কি নাটকখানি, নবেলখানি লিখিয়া নিরস্ত থাকা উচিত? আপনাদিগকে হাসাইব, আপনাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিব, একজন বাহাদুর পুরুষ হইয়া উঠিব, তাই কি দুটা কৌতুককর গল্প লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতে হয়? আপনাদের শুষ্কমুখে হাসি আসিবে কেন? অন্তর্দ্দাহে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, মুখে কি এক গণ্ডুষ জল দিলে

বিরস মুখ সরস হইয়া উঠে? এখন সকলে কায়মনোবাক্যে সারবান্ সুপাঠ্য বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করুন; যাহাতে আমাদের অবস্থা মার্জিত ও উন্নত হইতে পারে, এমন বিদ্যার অনুশীলন করুন। বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্র নীরস ও জটিল সন্দেহ নাই, সহজে বোধসুগম হয় না; কিন্তু অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করিলে সকলই অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে অভ্যাসের নিকটে সকলই পরাভূত হয়। ভারতের মুখশ্রী ফিরিবে, আপনাদের রুচি ফিরাইয়া সারবতী বিদ্যায় নিয়োজিত করুন।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা

"ব্যবসায়ীরা আয় ব্যয়ের হিসাব লিখিয়া রাখেন, আয় ব্যয় দেখিয়া তাহারা বাণিজ্যের লাভালাভ নিশ্চিন্ত করেন। ইতিহাস জাতীয় উন্নতি অবনতির সেই আয় ব্যয়ের হিসাব। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীর সম্মান কেমন ছিল, নিজে আমরা আমাদের জমার ঘরে বাকী কাটিয়া স্পষ্ট লাভালাভ বুঝিতে পারি।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

* প্রবন্ধটি 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা এই নামে তিনি লেখক জীবনের প্রথম দিকে 'শর্ম্মা' টাইটেল ব্যবহার করতেন।

প্রসঙ্গ : বিশ্বকোষ ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ড. বারিদবরণ ঘোষ

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ প্রবর্তক ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিলাত যাওয়ার মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য যোগসূত্র আছে বলে আমার মনে হয়েছে। আগে সেকথাটি সবিনয়ে নিবেদন করি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তাঁর 'কঙ্কাবতী' অথবা তাঁর ফোক্‌লা দিগম্বর, ডমরুধর বা লুল্লুভূতের সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন শিক্ষিত বাঙালী থাকে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ তদানীন্তন ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে চাকরি পান। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম শহরে একটি মহামেলা বসানো হয়। সরকার ত্রৈলোক্যনাথকে সেই মেলায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি যাবার জন্য অনুরোধ করেন। ত্রৈলোক্যনাথের যাবার ইচ্ছে ছিল ষোল আনা। কিন্তু আত্মীয় স্বজনেরা বাদ সাধলেন বলে যাওয়া হল না। যাঁরা আপত্তি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। আপনারা তাঁকে প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল (তাই কি?) যা-ই বলুন—ঘটনার গতি এভাবেই চলছিল। শেষ অবধি আত্মীয়দের মতের বিরুদ্ধেই ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত গিয়েছিলেন। তাঁর এই বিলাত যাত্রার প্রতিক্রিয়া 'বিশ্বকোষে'ও এসে পড়েছিল। তার কথা পরে বলছি।

ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বিদেশ যেতে পারলেন না বটে কিন্তু এ সময়ে তাঁকে একটি শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদনের তালিকা তৈরি করে দেবার জন্যে ভারত সরকারের তরফ থেকে সম্ভবত স্যার রিভার্স টমসনের অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ 'A Rough List of Indian Art-manufactures' নামে একটি সরকারী তালিকা প্রণয়ন করে দেন। ভারতে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার তালিকা নির্মাণ করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ অভিধানের বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি মূলধন করেন। আমার মনে হয়, সে সময়েই তাঁর মনে বাংলায় একটি অভিধান ও কোষগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা উদিত হয় এবং এবিষয়ে তিনি দাদা রঙ্গলালের পূর্ণ সমর্থন পান।

রঙ্গলাল ছিলেন একজন বড় মানের চিকিৎসাবিদ এবং একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতও। তাঁদের বাড়ি ছিল চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরের মাইল দুয়েক পূর্বদিকে রাহুতা গ্রামে। সেকালে অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামেই ছাপাখানা ছিল। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর নিবাস বহড়ু গ্রামে ছাপাখানা খুলেছিলেন। বনোয়ারিবাদের ছাপাখানাটি তো পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ছাপাখানা। দাদাঠাকুরের ছাপাখানার কথাও অনেকের অজানা নয়। রাহুতা গ্রামেও মুখোপাধ্যায় ভাই দুটির চেষ্টায় একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। অনুমান করি, এই ছাপাখানা সূত্রেই তাদের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগরিত হয়েছিল। যদিও এই ছাপাখানা সূত্রেই প্রতিবেশীদের কারও কারও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছিল। এই ছাপাখানাতেই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথের উদ্যোগে 'বিশ্বকোষ' ছাপার কাজ শুরু হয় যদিও পরবর্তী মুদ্রণের কাজ গ্রামের প্রেসে সম্পাদিত না হয়ে কলকাতার ৫নং রামধন মিত্র লেনের এক প্রেসে স্থানান্তরিত হয়। সেই প্রেসেই পরে 'বিশ্বকোষ' প্রেস নামে পরিচিত হয়। কিন্তু 'বিশ্বকোষ' এর প্রথম খণ্ড খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে, তার আখ্যানপত্রে 'রাহুতা। বিশ্বকোষ যন্ত্রে শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।'—এই পরিচয়টি। বিশ্বকোষের মত একটি গুরুগম্ভীর কাজ গ্রামের ছাপাখানায় মুদ্রিত হচ্ছে ভাবলে বিস্ময় এবং আনন্দ—যুগপৎ দুই অনুভবই ঘটে। লেখার কাজটি প্রধানত শুরু করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু রঙ্গলাল বহু প্রসঙ্গ রচনার ভার নিজের হাতে নেন। বিশেষত শরীর সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গগুলি তাঁরই রচনা হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য সাহিত্য ও বিকাশের নানা বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের অধিকার ছিল অবিসংবাদী।

মোটামুটিভাবে কাজ চলছিল। 'অ' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়ে প্রথম খণ্ডের মুদ্রণ 'অ' বর্ণেই শেষ হয় ৬৯৬ পৃষ্ঠায়। এর ৬৮৯-৬৯৪ পৃষ্ঠায় আছে 'অহিফেন' প্রসঙ্গ। মোটামুটি অনেকেই জানেন, যে ত্রৈলোক্যনাথ সরকারী চাকরি পেয়ে লণ্ডনে চলে যান। ফিরে এসে সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকায় বিশ্বকোষের দ্বিতীয় কাজ আর শুরু হয়নি। নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষের শব্দ সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিলেন। অনেকে তখন তাঁকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে বলেন। তরুণ নগেন্দ্রনাথ যখন দ্বিধান্বিত ছিলেন, তখন একদিন দেবী কর্তৃক স্বপ্নে একাজ গ্রহণের জন্য নাকি আদিষ্ট হন এবং তারই ফলে তিনি পুনরায় বিশ্বকোষ প্রকাশ শুরু করেন। সে অন্যবিধ কথা—এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। কিন্তু এসব তথ্যের মাঝখানে আর একটি তথ্য গোপনে কাজ করেছিল। তারই ফলে রঙ্গলাল-

ত্রৈলোক্য-সম্পাদিত এই মহৎ সূচনাটির সমাপ্তির দায়িত্ব অন্যের কাছে বর্তে যায়। সেটি এখানে নিবেদন করি। 'গ্রন্থমেলা' প্রকাশন সংস্থা প্রকাশিত 'ত্রৈলোক্য রচনা সমগ্র'-এর প্রথম খণ্ডে ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত একটি স্মৃতিকথা 'পিতৃস্মৃতি' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। এর 'একুশ' পৃষ্ঠায় সুধীরকুমার বিশ্বকোষ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত তথ্যটি প্রদান করেছেন—ত্রৈলোক্যনাথ "তাঁহার দাদা রঙ্গলালের সহযোগিতায় রাহুতা গ্রামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ……এই ছাপাখানাতেই বাবা ও জেঠা মহাশয়ের উদ্যোগে বিখ্যাত 'বিশ্বকোষ' ছাপা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে ছাপাখানা ও বিশ্বকোষের স্বত্ব স্থানান্তরিত হইয়া যায়। এই সময় সরকারী কাজে বাবা পর পর দুইবার বিলাতে প্রেরিত হন। আমার জেঠা মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ। তিনি বাবার এই বিলাত যাত্রা সমর্থন করিতে পারেন নাই।

"জেঠা মহাশয় বাবাকে বিলাত যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বাবা বলিলেন যে চাকুরীর খাতিরে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। এই লইয়া আত্মীয়দের মধ্যে খুবই বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।…কিন্তু ইহার কিছুদিন পরই আবার যখন বিলাত যাইবার উদ্যোগে করিলেন তখন জেঠা মহাশয় রাগ করিয়া ৺নগেন্দ্রনাথ বাবু মহাশয়কে ডাকিয়া ছাপাখানা ও বিশ্বকোষের স্বত্ব তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন এবং স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বীরভূমের লাঘোষা গ্রামে গিয়া ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথ বাবু মহাশয় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। এইভাবে বিশ্বকোষ হস্তান্তরিত হইল।"

কাজেই দুটি ব্যাপার স্পষ্ট হল—(১) স্বত্ব দান করলেন রঙ্গলাল—অতএব তিনিই ছিলেন বিশ্বকোষের প্রধান প্রবর্তক এবং প্রধান স্বত্বাধিকারী; (২) লাঘোষা গ্রামে রঙ্গলালের চলে আসার প্রধান কারণ এই বিশ্বকোষ। আর অন্যতম সম্পাদকও তিনিই ছিলেন। বিশ্বকোষ—১ম খণ্ড ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কোষগ্রন্থের বিষয়বস্তু এর আখ্যাপত্রে এইভাবে নির্দেশিত আছে: "যাবতীয় সংস্কৃত বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত: বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদিক ও হাকিমী মতে

চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা ; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ব ; পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।"

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সম্পাদকদ্বয় [শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত] তাঁদের 'বিশ্বকোষ'-কে 'বৃহদভিধান'ও বলেছেন। বাস্তবিকই এটি একই সঙ্গে বিশ্বকোষ এবং শব্দাভিধানও তাই অ-কারাদি ক্রমে নানা শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ নিরূপণ প্রভৃতিও করা হয়েছে। 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার' পুরানো সংস্করণ যাঁরা দেখেছেন—তাঁরাও তার এই আভিধানিক চরিত্র দেখেছেন নিশ্চয়ই। পরে তা পরিত্যক্ত হয়।

'বিশ্বকোষে'র ৩-২৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি উপক্রমণিকায় এর সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য কথা পরিবেষিত হয়েছে। যেমন 'এই পুস্তকে পানিনি প্রভৃতির যে সকল প্রত্যয়াদি গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা'-ও আছে। বিভক্তি, বৎ, তদ্ধিত প্রত্যয়, হলন্ত ইত্যাদি, প্রয়োগের নানা বিধিনিয়ম নির্দেশিত হয়েছে। নানা বিচিত্র বিষয়, যেমন 'অন্ধকূপহত্যা' (পৃ. ৩৫১-৫২), মকড়ম চক্র, অষ্টাকষ্টী (একধরনের পাঁচঘরা ছকের খেলা) প্রভৃতি প্রসঙ্গে এটি মূল্যবান। প্রয়োজন ক্ষেত্রে নানা ছবি ব্যবহার করে প্রসঙ্গগুলিকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এক একটি ছবি খুবই মূল্যবান ও দুর্লভ। যেমন 'অকা' নামক আমাদের উপজাতিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ছবি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণে বলা হয়েছে—'এখানে মিজুমিশ্মী-সর্দারের প্রতিমূর্তি দেওয়া হইল। অকা এবং মিশ্মীরা কি প্রকার সভ্য বেশভূষা পরিয়া থাকে এই চিত্রপট তাহার প্রমাণ।' এই ছবি তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন ১২৯১ বঙ্গাব্দের কলিকাতা প্রদর্শনী থেকে। 'অক্সিজেন, অক্‌ষিজেন' —এই বিজ্ঞান প্রসঙ্গটি তার Symbol 'O' দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরে Atom-কে বলা হয়েছে রূঢ়সূক্ষ্মাংশ ও Moleenle-কে সূক্ষ্মাংশ বলে এদের atomic weight ও Molecular weight বলা হয়েছে যথাক্রমে অ ১৫. ৯৬ এবং অ ৩১.৯২। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.১০৫৭। ছবি আছে 'অঙ্কুর' এবং 'অঙ্গামী নাগা' প্রভৃতি প্রসঙ্গের সঙ্গেও। আমার মনে হয় শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি—যেমন, অতিসার (দীর্ঘপ্রবন্ধ ১৫০-১৫৮), অন্তমোড়া (Helicteres Isora সচিত্র), অন্ত্রবিরোধ (Obstruction of the bowels), অহিফেন (পৃ ৬৭৯-৯৪) প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিচয় রঙ্গলালেরই রচনা।

আরও নানাপ্রসঙ্গ এতো ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান যে তা লিখে শেষ করা যায় না। 'অলঙ্কার' প্রসঙ্গে মস্তকের অলঙ্কার হিসাবে গর্ভক, ললামক, আপীড়,

বালপাল্যা, পারিতথ্যা, হংসতিলক অথবা গলার হার হিসাবে বজ্রসঙ্কলিকা, বৈকক্ষিক, ভ্রামর বা নীললবণিকা প্রভৃতির নাম আমরা কজন জানি? আবার ৩৫ম পৃষ্ঠায় 'অন্নদামঙ্গল' প্রসঙ্গে এমন তথ্যও নিবেদিত হয়েছে—'অন্নদামঙ্গল রচনা করিবার সময় কৃষ্ণচন্দ্র রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে লেখক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নীলমণি সমাদার নামক জনৈক গায়ক মধ্যে মধ্যে গানের সুর দিতেন এবং অন্নদামঙ্গলের পালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাজসভায় গান করিতেন।'

আমাদের সৌভাগ্য নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষের পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার এই বিশেষ দিকের সূচনা পর্ব মাত্র আমরা জানলাম—এর বিকাশ পর্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল না। তাঁরা একে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেলে আমরা অন্য এক রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যকে পেতাম।

"সহরে লোকেরা রাত্রিদিন নাকে কাপড় ঢাকা দিয়া বেড়ায়,
এইজন্যই সশরীরে প্রত্যক্ষ নরক ভোগ আরম্ভ হইয়াছে।
সন্ধ্যাকালে পাড়া গাঁয়ের মজলিশে এই সকল তামাসার
কথা উচিত, আর ধমকে চণ্ডী মণ্ডপ ফাটিয়া পড়িত।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

রঙ্গলালের প্রতিভার মৌলিকতা

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় একজন চিকিৎসক হলেও তাঁর মধ্যে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রতিভা, ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং মৌলিক গবেষণা পরিচালনার দক্ষতা যেভাবে একই সঙ্গে স্থান করে নিয়েছিল, তা সচরাচর অন্য বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে তার্কিকের যুক্তিবিন্যাস সমন্বয়, ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর মিলন এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রম-বোধের সঙ্গে বাস্তবচেতনার সমন্বয় তাঁর ব্যাক্তিত্বকে যেমন একটি জটিল গ্রন্থি করে তুলেছে, তেমনিই তাঁর কল্পদ্রুম—এ প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাকেও গুরুত্ব এনে দিয়েছে।

রঙ্গলালের ছিল ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। ভারতের জাতীয়ভাব যে বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন এবং বহুর নিজস্ব মর্য্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা,—রঙ্গলাল এসব বহু পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যেখানে অন্য সংস্কৃতির সংঘাত হয়েছে সেখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ তাঁর রচনায় স্থান করে নিতে পেরেছে। রঙ্গলালের রচনার তাৎপর্য্য এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রবন্ধকারের চিত্তের গভীর সম্ভ্রমবোধকে মনে রাখতেই হয়। তাঁর প্রবন্ধের উৎসই হচ্ছে এই সম্ভ্রমবোধ ও শ্রদ্ধা।

"তুমিই কি সেই "দেবকীনন্দন" এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতের হিন্দুধর্মের কৃষ্ণই বাইবেলে এবং খ্রীষ্টধর্মে খ্রীষ্টের রূপধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল না,—ভারতবর্ষে ইতিহাস নাই,—ভারতের ভূমি ইতিহাস সৃষ্টির পক্ষে উর্বর নয়—এসব কথা যাঁরা বলেন রঙ্গলাল তাঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে ধিক্কার দেন। কারণ বৈদেশিক রাজবিপ্লবে ভারতের ইতিহাস বিনষ্ট হয়ে গেলেও কলহন, সোমদেব প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের ইতিহাসসৃষ্টি এখনও সগৌরবে বিরাজমান।

দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে নিজের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া

খ্রীষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,—এই তথ্যটি প্রমাণ করতে গিয়ে রঙ্গলাল কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের চরিত্রগত এবং কাহিনীগত ও সর্বোপরি লীলাগত কতকগুলি সাদৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৃষ্ণের জীবনে যেমন অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ, খ্রীষ্টের জীবনেও তেমনিই অতিপ্রাকৃতের হস্তস্পর্শ ঘটনাপ্রবাহকে পরিচালিত করেছে। দেবকীর গর্ভে গোলকপতি ভগবানের বিভূতি যখন প্রবিষ্ট হোল তখনই কৃষ্ণের জন্ম হোল তেমনিই মেরীর গর্ভে যখন পরমেশ্বরের তেজ প্রবেশ করল, তখন যীশু বিগ্রহধারণ করলেন। কংসের ভয়ে ভীত বাসুদেব কারাগারে সদ্যপ্রসূত কৃষ্ণকে গোপনে কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে নন্দের নিকট রেখে এলেন। যীশুর ভাগ্যেও এই দুর্দৈবই ঘটল। মহারাজ হেরোড যখন সদ্যোজাত শিশুর প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প, তখন দৈববানী হোল; যীশুর পিতা যোসেফও সন্তানকে স্থানান্তরিত করলেন। কৃষ্ণের সখার সংখ্যা দ্বাদশ; যীশুর মুখ্য শিষ্যদের সংখ্যা বারো। কৃষ্ণ অরণ্যে ক্ষুধার্ত্ত রাখালদের অন্নদানে তৃপ্ত করলেন: যীশুও যৎসামান্য রুটি ও মৎস্যে পাঁচশো লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। নিষাদের নিক্ষিপ্ত বাণে অতর্কিতে কৃষ্ণের লোকান্তর ঘটল; বিধর্মীদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুকেও লোকান্তরিত হতে হোল।

এইভাবে কৃষ্ণ ও যীশুর কাহিনীগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে রঙ্গলাল তাঁর মৌলিক গবেগণাশক্তির পরিচয় দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে কৃষ্ণের কাহিনী যীশুর কাহিনী থেকে প্রাচীনতর। তাই যীশুকথা অবলম্বন করে কৃষ্ণকথার রূপ লাভ কখনই সম্ভব নয়। যা ঘটেছে তা হচ্ছে, কৃষ্ণকথাকে অবলম্বন করেই পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে খ্রীষ্টধর্মে যীশুকথা রূপলাভ করেছে।

মহাভারতের যুদ্ধের আনুমানিক সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে রঙ্গলাল "রামায়ণ ও মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হলে কুরুপাণ্ডবেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলিযুগের সময়ের যে বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায় তা অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করলে এটা এসে পড়ে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৭ বৎসরে কুরুপাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পানিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এমত সর্বজন স্বীকৃত। পানিনির একটি সূত্রে শব্দগঠন প্রসঙ্গে বাসুদেব এবং অর্জুনের উল্লেখ আছে। এইমত প্রমাণিত করে দেয় যে, বাসুদেব এবং অর্জুন খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্বেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের বিস্ময়কর লীলার দ্বারা মানবসমাজে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এই দুটি তথ্যের

ভিত্তিতে রঙ্গলাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন যে, খ্রীষ্টের বহুপূর্বেই ভারতবর্ষের কৃষ্ণ ধর্মের গ্লানি দূর করার জন্য মানবদেহ ধারণ করেছিলেন। তারপর বহুকাল অতীত হলে যখন ইহুদীরা বাণিজ্য বিস্তারের অনুরোধে ভারতবর্ষে এলেন তখন হিন্দুদের সঙ্গে তাদের চিন্তাধারার আদান প্রদান ঘটল। রঙ্গলাল মনে করেন স্বাভাবিকভাবেই এই ভাববিনিময়ের ফলস্বরূপ কৃষ্ণ চরিত্রের বীজমন্ত্র ইহুদীদের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করল। রঙ্গলাল মনে করেন যে, ভারতীয়দের কখনই কল্পনার দৈন্য ছিল না, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয়দের তো নয়ই। তাঁদের হোমধেনু ছিল দুগ্ধবতী, জন্মভূমি ছিল শস্যোৎপাদিনী এবং চিত্তভূমি ছিল প্রতিভাশালিনী। কল্পনাবৃক্ষে যত ফল ধরা সম্ভব ততফলই প্রাচীন ভারতীয়দের কল্পনাবৃক্ষে ধরেছিল। নিজেরা সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করার পর অন্যকে তাঁরা তা দান করেন। খ্রীষ্টচরিত এমনিভাবেই ইহুদীদের কাছে হিন্দুধর্মের দান।

ভারতবর্ষের কাছ থেকে কৃষ্ণচরিত্র যে পাশ্চাত্যভূখণ্ডে সংক্রমিত হয়েছিল তার কারণ স্বরূপ রঙ্গলাল আরও কতকগুলি যুক্তিজালের অবতারণা করেছেন। এই যুক্তিজালের বিশ্লেষণ তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি এবং গভীর ইতিহাস চেতনাকেই জানিয়ে দেয়। প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা অন্যান্যস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করলেও পশ্চিম সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল না। ভারতবর্ষের উপনিবেশ প্রধানতঃ স্থাপিত হয়েছিল পূর্বের দেশগুলিতে। আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের কিছুকাল পরে এদেশের বণিকেরা পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। এবং আগে এঁরা কখনও পারস্যে বা আরবে পদার্পণ করেন নি। ভারতবর্ষের বণিকেরা কিন্তু সুদূর অতীত থেকেই পূর্ব সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এসে বাণিজ্য করতেন এবং কালক্রমে সেখানে উপনিবেশও স্থাপন করেছিলেন। সীতার সন্ধান করতে করতে বানরেরা যেসব স্থানে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপেরও উল্লেখ আছে। এসব প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের ভারতবর্ষের পূর্বদিকেই বেশী যাতায়াত ছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিংবা অন্য কারণে পশ্চিমদিকে এঁদের গতিবিধি ততটা ছিল না। আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা এদেশে এসে বাণিজ্য করতেন এবং বিনিময়ে বাণিজ্যগত দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিদ্যা, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও নিয়ে যেতেন। সুতরাং জেরুজালেম বাসীদের পক্ষে কৃষ্ণ চরিত্রকে গ্রহণ করে খ্রীষ্টরূপে রূপান্তরিত করা এবং তাঁদের ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়।

রঙ্গলাল ভারতীয় সংস্কৃতি ও কল্পনার সাবলীলতার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধাবোধ

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধেও আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর "প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতিতে" রঙ্গলাল স্পষ্টই বলেছেন, মানুষ এ পর্য্যন্ত বুদ্ধি বলে যতগুলি বিদ্যাকে উদ্ভাবিত করেছে সবগুলিই হচ্ছে ভারতের প্রসূত। এদের মধ্যে অবশ্য কোনোটি ভারতবর্ষে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে কোনোটি বা দেশান্তরে গিয়ে শ্রী সৌন্দর্য-সুষমামণ্ডিত হয়ে মনোহর কলেবর পরিগ্রহ করেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতিও তার বিরাট বুদ্ধিবলের ফলশ্রুতি। রঙ্গলাল মনে করেন, অঙ্কপাতপদ্ধতি বিশ্বসাহিত্যে ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ন'টি সংখ্যার সাহায্যে যে সমস্ত অঙ্ককে বোঝানো হয় সেই ন'টি সংখ্যার উদ্ভবই বা কেমন করে হোল—এ সম্বন্ধেও রঙ্গলাল দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পানিনির ব্যাকরণে স্বরবর্ণের উল্লেখ বর্ণমালায় যেভাবে আছে তাকেই রঙ্গলাল অঙ্কপাত পদ্ধতির ভিত্তিভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। পানিনি-সূত্রে অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ কেই মূল স্বরবর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরেকটি বর্ণ আছে যেটি হচ্ছে বিসর্গ। রঙ্গলাল মনে করেন যে, ভারতবর্ষে প্রথমে বর্ণবিশেষের দ্বারাই অঙ্কপাত করা হোত। আর ১, ২ প্রভৃতি যে সংখ্যা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভাবিত হয়েছে তার সৃষ্টিও স্বরবর্ণের লিপি থেকে। ব্রাহ্মীলিপিতে স্বরবর্ণগুলির উল্লেখ যেভাবে হয় সেইভাবে স্বরবর্ণগুলিকে বিন্যস্ত করলে সহজেই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মীলিপির স্বরবর্ণগুলির সাংকেতিক চিহ্ন ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বর্তমানের ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যার আকার ধারণ করেছে। রঙ্গলাল বেদ ও পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরও দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা সংকলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কপাত করতেন, যেমন নাকি করতেন প্রাচীন রোমকেরা। রোমে চার সংখ্যাকে বোঝাবার জন্য লেখা হয় iv ; অর্থাৎ পাঁচ সংখ্যা থেকে এক কমিয়ে দেবার কথাই লেখা হয়। ঠিক এমনিভাবেই রোমে ছয় সংখ্যা বোঝাবার জন্য লেখা হয় vi অর্থাৎ পাঁচের সঙ্গে এক যোগ করে যেটা আসে সেটাকেই দেখানো হয়। এই পদ্ধতিটি ভারতীয়েরা বহুপূর্বেই প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁরা ১৯ সংখ্যাকে বোঝাবার জন্য যে শব্দটি প্রয়োগ করেন তা হচ্ছে একোন বিংশতি, অর্থাৎ বিংশতির থেকে এক কম। তেমনি ২১ সংখ্যা বোঝাবার জন্য দ্বাবিংশতি, ৯১ সংখ্যা বোঝাবার জন্য একনবতি লেখা হয়। ঋগ্বেদের মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ইন্দ্র সুশ্রবা রাজা কর্তৃক আক্রান্ত বিংশতি সংখ্যক জনপদাধিপতিকে শত্রুনাশক চক্রদ্বারা বিনষ্ট করেছিলেন। এখানে বিংশতি সংখ্যা অর্থাৎ ২০ কে বোঝাবার জন্য 'দ্বির্দশ' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াটি গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে গুণক্রিয়া প্রক্রিয়া। এই প্রচলন

পরিভাষা অদ্যাবধি প্রচলিত। যেমন গ্রাম্য কথায় বলা হয় একবিশ, দুবিশ ইত্যাদি। রঙ্গলাল এইভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সর্বশাস্ত্রদর্শী সুবিজ্ঞ ভারতীয়েরা কেবল অঙ্কসূত্রের বশবর্তী হয়ে সংকলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কপাতই করতেন না। তাঁরা গণিতশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে তাঁর অন্তর্নিহিত সুগম প্রণালী এবং মৌলিক তত্ত্বেরও আবিষ্কার করেছিলেন। এই নবাবিষ্কৃত তথ্যই পরবর্তীকালে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। তাই অঙ্কপাতপদ্ধতি এবং আধুনিক গণিতশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মূল তথ্যগুলি মানব সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষের অন্যতম মৌলিক অবদান।

এই সমস্ত প্রবন্ধ বহু বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছে। রঙ্গলালের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়লাভের সুযোগ হয় নি। বীরভূমের প্রত্যন্ত প্রদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে তিনি যেভাবে নিজের মননশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুসন্ধিৎসাকে প্রয়োগ করে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় রঙ্গলাল কারো, সাহায্য পান নি। তাঁর প্রতিভাই ছিল একমাত্র মার্গনির্দেশক। এই প্রবন্ধগুলিতে যেমন রঙ্গলালের গভীরে ইতিহাসচেতনা ও গণিতরসিকতা আত্মপ্রকশে করেছে, তেমনি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মূল তথ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে অন্য অনেক প্রবন্ধে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয়ব্যয়। এসমস্ত দেখে বলতেই হয় যে রঙ্গলালের প্রতিভার ব্যাপ্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তা কেবল ইতিহাস ও প্রাচীন ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রেই বিচরণ করে নি। অর্থনীতি; সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সমস্ত ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বিহার করে যেখানে ভারতীয় মনীষার উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছে সেখানেই তাকে তুলে ধরেছে। কারণ রঙ্গলাল ছিলেন খাঁটি ভারতীয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গর্বে তিনি সবসময় গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর প্রতিভার লক্ষ্যই ছিল প্রাচীন ভারতের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ঘটাতে গিয়ে রঙ্গলাল নিজের প্রতিভার যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাঙালীমাত্রের হৃদয়েই তাঁর স্থায়ী আসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার ও রঙ্গলাল

ড. সুধীর কুমার করণ

বাঙালী জাতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী ছিল স্বর্ণযুগ। মধ্যযুগীয় অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশিত হলো আলোকোজ্জ্বল দিন। এক গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ মননহীনতার মধ্যে আচ্ছন্ন বাঙালী জাতির জীবনে উনবিংশ শতাব্দীই অমৃত যাত্রার পথ নির্দেশক রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল প্রতিঘাতে তন্দ্রাতুর বাঙালী জাতির প্রাণশক্তি আলোড়িত হয়ে উঠলো। "জাগিয়া উঠিল প্রাণ।" নিঝ'রিনীর স্বপ্নভঙ্গ হলো। এই জাগরণকে অনেকেই রেনেশাঁস বা নবজাগরণ নাম দিয়েছেন; অনেকে এই নবজাগরণকে সমগ্র বাঙালী জাতির নবজাগরণ নাম দিতে কুণ্ঠিত। এই সব বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, আধুনিক কালের বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছিল এই নতুনকরে জেগে ওঠা-বাঙালী প্রাণসত্তাকে কেন্দ্র করেই। উনবিংশ শতাব্দীর শতবৎসরের পরিসরে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথপর্যন্তও অনেকে পথিকৃৎই এই জাগরণের দিক্-নির্দেশক। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে যে বিরাট আলোড়ন দেখা দিল তা' অভূতপূর্ব। সমুদ্রমন্থনের পরিণামে যেমন অমৃত-উৎসার, তেমনি বাঙালী চিত্ত-মন্থনের পরিণামে উৎসারিত হলো সাহিত্যরসের সুধা। এই কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন—"পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয় বসন্ত' সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক-ভুলানো কথা —কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ। এবং ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব বাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নিঝ'রিনী অকস্মাৎ মুষলধারে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বিস্তৃত আকাশে তখন বহু জ্যোতিষ্কের সমারোহ। একই সময়ে একই কালে এত বেশী কবি, মনীষী, সমাজবেত্তা, সাহিত্যিকের আবির্ভাব নিশ্চিতভাবে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সব জ্যোতিষ্ক সমান ভাবে আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটায় না; অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আড়ালে ম্লান হয়ে যায় অনেক অল্পোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; হয়তো-বা কোন কোন জ্যোতিষ্ককে ম্লান মনে হয়, —যদিও তার আলোক-বিচ্ছুরণের ক্ষমতা যথেষ্ট। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি যে তাতে জ্যোতিষ্কের মর্যাদা হানি ঘটে না। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের প্রভায় বাঙলা সাহিত্যের আকাশ এতই দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল যে, অন্যসব জ্যোতিষ্কের অনুসন্ধান করার চেষ্টাও হয় নি। অনুসন্ধান করলেই দেখা যেতো,—কম উজ্জ্বল হলেও অনেক জ্যোতিষ্কই তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। বস্তুতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে,—তাঁদের গৌণ-সাহিত্যিক নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং সেই কারণে তাঁদের দিকে সহৃদয় দৃষ্টিপাতের কথাও চিন্তা করা হয় নি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিভাবান মনীষী এবং সহৃদয় কবিও। বস্তুতঃ কাল বড় নিষ্ঠুর। সে কেবল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কথাই স্মরণ করায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই কবিরত্ন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে আমরা স্মরণে রাখতে পারিনি। সম্ভবতঃ আর এক রঙ্গলালের নামের আড়ালে মুখোপাধ্যায় রঙ্গলালকে আমরা ভুলেছি। এরজন্য আমাদের নাগরিক মানসিকতাও কম দায়ী নয়। বস্তুতঃ নগরের ঔজ্জ্বল্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে থাকি; কে আর মনে রাখে গ্রামের ঘাসফুলকে। এ কথা স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন স্বনামধন্য; এমন কি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে হেম-নবীন-রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও চিহ্নিত হয়ে আছেন। এঁদের প্রতিভাকে অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এক্ষেত্রেও যেন ধনবাদী সমাজের সম্পদ-দাসত্বের অভিজ্ঞান,—তাঁদের প্রতিভাকে দ্রুতগামী করতে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, মধুসূদন ব্যারিস্টার, নবীনচন্দ্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মী, দীনবন্ধু ডাকবিভাগের অধিকর্তা, হেমচন্দ্র ব্যবহারজীবী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরকারী পদের উচ্চাসনে এঁরা কম বেশী প্রতিভাবান এবং সম্পদশালীও। তাই প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রসাদ ছিল বিস্তৃত। এঁদের তুলনায় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় অবশ্যই গৌণ। কারণ দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে আজীবন। বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করতে করতে এক সময় এসে পৌছেছিলেন বীরভূমের দাঁড়কা গ্রামে শিক্ষকতার জন্য।

সেই সূত্রেই বীরভূমের লাঘোষা গ্রামে বসবাস। কখনও কাজ করেছেন টাকশালে কখনও পুলিশ-বিভাগের কেরানী। তারই মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন। প্রকৃতিগতভাবে যাযাবর এবং মনেপ্রাণে বৈরাগী রঙ্গলালের কাছে ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনই ছিল কাম্য। তাই মনের দিক থেকেও তিনি প্রচারকামী ছিলেন না। তাঁর—একমাত্র কামনা ছিল—'ধন নয়, মান নয়, আর এক মহৎ জীবন।' অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী, অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী, মানবহিতৈষী, জ্ঞানতপস্বী, দরিদ্রবান্ধব রঙ্গলাল তাই প্রচার সীমার বাইরে থেকে গেলেন। যদিও বা রঙ্গলালের নাম স্মরণ করা হয়, তা'হলে নিশ্চিতভাবে কবি হিসাবে নয়,—বিশ্বকোষের প্রবর্তক হিসাবে;—তাও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর নামের আড়ালে পরিক্ষীণ। প্রকৃতপক্ষে এখনও যেমন মহানগরীস্থ না হলে, উপযুক্ত প্রচার-মাধ্যম না পেলে গ্রামবাঙলার সাহিত্যসেবীরা গৌণ হয়ে থাকেন,—রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তাঁর গ্রামীন জীবন, গ্রাম-প্রীতি অবশেষে তাঁর প্রতিভাকে নাগরিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনুকূল হয়নি। একসময় কলকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেও তাঁকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল মুদ্রাযন্ত্রসহ। বলাবাহুল্য—বীরভূমেই একসময় তিনি চিকিৎসকরূপে অনেক অর্থ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু সেই অর্থ তাঁর নিজের ভোগের জন্য বরাদ্দ হয় নি; বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হিতার্থে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় ক'রে জ্ঞানরাজ্যের সীমানাকে বিস্তৃত করার জন্য 'বিশ্বকোষ' মুদ্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন।

রঙ্গলালের বহুব্যাপক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে অবশ্যই বোঝা যায় যে তাঁর মধ্যে মনীষা ও কবি প্রতিভার এক উজ্জ্বল মিলন ঘটেছিল। বলাবাহুল্য—যুগে যুগে কবিতা রচনা করার অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সে সব কবিতাকে কবিতা হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না বটে কিন্তু—তার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবাহ, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা প্রয়োগের চাতুর্য তাকেই বা কী করে অস্বীকার করি। আচার্যপ্রতিম ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে তেমন কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য—এই ধরনের কবিতা রচনা করার জন্য কবিত্ব শক্তির সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সংযোগ সোনায় সোহাগার মতো।

প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল যে কবি হিসাবে অপরিচিত ছিলেন, তাও নয়। তাঁর কবিতা এবং অন্যবিধ রচনাও এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। কবিতা এবং কবি সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল।

"কবি কি? কবি আর কিছুই নহেন, কেবল স্বভাবজ্ঞাপক। কবি হইব ইচ্ছা

করিয়া লেখনী ধারণ করিলেই কবি হইতে পারিবে না, কবিরা ঐশ্বরিক না হউক কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে কল্পনার আরাধনা করিয়া বেদব্যাস মহাভারত লিখিলেন, বাল্মীকি রামায়ণ লিখিলেন, কালিদাস রঘুবংশ কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রকট করিলেন, সেক্সপীয়ার ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি লিখিলেন সেই কল্পনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কয় ব্যক্তি তাঁহাদের সমকক্ষ হইলেন ?……কবির হৃদয়ে ও অন্যের হৃদয়ে অনেক প্রভেদ। যিনি পৃথিবীর কেবল সুখ সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন একদিনের জন্যও চিন্তা করেন নাই, তিনি কবি হইবার যোগ্য নহেন। যাঁহার হৃদয় ব্যথা পাইয়াছে ও যাঁহার হৃদয়ে সকল ভাব প্রতিঘাত করিয়াছে তিনিই কবি।"

এ বক্তব্য রঙ্গলালের। অধুনা "কবি হইব ইচ্ছা করিলে" যেমন কবিতা লেখার জন্য অনেকেই ব্যগ্র, সেই উনবিংশ শতাব্দীতে কবিতাকে তেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো না। রঙ্গলাল যথার্থই বলেছেন—"যাঁহার হৃদয় ব্যথা পাইয়াছে ও যাঁহার হৃদয়ে সকলভাব প্রতিঘাত করিয়াছে তিনিই কবি।"

রঙ্গলালের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর রচিত 'বৈরাগ্য বিপিন বিহার' নামক কাব্যের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১২৮৫ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ); মুদ্রিত হয়েছিল ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে। রঙ্গলাল, কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন পিতৃব্য শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল—

'তাত!

এই অভিনব কাব্যকুসুম আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।'

প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল এক্ষেত্রে অভিনব শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন সাধারণ বিশেষণ রূপে নয়। কাব্যটির বিষয়বস্তু, ভাব এবং রচনারীতির মধ্যে অভিনবত্ব অবশ্যই আছে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮৫ বঙ্গাব্দ হলেও আনুমানিক রচনাকাল ১২৭০ বা ১২৭১ বঙ্গাব্দ—অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৬৩ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের তখন শৈশব কাল এবং কিছু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর গ্রন্থ মেঘনাদ বধ কাব্য। বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার প্রকাশ করেছিলেন তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে রঙ্গলাল উক্ত কাব্যটি প্রকাশকালের ১৪/১৫ বৎসর আগে রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক কারণেই ভূমিকাটি উদ্ধৃতি যোগ্য। মুখবন্ধে বলা হয়েছে।

"প্রায় ১৪/১৫ বৎসর হইল আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় এই অভিনব কাব্যখানি রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখনি মুদ্রিত বা জনসমাজে প্রকাশ করিবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। সংপ্রতি একদিবস হস্ত লিখিত পুস্তকখানি আমার হস্তে পতিত হয়; আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অপূর্ব অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য। এখানি সর্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; বস্তুত—অভিনিবেশ পূর্বক একবার পাঠ করিলেই কাব্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কিরূপ অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমি এক আমার রুচির উপরেই নির্ভর করিয়া এই ব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাব্যানুরাগী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমি এখানি দেখাই; তাঁহারা পাঠ করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি সেই সাহসেই উৎসাহিত হইয়া বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার মুদ্রিত ও প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে কাব্য রসপ্রিয় পাঠকগণ এখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।"

হরিমোহনের এই মুখবন্ধ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তৎকালীন অনেক পণ্ডিত কাব্যানুরাগী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কাব্যটির প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণে হোক কাব্যটি বাঙলাসাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয় নি। কারণ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে যে—কাব্যটি যতই সুলিখিত হোক না কেন, কাব্যের বিষয় এবং ভাব—উনবিংশ শতাব্দীর সেই 'সব পাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে, একীভূত হতে পারেনি। বৈরাগ্যচিন্তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল যশ প্রতিষ্ঠার চিন্তা। এ কথা অবশ্যই বলা যায় না যে, গেরুয়াধারী হলেও তিনি বৈরাগ্য প্রচারের জন্যই গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভোগের বাসনা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করার। ভোগের উপর বৈরাগ্য না এলে মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ ঘটেনা। বলগাহীন যুগের অভিপ্রায় মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, ভারতবর্ষের এই চিরন্তন আদর্শকেই তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছিলেন। পার্থিব সুখলালসা ও ভোগবাসনার মধ্যে আনন্দ নেইত। অসংযমের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বিলাসী রাজা প্রজাবৃন্দের হিতসাধন করতে পারেন না; তাঁরও উচিত নির্জনবনবাসে থেকে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন ঘটানো। নৈলে রাজার পাপে রাজ্য নাশ।

বলাবাহুল্য রঙ্গলাল সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেননি। গৃহকে তিনি বর্জন

করতে বলেন নি কিন্তু ভিক্ষুক সুখভোগের বাসনাকেও তিনি গ্রহণ করতে বলেন নি। তাঁর এই বিশ্বাসই তাঁকে বৈরাগ্য বিপিন বিহার রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় – গ্রন্থসূচনা (কবিতা দেবীকে বন্দনা), সচিব কর্তৃক রাজাকে উপদেশদান, রাজার স্বপ্নদর্শন, তবস্বী বেশে রাজার বনগমন, যোগারম্ভ, ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান, স্তুতিমঞ্জরী, ষড়ঋতু ও ত্রিকালের সুখ, তত্ত্বদর্শন, প্রকৃতজ্ঞানলাভ, যোগভঞ্জনের জন্য রতির ছলনা, রাজরাণী ও মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ও রাজার প্রত্যাগমন।

গ্রন্থসূচনায় রঙ্গলাল কবিতা দেবীকে বন্দনা করেছেন।

"কর অকিঞ্চন দাসে করুণা-কটাক্ষ
মধুময়ী কবিতা সুন্দরী ;
করি মনে শঙ্কা ; কিন্তু যদি দীন জানি
দেহ মা অভয়, পূজি তব পা দুখানি
দুঃসহ এ ভব-তাপ নিবারণ করি।
তোমার প্রাসাদে মাগো বল কে না ভাবে
ভুঞ্জিয়াছে আনন্দসুন্দর।
বররুচি, বরপুত্র কালিদাস কবি
[ভারত সরসে কাব্য-পদ্মোদ্যান কবি]
সাজাতেন ও রাঙা চরণ নিরন্তর।

আটটি স্তবকে এই বন্দনাগানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্বভাবতঃই মধুসূদনের কাব্য ভাষাও মেঘনাথবধের শ্বেতভুজা বন্দনার কথা মনে পড়ে। বস্তুতঃ তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য কিংবা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাব তাঁর উপর বর্তেছিল, এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু অনুসরণ করলেও অনুকরণ করেননি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে তিনি প্রবহমান পয়ারের উপর নির্ভর করেছেন অন্ত্যমিল রেখে। কবিতাদেবীকে বন্দনার ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছেন ছন্দে। প্রথম চরণটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ১৪+১০ মাত্রায় ; মিল রেখেছেন দ্বিতীয় (আসলে প্রথম) এবং পঞ্চম (আসলে চতুর্থ) চরণে এবং দ্বিতীয় (বা তৃতীয়) এবং তৃতীয় (বা চতুর্থ) চরণের শেষে।

প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলাল যে ছন্দ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তা বোঝা যায়, তাঁর কবিতার সাবলীল গতি দেখে। অন্তমিল রেখে পয়ারবদ্ধ চরণকে প্রবাহিত করে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদাহরণ : 'সমরে অসংখ্য, চমূচয়, রিপুদলে
জিনিল অনেক দেশ। বীরপুত্র বলে
নাহি কি হৃদয়ে অভিমান বীরর্ষভ ?
ছাড়ে কি পৈত্রিক ভাব যৌবনে করভ ?
বীর মাটি মাখি আঁটি কটির বসন
রুদ্ররূপ বীরভদ্র, কররে ধারণ ;
স্পর্ধাভরে আস্ফালিয়া ভীম ভুজবর
গিরিতে আছাড়ি গিরি গুঁড়া গুঁড়া কর।

উপরিউক্ত অংশটি সদ্য সিংহাসন প্রাপ্ত অত্যাচারী রাজার প্রতি 'নির্মল সদ গুণনিধি' গুণেন্দ্র সচিবের উপদেশ। রত্নপুরের রাজা রাজারত্ন ধীর, প্রজাপুঞ্জ প্রিয় শ্রী সিন্ধুর মৃত্যুর পরে সিংহাসন লাভ করেন রাজপুত্র বিরজাঙ্গ। বিরজাঙ্গ রাজকার্যে মন না দিয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে পড়েন এমন কি নিজের জননীকেও ও কারারুদ্ধ করে রাখেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থায় মন্ত্রীর উপদেশবাণী শুনে রাজার হৃদয় পরিবর্তন ঘটে এবং বনে গিয়ে তত্ত্বদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে "যথার্থ" রাজার মতো পুনরায় ফিরে আসেন বিরজাঙ্গ। বস্তুতঃ বৈরাগ্য বিপিন বিহার কাব্যে মন্ত্রীর ভুমিকা বিবেকের মতো অনন্য। রাজবংশের হিতৈষী সদগুণের আকর নির্মল হৃদয় এই মন্ত্রী নূতন রাজার আচরণে ব্যথিত হয়ে রাজাকে রাজোচিতগুণ লাভের উপদেশ দিয়েছিলেন—যা বিলাস বৈভব, রমণীর লাস্যলীলার মধ্যে পাওয়া যায় না। রাজা যখন বিরাগী হয়ে বলে যেতে চাইলেন, তখন মন্ত্রীই বেদনা অনুভব করেছেন পিতার মতো হৃদয় নিয়ে।

"শুনি নৃমণির বাণী, ক্ষণেক নীরবে
থাকি বীর মন্ত্রীবর, আরম্ভিলা—'তবে
নিতান্ত তাপস ব্রত করিবে গ্রহণ
গুণধাম ? ত্যজি রাজ্য পশিবে কানন ?
কিন্তু এ কঠোর ব্রত কেমনে সম্ভবে,
বৎস প্রামাধিক তোরে ? বল দেখি কবে
দারুণ অরুণ তাপ সহে নবনীত
সুললিত দেহ ? শ্রম-জল বিগলিত
হয়, বাছা ! আরোহি নিরীহ গজবাজি
লইয়া কামিনীব্রজ। ভ্রমিবে কেমনে

পদব্রজে বনাশ্রমে। বাজিবে চরণে
কুশাঙ্কুর, কঙ্কর নিকর ; শিরে তাপ
তপনে ঢালিবে ; কভু জলদ কলাপ
গর্জিয়া বর্ষিবে বারি, বহিবে প্রলয়
ঝড় কভু। কে করিবে সান্ত্বনা সভয়
হৃদয় তোমার সে অরণ্য মাঝে ? হলে
শ্রমাকুল ঢুলাবে চামর কুতূহলে
কে সেথায় ? চাপিবে চরণ ? তৃষ্ণাতুর
হলে, কে করিবে জল আনি তৃষ্ণা দূর
তোর ?..................................

প্রকৃত পক্ষে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহানগরে বসে একান্তভাবে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিমণ্ডলে দিনাতিপাত করলে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি অনেক বেশী বিচ্ছুরিত হতো। জড়তাহীন স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য শৈলীর উদাহরণ রূপে বৈরাগ্য বিপিন বিহারের অনেক অংশই বিস্ময়কর বস্তুতঃ রঙ্গলাল যে যথার্থ কবি ছিলেন, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। লক্ষণীয় এই যে, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে এবং শব্দ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। অনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি কৃত্রিম অনুপ্রাসের মোহে অকারণ শব্দ সংযোজনের কৌশলকে পরিহার করেছেন বলে তাঁর বাক্‌ভংগিমাকে কখনো বাগাড়ম্বর বলে মনে হয় না। বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাঁর রূপসৃজনের ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়,—যখন তিনি বলেন—পেঁজা তুলোর মতো ভেসে যাচ্ছে মেঘ, কখনও মেঘে মেঘে নানা রঙের মেলা, কখনও আকাশের সর্বাঙ্গে মাণিকের মালা ঝলমল করে ; কখন ভয় দেখায় অন্ধকার ; এই আলো আর অন্ধকার নিয়েই কি মানুষের জীবন ?

"ফুটেছে কার্পাস যেন আকাশ জুড়িয়া,
কভু নানা বর্ণে মেঘ যাওরে ভাসিয়া।
কখন মাণিকমালা ফুটে দেহময়,
কখন আঁধার সব দেখে ডর হয় !
তেমতি কি অবনীতে জীবের জীবন,
সুখে দুঃখে জড়িত রেখেছে অনুক্ষণ ?

হরিদাস সাধু : রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ

সম্পাদক, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ

বাংলা সন ১৩৮৮, (ইংরেজী ১৯৮২)। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৩৯ তম স্মরণোৎসব ও তদুপলক্ষে বীরভূম সাহিত্য পরিষদের পক্ষে রঙ্গলাল স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ মানসে আমি আর পরিষদের অন্যতম সদস্য জনাব সিরাজুল হক সাহেব গিয়েছিলাম লাঘোষা গ্রামে। ময়ূরাক্ষীর তীরে লাভপুর থানার অন্তর্গত এই লাঘোষা গ্রামটি একদা ছিল দুর্গম এখনও যে সুগম সেকথা বলা যায় না। এই গ্রামে 'বিশ্বকোষ প্রবর্তক', 'কাব্যরত্নাকর' রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (আবির্ভাব — ১২৫০ বঙ্গাব্দ, ২৪শে আষাঢ় —রাহুতা, ২৪ পরগণা এবং তিরোভাব—১৩১৬ বঙ্গাব্দ ১৭ই কার্তিক, লাঘোষা, বীরভূম।) মহাশয় শেষশয্যা পেতেছিলেন। সেখানে তাঁর সমাধি এই বিচিত্রকর্মা প্রতিভার সাহিত্যিক-মণীষী ও যোগীতপস্বীর স্মৃতি বহন করছে। শস্য ক্ষেত্রের পাশে কাঁচা রাস্তার ধারে পাকা উন্মুক্ত সমাধির গায়ে খোদিত আছে—

"ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথেবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥"

—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
(১৭ই কার্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

—রঙ্গলাল স্মৃতিসংখ্যা বীরভূমিতে (১৩৮৮, ফাল্গুন) প্রকাশিত নানা নিবন্ধে তাঁর বিচিত্র জীবনকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ২৪-পরগণার নৈহাটি থানার রাহুতা গ্রামের পিতা বিশ্বম্ভরের ও মাতা ভবসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কিভাবে ত্রয়বিংশতি বর্ষ বয়সে বীরভূমের দাঁড়কা গ্রামে শিক্ষকতাকর্মে নিযুক্ত হয়ে পরে লাঘোষায় চিকিৎসকরূপে শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং স্বেচ্ছায় শেষ ভূমিশয্যা পেতে নেন তার উল্লেখও ঐ স্মৃতিসংখ্যায় পাওয়া যায়। ঐ সংখ্যায় বর্তমান নিবন্ধকার 'কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ধর্মমত'-নিবন্ধে রঙ্গলালের সমাধিফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'মহাযোগী' রঙ্গলালের পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্লোকের প্রথমাংশ—'বিশ্বকোষ প্রবর্তক', 'দয়াসিন্ধু' ও 'মহাযোগী' রঙ্গলালের বিশ্ববাসীর হৃদয়ে চিরজীবী হওয়ার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে

যোগী মহাত্মার বিশ্বচেতনার মর্মার্থ বোষিত হয়েছে। তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্য ব্যাপক শ্লোকে গুণগ্রাহী ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হওয়ার মূলে কিন্তু তাঁর জীবনাচরন ও ধর্মমত বিশেষিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই যোগজীবনের বিশ্বাস নিয়েই তিনি ভারতীয় যোগসাধনার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং উনবিংশ শতকের একজন বিখ্যাত ভারতীয় যোগসাধক 'হরিদাসে'র জীবনচরিত রচনা করেন। 'হরিদাসে'র জীবনচরিত গ্রন্থটিতে তিনি পরমযোগী হরিদাসের যোগবলের পরিচয় স্বরূপ নানা পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন, সাধন প্রক্রিয়ার কথাও বলেছেন এবং শেষপর্যন্ত এই যোগীবরের যোগভ্রষ্টতার পরিচয়ও দিয়েছেন। প্রতিপাদ্য হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে হরিদাস 'বড় সাধক' হলেও 'দোষেগুণে মানুষ' ছিলেন। হরিদাসের যোগভ্রষ্টতার বর্ণনায় তিনি মন্তব্য করেছেন—"যোগ সত্য, কিন্তু যোগের ফল মিথ্যা।" 'হরিদাস' গ্রন্থে অবশ্য রঙ্গলাল যোগসাধনের পক্ষপাতী বলেই অনুমিত হয়। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি শেষকথা বলেছেন—'যোগাভ্যাসে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরীর অকর্ম্মণ্য হইবে না, অথচ দীর্ঘজীবন লাভ হইতে পারিবে ; বহুদিন অনুশীলন করিলে যদি ক্রমে এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়, তবে যোগবিদ্যা সংসারে হিতকর হইয়া উঠিবে, নতুবা উপকারের ভরসা নাই।"

সহজ সরল সাধু ভাষায় রচিত 'হরিদাস' জীবনচরিত গ্রন্থটিতে লেখক হরিদাসের যোগবলের পরিচয় সূত্রে ইংরেজবিদ্বেষের কথা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমন, যোগসাধনার প্রতি তথা ভারতীয় সাধনজীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে পরমযোগীর হিন্দু-মুসলমান (সুফী) উভয় ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। হরিদাস যেমন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুগত ছিলেন না, রঙ্গলালও তেমনি নির্দিষ্ট কোন ধর্মমত মানতেন না। হরিদাস ধর্মে বৈষ্ণব হয়েও "বাণলিঙ্গ শিবের পূজা করিতেন এবং প্রণব জপ করিতে করিতে রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরাইতেন। এখানকার বৈষ্ণবদের মধ্যে এ ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন একটি বিশেষ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না।" (পৃ—১১৯) আমরা জেনেছি, রঙ্গলাল যখন দাঁড়কায় আসেন তখন তিনি তেইশ বছরের যুবা-পুরুষ হলেও তাঁর অঙ্গে ছিল গেরুয়া ও আলখাল্লা, মুখে দাড়ি— সন্ন্যাসীর বেশ। সাধু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত তিনিও ঘরসংসার ত্যাগ করেন ; অবশ্য লাঘোবায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন এমত জানা যায়। মৃত্যুর পর সন্ন্যাসীদের দাহ করা হয় না, সমাধি দেওয়ার প্রথা আছে, তাঁর ইচ্ছানুসারে লাঘোবায় সেই সমাধি

আজও চিরজীবী সাধক রঙ্গলালের স্মৃতিবহন করছে। হরিদাসের মৃতদেহ অবশ্য দাহ করা হয় তাঁর ইচ্ছানুসারে। তবে হরিদাসের জীবনচরিত বর্ণনায় রঙ্গলাল সাধুর হৃদয় দর্পণ পাঠকের চোখের সম্মুখে স্থাপন করেছেন "তিনি দীনদারিদ্রকে দেখিলে ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেন। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি নিকটে আসিলে মুখের গ্রাস রাখিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন।" বুঝি রঙ্গলাল এই সহমর্মিতার জন্য দাঁড়কা স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ম্যালেরিয়া-রোগক্রান্ত তৎকালীন বীরভূমের গ্রামবাসীর চিকিৎসকরূপে সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। 'হরিদাস' জীবনচরিত গ্রন্থটিতে সাধক হরিদাসের চরিত্রের মাহাত্ম্য ও দোষাবলী উভয়ই পরিদৃষ্ট হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে রঙ্গলাল অন্তরের সহানুভূতিগুণে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন চিত্রটি জীবনচরিতে চিত্রিত করার পক্ষপাতী। সাধারণতঃ সাধক জীবনচরিত বর্ণনায় লেখক কবিরা কেবল শ্রদ্ধাবশতঃ সাধকের মাহাত্ম্য গুণকীর্তনই করে থাকেন, দোষের কথা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু দেহধারী জীবমাত্রই নানা সময় নানা প্রবৃত্তির বশবর্তী হন, সে কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বিশেষত সাধক জীবন রহস্যাবৃত, কখন কোন কারণে কি কার্যে প্রবৃত্ত হন তা সাধারণের বোধগম্য নয়। হরিদাসের শেষ জীবনে একজন যুবতী ক্ষত্রিয়- কন্যা তাঁর কাছে যাতায়াত করত; যোগভ্রষ্ট হরিদাস লাহোর থেকে তাকে নিয়ে লাদাকের নিকটবর্তী পর্বতে লুকিয়ে থাকলেন। সাংসারিক ভোগস্পৃহা তাঁর সাধন পথের অন্তরায় হয়ে ওঠে। 'শেষদশায়' সাধক জীবনের দুর্গতি হয়। লাহোরে রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু রূপে তিনি অবস্থান করতেন। লাদাকের পর্বত গুহায় পালিয়ে আমার রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁর অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করেন। দূতেরা ফিরে এসে জানায়, 'তিনি আর ইহলোকে নাই, যোগে বসিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। শিষ্যেরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব-স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবল একজন চেলা দূতের সঙ্গে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম রামতীর্থ।" (পৃ-১০৮) রামতীর্থ মহারাজকে সাধু হরিদাসের পূর্ব ইতিহাস যা বলেছিলেন রঙ্গলাল সেই কাহিনী বিবৃত করেছেন।

'হরিদাস (সাধু)' গ্রন্থের টাইটেল লিখিতে হয়েছে— মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাখ্যান। শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ৩৮/২নং ভবানী চরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী, ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে শ্রী নুট বিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

—গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হওয়ায় বুঝা যায়, সেকালে এর সমাদর হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'গল্পের আভাস' দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখক লিখেছেন— "যাঁহার মনে ছাঁদ আঁকিয়া তুলিতে হইবে, তাঁহার মুখগঠন চিত্র করিয়া না দেখাইলে পাঠককে যেন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হয়।

লেখক-চরিত অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মনুষ্য-মনের ভিতরে ভিতরে, গভীর তলে তলে কি আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেজন্য জীবনচরিত লেখকেরা লোকের কার্য দেখিয়া সদসৎ বিচার করেন।……তাই মহাজনের চরিত্র অাঁকিতে বসিলে, আগে তাঁহার মুখাকৃতি চিত্র করিয়া দেখান চাই।

আজি আমি যাঁহার উপাখ্যান লিখিতে বসিয়াছি তিনি মহাপুরুষ কিনা বলিতে চাই না। তবে তিনি নিজের অদ্ভুত ক্ষমতায় রাজাকে, রাজসভাসদকে ও রাজমন্ত্রীকে ভুলাইয়াছিলেন, সুফী পথাবলম্বী মুসলমানদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন হিন্দুদ্বেষক খৃষ্টানদের চক্ষে ধূলি ছিটাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন সে কারণ তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছি।" —জীবনচরিত রচনার প্রণালী সম্বন্ধে লেখকের শিল্পচেতনা এখানে সুস্পষ্ট। সেই সঙ্গে সাধক হরিদাসের যোগবলের আশ্চর্য কার্য প্রণালীব বর্ণনায় লেখক এ দেশবাসীর দর্শনশাস্ত্রে দখল—হিন্দুদের দ্রব্যগুণ প্রাণিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বে জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন—"আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কতকাল হইতে এদেশে দর্শনশাস্ত্রের কেমন আলোচনা হইয়াছিল, হিন্দুরা দ্রব্যগুণ প্রাণিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব কেমন বুঝিতেন, এই উপাখ্যানে আমি পাঠকদিগকে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিব।" তিনি আরো উল্লেখ করেন যে "এই গল্পের কোন অংশ কাল্পনিক নয়; আমি মনগড়া কথা দিয়া ইহার কোন ভাগ সাজাই নাই। ……মৃণালের কাঁটা ফেলিয়া কেবল ফুটন্ত ফুলটি দেখাই নাই।" কাজেই হরিদাসের জীবনচরিতে 'মনগড়া' অনৈতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ নাই—লেখক সেকথা ভূমিকায় বলে রেখেছেন। এই আলোচনায় তাই ঐতিহাসিক জীবন চরিত যেমন তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি ভারতীয় জাতীয় ভাবাদর্শের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। হরিদাসের চরিত্রে লেখক দেখেছেন—'অর্থস্পৃহা, ক্রোধ পরায়ণতা এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি।' গুনও অনেক দেখেছেন। আবার এসব দোষ ও গুণ নিয়েই যে হরিদাস সন্ন্যাসীরূপে সিদ্ধ হয়েছিলেন সেকথাও সশ্রদ্ধ চিত্তে বর্ণনা করেছেন। হরিদাস বৈষ্ণব ছিলেন, এই মতে প্রকৃতি ব্যতিরেকে সাধনা-সিদ্ধি নাই। এজন্য ক্ষত্রিয়ানী-সংসর্গ তাঁর যোগভ্রষ্টতার কারণ বলে সাধারণে যা

মনে করে, লেখক তাতে তত দোষ দেখেন না। বরং হরিদাসকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যে শ্রদ্ধা করত তার পরিচয় দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন— "কেবল তাঁহার দোষের দিকে চক্ষু দিয়া কাজ কি? গুণগুলি বাছিয়া লও না কেন? যদি কাঁটা দেখিয়া এত ভয়, গোলাপ তুলিও না, ডালেই তাহার সৌন্দর্য দেখ।"—মন্তব্যটিতে রঙ্গলালের সহজ শোভন দৃষ্টিভঙ্গির ও কল্পনাসাদৃশ্যের নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। এই ভাবে ভালোয়-মন্দোয় মেশান সাধকচরিত্রটিকে বর্ণনাও যে রঙ্গলাল একটি জাতীয় চরিত্ররূপ (Natinal character) অঙ্কিত করেছেন।

এক্ষেত্রে একটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা ভালো, মধ্যযুগে বৃন্দাবনদাস—কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ চরিতকাররা মহাপ্রভুর অমূল্য দিব্য জীবন কাহিনী বর্ণনায় অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক—সামাজিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাতে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনও। এমনি উৎকৃষ্ট কাব্য ও জীবন চরিত। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি তেমন বর্ণিত হয়নি বললেই চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রাম রাম বসুও জীবনীতে ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনার গদ্য গ্রন্থ রচনায় (১৮০১) প্রথম লেখক হিসাবে রামরাম বসু পথ প্রদর্শক। তবে তাঁর গদ্যের অন্বয়ের বিশৃঙ্খলায় ত্রুটি ও আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগে বাহুল্যজনিত জটিলতা লক্ষণীয়। ঐ পণ্ডিত গোষ্ঠীর অন্যতম রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থটি রচনা করে। কিন্তু এগ্রন্থেও গদ্যের প্রাঞ্জলতা তেমন উল্লেখ্য নয়। পরে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যথার্থ গদ্য শিল্পীরূপে ভারত সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন নানাগ্রন্থে। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত (বিদ্যাসাগরচরিত) ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত নানাকারণে উল্লেখ্য। এর পর এই রঙ্গলালের বাংলা গদ্যে প্রণীত 'হরিদাসে'র জীবনচরিত তাঁর গদ্যশিল্পসৃষ্টির কৃতিত্বের পরিচায়ক। জীবনচরিত রচনায় লেখকের স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির (objective outlook) পরিচয়ও মেলে।

রঙ্গলাল যখন দাঁড়কায় শিক্ষকতা করতে আসেন তখন বাহ্যতঃ তিনি গেরুয়া পরেই এসেছিলেন সন্ন্যাসীর বেশে এবং সেখানে একটা ধর্মসভাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বরচিত-ধর্ম দর্শনবিষয়ক সঙ্গীতও রচনা করেন। সেদিক থেকে তাঁর মনের গঠনটা আমরা বুঝতে পারি। ঘরসংসার ত্যাগকরে রাহুতা থেকে বীরভূমের অজপাড়াগাঁয় এসে বাসস্থাপন করলেন এবং পরকে আপন করার ভারতীয় সাধনায়

মেতে উঠলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক ও চিকিৎসক; জ্ঞানের সাধনায় লিখেছেন বহু গ্রন্থ [বিশ্বকোষ ১ম এবং ২য় খণ্ডের অংশত, বৈরাগ্য-বিপিন বিহার, চিত্ত চৈতন্যোদয় (কাব্য), শরৎশশী (উপন্যাস), বিজ্ঞানদর্শক (নিবন্ধ-গ্রন্থ) 'হরিদাস' (সাধক জীবনচরিত) প্রভৃতি এবং 'শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ' (ভ্রমণ-আলেখ্য) ও বহুবিষয়ক প্রবন্ধাদি]। ভক্তির জীবনে তিনি ছিলেন পরমযোগী ও অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু তিনি বিশেষ গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন না;—সুফী মতবাদে তাঁর গভীরশ্রদ্ধা ছিল। সাহেব চিকিৎসকের কাছে তিনি এ্যালোপাথি শিক্ষার সময় সাহেবদের নিষ্ঠাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বাহ্য ইংরেজীয়ানার প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। এই ইউরোপীয় নিষ্ঠা, হিন্দুর আদর্শ বোধ এবং বাউল ও সুফী মুসলমানদের উদার মানবতার সহানুভূতি যোগে রঙ্গলালের যে হৃদয়ভূমি রচিত হয়েছিল তারই পূর্ণ বিকাশ 'হরিদাস' জীবনচরিতে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি যোগের সমন্বিত ভাবদৃষ্টিতে তিনি হরিদাসের অধ্যাত্মযোগ জীবনের অলৌকিকত্ব, আর্তপীড়িত নিরন্নের প্রতি তাঁর মমত্ব, তাঁর ক্রোধপরায়ণতা—অর্থলোলুপতা ও ইন্দ্রিয়াশক্তির ব্যক্তি জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি—একসঙ্গে নিরাসক্ত ভাবে পর্যালোচনা করেছেন। এখানে সাধকজীবন ও জীবনদ্রষ্টা উভয়েই মহৎ। রঙ্গলাল হরিদাসের জীবনী লিখতে বসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সাহায্য নিয়েছেন—প্রমাণ সাক্ষ্য উপস্থাপিত করেছেন। যে-সব রাজামহারাজা ও ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিবরণ পেয়েছেন সেগুলি পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ লেখাটি তথ্যভিত্তিক, গালগল্প নয়।

হরিদাস মহাজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি বড়লোক বা ধনী নন, বনচারী সন্ন্যাসী। এই হরিদাসের জীবনবৃত্তান্ত লেখক সংগ্রহ করেন বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে, বিশেষতঃ ওয়েড সাহেবের কেরাণী লুধিয়ানার জওলাপ্রসাদের মুখ থেকে। "হরিদাসের অদ্ভুত কাজ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।.....তদ্ভিন্ন জেসলমির, কোটা, কর্নাল, অমৃতসর প্রভৃতি অন্যান্যস্থানেও হরিদাসের পরিচিত দুই একজন ব্যক্তি আজিও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহারা এখনও সন্ধ্যায় সকালে লোকের কাছে পূর্ব অদ্ভুত গল্প করিয়া থাকেন।"—এসব জীবন্ত উপাদানে হরিদাসেরজীবনী রচিত। এঁদের বিশ্বাস ছিল, হরিদাস মনুষ্যদেহে দেবতা।

গ্রন্থটির প্রথমভাগে (১০৪ পৃঃ পর্যন্ত) হরিদাসের বিভিন্ন স্থানে নানাজনের কাছে যোগবলের পরীক্ষায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যোগবলের সাহায্যে তিনি জলের উপর হেঁটে বেড়াতে পারতেন, যোগসমাধিতে মৃত্তিকা প্রোথিত অবস্থায় ৪০

দিন পর্যন্ত মৃতবৎ অবস্থান করতে সক্ষম হতেন। চক্ষু মুদ্রিত করে গ্রন্থপাঠ করতে পারতেন ইত্যাদি অমৃতসরে তিনি একমাস মাটির নীচে সমাধিস্থ ছিলেন; রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী রাজা ধ্যানসিংহ দূতমুখে সংবাদের সত্যতা যাচাই করে সমাধি থেকে উত্তোলনের দিনের ঘটনা বিস্তারিত শুনে সাধুকে জম্মুতে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু সাধু সম্মত না হওয়ায় স্বয়ং এসে সশিষ্য যোগীকে জম্মুতে নিয়ে গেলেন। এই নগরে যোগী চারমাস মৃত্তিকার ভিতর সমাধিস্থ ছিলেন, তা ধ্যানসিংহ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সমাধিতে বসার পূর্বে সাধুর গোঁপ দাড়ি সমস্ত কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, "কিন্তু চারিমাসের মধ্যে কিছুমাত্র কেশ গজায় নাই।" এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ গোপন থাকেনি, ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজদের মুখে মুখে তাঁর সমাধির আশ্চর্য ঘটনার প্রচার হতে থাকে। রাজপুতানা ও পাঞ্জাবাদি অঞ্চলে যে সব ইংরেজ ছিলেন, তাঁরা যোগীকে আনিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করতে লাগেন। এসব পরীক্ষার বিবরণ তাঁরা বাংলার বন্ধু বান্ধবকে বিস্তারিত লিখে পাঠান। কলিকাতার সাহেবরা পত্রগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করে ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে থাকেন। Calcutta Medical Jaurnal 1835 এবং Osborne's Camp and court of Ranajit singha প্রভৃতিতে সেগুলি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রভাবে হিন্দুরা ও আর্য ঋষিদের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন। তাঁরা হিন্দু দেবদেবীর নিন্দাবাদ করে সাহেবদের কাছে আপনাদের পসার জমাতে থাকেন। স্বাভাবিক কারণে হিন্দু মুসলমানরা ও খ্রীষ্টানরা হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতায় অবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। খ্রীষ্টান পাদরীরা তো ইচ্ছা করেই হিন্দুদের কাছে কালী দুর্গা মূর্তির ও ব্রাহ্মণদের আহ্নিকের মন্ত্রের দোষ ধরে হিন্দুমনে অভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। হরিদাসের সমাধির গল্প তাঁদের কাছে ছিল হাসির খোরাক। তাই রাজপুতানার সহকারী এজেন্ট ম্যাকৃনটেন সাহেবের সঙ্গে একবার পুষ্করতীর্থে সশিষ্য হরিদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। ম্যাকৃনটেন সাহেব সাধুকে কলিকাতায় আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধু কলিকাতায় এসে লাট সাহেবকে সমাধির পরীক্ষা দিতে রাজী হননি। রাজী না হওয়ার কারণ হিসাবে লেখক নলডেঙ্গা নারিকেল বেড়ে গ্রামের (২৪ পরগণা) তিতুমিরের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ শাসকেরা তখন যোগীদের ভয় পেতেন,—'রক্তবীজের ঝাড়ে' যোগীর মৃত্যু হয় না; এরকম কয়েকটা যোগী থাকলেই তো ইংরেজদের গোলাবারুদ সব খেয়ে ফেলতে পারেন; পাছে ইংরেজরা সমাধিস্থ অবস্থায় হরিদাসকে ধ্বংস করে ফেলে এই আশঙ্কা যোগীর

মনে জেগে থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত ম্যাক্‌নটেন সাহেব পুষ্করেই যোগীকে পরীক্ষা করেন। হরিদাসকে ধ্যানস্থ অবস্থায় একটা সিন্দুকে পুরে তেরদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। তেরদিন পর সিন্দুক খুলে দেখা যায়, "হরিদাসের সংজ্ঞা নাই, সর্বাঙ্গ শুকাইয়া কাষ্ঠের মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার প্রাণ সঞ্চার হইল।" পৃ-১৮ এই পরীক্ষার সংবাদে হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের অনেকের বিশ্বাস জন্মে।

জেসলমিরের মহারাওল নিঃসন্তান ছিলেন। পাঞ্জাব, গুজরাট, কোটা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে হরিদাস আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ সমাধি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন মহারাওলের জনৈক মন্ত্রী (ঈশ্বরলাল) রাজসভায় প্রস্তাব দেন পুত্র লাভের জন্য সিদ্ধপুরুষ হরিদাসকে পুষ্কর থেকে আনার। হরিদাস এসে গ্রহ বৈগুণ্যের জন্য শান্তি করে পুত্র সন্তান লাভের জন্য সমাধিধারণে সম্মত হলেন। একমাস কাল তিনি সমাধি ধারণে ছোট গর্তে (দুহাত দীর্ঘ, দুহাত প্রস্থ ও দুহাত গভীর) প্রবেশ করে কাটান। মৃৎপ্রোথিত অবস্থায় থাকাকালীন লেফ্‌টেনান্ট বৈলো জেসলমিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৌতুহলী হয়ে প্রত্যহ সেই সমাধি গৃহে যেতেন। চারিদিকে প্রহরীরা অবস্থান করত। একমাস পরে তাঁকে তোলা হলো, তিনি জীবিত ছিলেন। বৈলো সাহেব, ট্রেভোলিয়ান সাহেব তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। বৈলো সাহেব যোগীর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করেননি।

হরিদাসের মতে যোগের সাহায্যে সমাধিসিদ্ধ হতে গেলে "পথ্যের নিয়ম এবং প্রাণিয়াম যোগসাধনের প্রধান উপায়।" (—পৃঃ ৩৫) বৈলোর গ্রন্থে হরিদাস প্রদত্ত যোগাভ্যাসের তিনটি প্রধান উপায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়—'প্রাণায়াম' খেচরীমুদ্রা এবং পথ্যের নিয়ম।' ডাক্তার মরে ও ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগের লাহোরে যোগীকে চিকিৎসাশাস্ত্র মতে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু সমাধির পর মৃতবৎ যোগী কয়েকঘণ্টা পুনর্জীবিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন কিভাবে তার মর্মোদ্ধারে অক্ষম হন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের চিকিৎসাশাস্ত্র যোগীর কাছে হার মানত। প্রাণায়ামের নিয়ম এবং জিহ্বা উল্টে বায়ুপথ রোধ করে। খেচরীমুদ্রা যোগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ার মাধ্যমে সমাধি ধারণের কৌশলের কথা সাধু হরিদাস বৈলো সাহেবকে জ্ঞাত করান। সমাধিতে বসার ৭ দিন আগে থেকে পথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা অবশ্যই পালন করতে হয়। সমাধিতে বসার আগে কোন কঠিন দ্রব্য খেতে নাই। সমাধিধারণের সময় গোঁপদাড়ি গজায় না সে কথার প্রমাণ পেয়েছিলেন ডাক্তার হানিগবার্জার রাজা ধ্যানসিংহের কাছে শুনে। বৈলো সাহেবও

সাক্ষী। এই প্রায় প্রাণশূন্য জীবিত অবস্থার নাম দিয়েছেন জগদানন্দ রায়—'অব্যক্ত জীবন'। লাহোরে রাজা রণজিৎ সিংহের কাছে হরিদাস চল্লিশ দিন সমাধি ধারণ করে যোগবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজা রণজিৎ সিংহ যোগীর এই আশ্চর্য শক্তির পরিচয়ে তাঁকে গুরুপদে বরন করেন। বলাবাহুল্য, সমাধি ধারণের সকল প্রক্রিয়াই হরিদাসকে রাজা রণজিৎ সিংহের সম্মুখে করতে হয়েছিল। কারণ প্রথমে তিনি এই যোগবলে বিশ্বাসী ছিলেন না।

নিস্পন্দ, চৈতন্যহীন অসাড় অবস্থায় যোগসমাধিতে থাকায় সুখ কোথায়? "যোগের আনন্দ অসীম। সমাধিতে বসিলে যোগীর মন, স্বপ্নের দয়াময় সুখ নিকেতনে বিচরণ করিতে থাকে।" লাহোরে যোগ সমাধি ভঙ্গে কর্নাল ওয়েড সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যোগী হরিদাস বলেন—"সমাধি-অবস্থার মত এমন সুখ আর কিছুতে নাই। ইন্দ্রত্ব পাইলেও আমি সে সুখ ভুলিতে পারি না। আমার ধ্যানভঙ্গ হইলে, যখন সমাধি অবস্থার সুখ মনে পড়ে, বলিব কি?—সে সময়ে আমি প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আবার যোগে বসিতে ইচ্ছা হয়। আমার পক্ষে জাগ্রতাবস্থায় সুখ নাই। যদি বলিলেন, সুখ আমার সমাধিতে।" (পৃ—৬২)

শিখেরা হরিদাসকে অতিশয় ভক্তি করতেন। অমৃতসরে যোগী একবার সমাধি থেকে উঠলে, সেখানকার সমস্ত লোক তাঁর পরিচর্যা করতে শুরু করেন। তাঁদের ধারনা সমাধিধারণে হরিদাসের খুব কষ্ট হয়। হরিদাস তা দেখে তাঁদের হাসিমুখে বলতেন—"আমি যে সুখে ছিলাম, তেমন সুখ মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভাগ্যেও ঘটে না। আমি সাধুদের সঙ্গে মনোহর অরণ্যে ছিলাম। আহা! সে কি চমৎকার বন! তেমন ফুল, তেমন ফল, পাতাগুলির তেমন সৌন্দর্য কোথাও নাই,—মর্ত্যের কোন বনে নাই, কোন বৃক্ষে নাই।"...(পৃ-৬৩) সমাধিধারণে স্বর্গসুখের—আধ্যাত্মিক তৃপ্তির কথাই এখানে সাধু হরিদাস বুঝতে চেয়েছিলেন। এই বর্ণনা কবিত্বপূর্ণ, এর ভাষা সহজ সরল কিন্তু ভাব গভীর, যেন কোন সৌন্দর্যকে কাব্য সুষমাদানের উপযোগী করে রচিত হয়েছে।

হরিদাসের আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই তিনি তৎকালীন জনসমাজে পূজ্য ছিলেন। ১৮২৯।৩০ সালের পূর্বে তাঁকে কেউ জানত না। তিনি লোকের চক্ষে পড়বার পূর্বেই জনৈক পাদরীর দর্প চূর্ণ করেন। "কথিত আছে, একদিন অপরাহ্নে তিনি প্রয়াগের নিকটে যমুনা পারে একটি দেবমন্দিরে বসিয়াছিলেন। নিকটে শিষ্যগণ ও কয়েকজন গ্রামবাসী গল্প করিতেছিল। ইতিমধ্যে এলাহাবাদ হইতে একজন পাদরী নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেকালে আর একালে প্রভেদ

অনেক। তখন আবশ্যক হইলে সাহেবেরা পল্লীগ্রাম হইতে কুলী ধরিয়া আনিতেন। কার্যোদ্ধারের পর মন যদি খুশী থাকিত, তবে ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিৎ মজুরী দিতেন, নয়ত চাবুক দেখাইয়া বিদায় করিতেন। তাই সাহেবকে দেখিয়া কেহ কেহ ছুটিয়া পলাইল। ভদ্রলোকেরা পলাইলেন না। হরিদাসের নিকটে বসিয়া থাকিলেন। এ সাহেব কুলী ধরিতে আসেন নাই, ইহাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। ভাগ্যদোষে যে সকল লোক অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাদরী সাহেব তাহাদিগকে আলোকে আসিবার পথ দেখাইতে গিয়াছিলেন,—তিনি খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারক। সাধুর সর্ব্বাঙ্গ গেরুয়াবস্ত্রে আবৃত, ললাট চন্দনে ভূষিত, হস্তে জপমালা। তাঁহাকে হিন্দুদের ধর্মগুরু জানিয়া সাহেব তর্ক আরম্ভ করিলেন। তর্কের সময় কি কি বিচার চলিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাদরী সাহেব হিন্দুধর্মের দোষ দেখাইয়া থাকিবেন, তাহাতে ভুল নাই।" (পৃ ৬৫-৬৬) এসময় হরিদাসকে পাদরী সাহেব বলেছিলেন—'ধর্মজ্ঞানে আপনারা পশুবৎ'। হরিদাস তাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন যে, আপনাদের ঈশ্বর পাঁচখানি রুটি দিয়ে পাঁচশো লোককে ভোজন করিয়েছিলেন, আমি মনুষ্য, আমি খালি হাতে পাঁচ কোটি ক্ষুধাতুরকে খাওয়াতে পারি। এই বলে তিনি রাশি রাশি পুরী-পেঁড়া-মিঠাই বের করতে শুরু করেন। সাহেব পাঁউরুটি দেখাতে বললে তিনি রাশি রাশি পাঁউরুটি বিস্কুট বের করতে লাগলেন। এমন কি রুদ্ধবাক পাদরী পানসি যোগে ফেরার সময় সাধু লাগ বলে পানসির পাশে পাশে জলের ওপর হেঁটে চললেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে নদীর দুধারে লোকে ভরে গেল। এই ঘটনার বর্ণনায় আছে গল্পরসের উপভোগ্যতা, আছে গল্পের প্রাঞ্জল ভঙ্গি অন্যদিকে আছে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ ও হরিদাসের ক্ষমতার প্রমাণ এবং খৃষ্টান ধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'ভাগ্যদোষে যে সকল লোক অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে'—উক্তিতে পাদরীদের প্রতি কটাক্ষপাত যেমন আছে, তেমনি লেখকের পরিহাস রসিকতার মনোভাব ও ব্যক্ত হয়েছে। হরিদাসের শিষ্য রামতীর্থও প্রাণায়ামের সাহায্যে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন তা মহারাজা রণজিৎ সিংহকে দেখিয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে আজমিরে হরিদাস এই জাতীয় প্রমাণ দিয়েছিলেন স্পিয়ার সাহেবের কাছে। তিনি তাঁকে দেখিয়েছিলেন চক্ষু বাঁধা অবস্থায় গ্রন্থপাঠ করে। এসব দৃষ্টে হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টানরা তাঁর ক্ষমতা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। ডাক্তার ম্যাকগ্রেভার ও ক্যাপটেন ওয়েড সাহেব ডাক্তারি মতে সমাধি থেকে ওঠার পর হরিদাসের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেন যে, যোগীর শরীরের অন্যান্য অংশ

শীতল হয়ে যায়, 'কিন্তু মস্তকের উপরিভাগ প্রখর সন্তাপ'। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, "হরিদাস আরও কোন কৌশল জানেন, সাধারণ লোকে তাহা জ্ঞাত নহে।"

"হিন্দুদের বিশ্বাস ও সাধন ইংরাজির সঙ্গে কিছুই মিলে না, তাই হিন্দুদের শাস্ত্র ইংরাজি বুদ্ধির অগোচর। এ দেশের যোগীরা বিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন বন্ধ করিয়া কিরূপে দীর্ঘকাল অনাহারে জীবিত থাকিতে পারেন, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য ইউরোপীয় ডাক্তারদের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হয়নি।" এই মন্তব্যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের যোগ সাধনায় আস্থার কথা সগৌরবে ঘোষিত হয়েছে এবং ইংরাজি ডাক্তারদের চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ ও তুচ্ছ তাও প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাতে লেখকের স্বদেশ গৌরববোধ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু হরিদাসের বুজরুকির গল্প এদেশে ও ইউরোপে আশ্চর্যকর বলেই প্রচারিত হয়েছে।

শিখরা হরিদাসকে দেবতার তুল্য শ্রদ্ধা করতেন—গুরু নানকের মত ভক্তি করতেন। কিন্তু মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁকে বাহ্যতঃ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখলেও অন্তরে তাঁর সমাধিধারণ শক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনিও লাহোরে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। হরিদাস চল্লিশ দিন সমাধি ধারণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবারও ওয়েড সাহেব, জেনারেল ভেঞ্চুরা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং হরিদাসকে পোঁতার ও তোলার সময় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৮ সালের মে মাসে ম্যাকনটেন, ডাক্তার ড্রমণ্ড, ক্যাপ্টেন ম্যাকগ্রেভার এবং অস্‌বরন লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তী অদীন নগরে রণজিৎ সিংহের রাজসভায় আসেন। সেখানেও সাহেবদের দেখাবার জন্য মহারাজ হরিদাসকে সমাধি ধারণ দেখাতে অনুরোধ করেন। তিনি সে অনুরোধ রক্ষার সম্মতি দেন। কিন্তু সমাধিতে বসার আগে অর্থ চাওয়ার এবং নিরাপত্তার শর্তসাপেক্ষে সাহেবদের সঙ্গে বচসায় বিরক্ত সাধু কটূক্তি করেন, সাহেবরা চলে যান। বিরক্ত সাধু হরিদাস তাই মহারাজকে বলেন—"ইংরাজদিগকে যোগ দেখাইবার জন্য আপনি আর আমাকে কখন অনুরোধ করিবেন না। আমার মনের কথা বলিতেছি, ও জাতটাকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না। তাহারা কেবল আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে।" (পৃ ৯৮) লেখকের বর্ণনায় হরিদাসের এবং লেখকেরও ইংরেজি বিদ্বেষ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অসবর্ণ সাহেবরা নাকি সাধুকে প্রতারক ও ভণ্ড বিবেচনা করেন। কিন্তু ডাক্তার হানিগবর্জার হরিদাসের ক্ষমতা বিশ্বাস করতেন এবং সপক্ষে অকাট্য যুক্তিও দেখান। অন্যদিকে ফিরিঙ্গি-বিদ্বিষ্ট হরিদাস বুঝেছিলেন দুষ্ট ইংরেজরা পাঞ্জাব জয় করার কৌশল করেছে। তাই

হরিদাসকে ধ্বংস করে রণজিৎসিংহকে জয় করার কৌশল। ধ্যানসিংহ গোপনে হরিদাসকে এই ধারণাই দেন। তাই অসবর্ণের অনুরোধে হরিদাসের পুনর্বার সমাধিধারণে ইতস্ততঃভাব।

গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে হরিদাসের ব্যক্তি জীবন পরিচয় ও যোগের উপযোগিতার কথা আলোচিত হয়েছে।

রণজিৎসিংহের অনুরোধে তিনি লাহোর অবস্থানকালে একদা মহারাজ দূতমুখে সংবাদ পান যে, পরমযোগী হরিদাসের ইন্দ্রিয়দোষ ঘটেছে। রানী ঝিন্দনও সাধুর ওপর প্রবল বিরক্ত হয়ে অপমানিত করান লোক দিয়ে। তাতে ক্রুদ্ধ হরিদাস মহারাজা ও চাঁদরানীকে সর্বনাশের অভিশাপ দিয়ে যুবতী ক্ষত্রিয়ানীকে নিয়ে লাদাক অঞ্চলের পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর যোগসমাধিতে সেখানে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর শিষ্য রামতীর্থ মহারাজকে সাধুর পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করেন। "হরিদাস মহারাষ্ট্রদেশের একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ত াহার বয়ঃক্রম পনের কি ষোল বৎসর, সেই সময়ে ত্রৈলঙ্গদেশ হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটি বৃক্ষতলে আসন করিলেন। তিনি কুবের পন্থী বৈষ্ণব।...সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে হরিদাসের গৃহ নিকট। নিকট বলিয়াই হউক, কিংবা আন্তরিক ভক্তির জন্যই হউক, হরিদাস অবসর পাইলেই সাধুর কাছে আসিয়া বসিতেন, ত াহাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। সন্ন্যাসীও হরিদাসকে অতিশয় ভালবাসিতন।" (পৃ-১০৯) এই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে হরিদাস পুষ্করে গিয়ে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন থেকে বালককে লোকে হরিদাস নামে জানল। ২।১ মাস পুষ্করে থেকে তিনি গুরুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে কঠোর যোগশিক্ষা করেন। হরিদাসের কাছে সহস্রবীজ রুদ্রাক্ষের মালা থাকত। তিনি পূরক কুম্ভক ও রেচকের মধ্যে বহু নামজপ করতেন একামনে বসে। "কথিত আছে, হরিদাস একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া সমাধিসিদ্ধ হইয়াছিলেন।" (পৃ-১১২)

হরিদাস একদিন শিষ্যদের ডেকে একটি নির্ঝরের ধারে শয়ন করে জন্মের মত যোগশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েন।

তিনি শৈশবে দেখতে অতি সুশ্রী ছিলেন। কিন্তু স্বভাবটা চিরকাল রুক্ষ ছিল। অতি অল্প কথাতেই রেগে যেতেন। তখন ছোটবড়ো সবাইকে কটু কথা বলতেন। রাগ, অর্থলোপ ও ইন্দ্রিয়দোষ সত্ত্বেও তিনি যোগসিদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউই ছিল না। জেসোরেটায়, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে এবং কর্ণালে

তাঁর মঠ ছিল। এক একসময়ে এক একটি মঠে গিয়ে থাকতেন। তিনি সমাধি ধারণ করে যে অর্থ পেতেন সে-সব টাকায় মঠের ব্যয় নির্বাহ হোত। তাঁর স্থাপিত ধর্মশালায় নিত্য অতিথি সন্ন্যাসীদের আদর আপ্যায়ন করতেন তাঁর চেলারা। এসবের জন্য অর্থ গ্রহণে পাপ ছিল না, লেখকের বিশ্বাস। তাই লেখক হরিদাসের লৌকিক অপরাধ বা দোষের ভিতর গুণের চিত্র এঁকেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে হরিদাসের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শাস্ত্রালোচনায় আনন্দ পেতেন। তখন তিনি হোতেন অমায়িক ও প্রিয়ভাষী।

হরিদাস যুগধর্ম মানতেন না। তাঁর মতে, মানুষের আচার-ব্যবহার ঠিক থাকলে চারিযুগেরই সমান পরিমাণ আয়ুলাভ করা যায়। যোগাভ্যাস করলে মানুষ চারশো বৎসর জীবিত থাকতে পারে। বিবাহ, পুনর্বিবাহ, দত্তকগ্রহণ, বিদ্যাশিক্ষা, আহার নিদ্রা বিষয়ে তিনি মনুর মতই অবলম্বন করেন। অর্থোপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে এবং ঈশ্বরভক্তি বিষয়েও তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছে।" সুহৃদগণের কাছে ঈশ্বরের সখ্যভাব শিখিতেও গুরুজনের কাছে ঈশ্বরের বাৎসল্য শিখিবে এবং সুলক্ষণা স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রীতিযোগ অভ্যাস করিবে।" (পৃ ১২৪)

তাঁর তত্ত্বজ্ঞান—একদিকে ভগবদ্গীতা, অন্যদিকে সাংখ্য—উভয়ের মধ্যবর্তী। তিনি ছিলেন সমদর্শী, জগতের সকলই মঙ্গলের জন্য, এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। পালন ও ধ্বংসের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজসৃষ্ট হাতের সাম্যরক্ষা করেন। যোগিদের নিজেদের কর্ম নাই, যা আছে, সে কেবল ঈশ্বরের নিয়োগে। কাজেই তাতে অশুভ নাই। হরিদাস বলবেন. লক্ষ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভাল হলে, সত্য নাই, মিথ্যা নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই,—নিঃস্বার্থযোগী সকল কাজই করতে পারেন।

কিন্তু গৃহস্থের বিধি অন্যতর। লৌকিক নিয়ম না মানলে গৃহীরা বিনাশপ্রাপ্ত হবেন। যোগসাধনের পূর্বে যম ও নিয়ম (অহিংসা, অচৌর্য, সত্যকথন, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম।) পালন করতে হয় যোগীদের, কিন্তু যোগীরা তাঁদের মনে থাকে. অন্য অঙ্গ ভুলে যান। সংসারী লোক চিরকাল এই দশটি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্য করবেন।

হরিদাসের সমগ্র জীবনচিত্রাঙ্কনে লেখক তাঁর সম্পর্কে, মন্তব্য করেন যে, "সে কুসুমে কীট লাগিয়াছিল, তেমন পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্কের কালি পড়িয়াছিল।" রণজিৎ সিংহের ভয়ে ক্ষত্রিয়ানীকে নিয়ে হরিদাসের পলায়ণ 'ধর্মবীরত্বের' পরিচয়

নয় বলেই দোষারোপ করেছেন। তিনি তাঁকে যোগী বলে স্বীকৃতি জানালেও 'সাহসী যোগী' বলে মানতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, হরিদাস বৈষ্ণব হয়েও বামলিঙ্গ শিবের পূজা ও প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতেন। তাঁর মৃতদেহ চেলাদের দাহ করারও নির্দেশ দেন। তাঁর সেবাপরায়ণতার কথাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কণ্টকাকীর্ণ ডালে গোলাপের ন্যায় সুন্দরকে লেখক দেখেছেন সাধক হরিদাস চরিতে।

সর্বশেষে 'কর্মফল' অধ্যায়ে সমাধিধারণ কি প্রকার তার আভাস দিতে গিয়ে বলেছেন—"সর্প, ভেক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী শীতকালে গর্তের ভিতর নিদ্রা যায়, কিছুই খায় না। সমাধিধারণও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু মনুষ্যের দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার, সেজন্য কতকগুলি নিয়ম পালন দ্বারা শরীরকে সর্পাদির মত করিয়া লইতে হয়। আমাদের যোগবিদ্যায় এবং মুসলমানদের সুফিশাস্ত্রে সমাধির ব্যবস্থা আছে।" (পৃ-১৩২)

এছাড়া যোগসমাধির দ্বারা আয়ুবৃদ্ধি হয়, শরীর অকর্মণ্য হয় না, বহুদিন অনুশীলন করলে হিতকারী হতে পারে,—এই বিশ্বাসের কথা লেখকের নিজস্ব। লাঘোষায় তাই তিনি যোগসমাধি করতেন বলেই অনুমান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ সমাধি দান করা হয়। 'হরিদাস' চরিত গ্রন্থটি শুধু জীবনচরিত নয়, ভারতীয় যোগসাধনার মহিমাজ্ঞাপক ও স্বদেশ চেতনার পরিচয়বাহী সুখপাঠ্য একটি গ্রন্থ,—বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন এক সংযোজন, পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আপন অধ্যবসায় ও প্রতিভার স্পর্শে সকলকে তিনি সঞ্জীবিত করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সহস্র প্রণতি জ্ঞাপন করি।

'প্রকৃত কবি অস্ফুটরূপে চিত্রের কেবল আভাসটুকু টানিয়া রাখেন; তাহাতেই সকল ভাব বিন্যস্ত থাকে। সহৃদয় রসিক পাঠক তাহার যথাস্থানে উপযুক্ত বর্ণ ফলাইয়া লন।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

সংগ্রামী রঙ্গলাল

অধ্যক্ষ নীলমণি কুণ্ডু

শত শত গ্রামে ঘেরা আমাদের পশ্চিম বঙ্গ। অবিভক্ত বঙ্গ আকারে ও প্রকারে সেদিন বেশ বড়ই ছিল। শত বৎসর পূর্বে 'বৃহৎ বঙ্গ' বলে কথাটির তাৎপর্যও ছিল। বাংলার সন্তান সেদিন স্বচ্ছন্দে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, উড়িশ্যা, আসাম রাজ্যে যাতায়াত করত। শত শত বাঙালী ঐ সব রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বাসও করত বিশেষ মর্যাদা নিয়ে। আজ আর সেদিন নেই। যদিও এখনও পর্যন্ত নিকট বা দূর প্রতিবেশী রাজ্যে ভ্রমনেচ্ছু ব্যক্তি সমষ্টির বৃহৎ অংশের দাবীদার এই বাংলার সন্তানরাই। তবে এই বঙ্গ-সন্তানরা প্রবাসী হওয়ার আর সুযোগ তেমন পায় না, ভ্রমণ বিলাসী হওয়ার ভূমিকাটুকুই পালন করে মাত্র।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে নিকটবর্তী বিহার, একটু দূরের উত্তরপ্রদেশ এসব রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেরই জলবায়ু জীবনদায়ী। তাই স্যাঁতসেঁতে জলবায়ুর দেশ বঙ্গের সন্তানরা সুযোগ পেলেই স্বাস্থ্যোদ্ধারে ছুটতো, আজও ছোটে, ঐসব প্রতিবেশী রাজ্যে। ন্যায়-নব্যজ্ঞানের পীঠস্থান বঙ্গের নবদ্বীপ যত দ্রুত তার খ্যাতি হারিয়েছিল, উত্তর প্রদেশের বারাণসী বৃন্দাবন তাদের বিদ্যাকেন্দ্রের গৌরব তত দ্রুত হারিয়ে ফেলেনি। ফলে 'জ্ঞানার্জনের জন্য' প্রতিবেশী রাজ্যের সন্তান নবদ্বীপে না এলেও, বঙ্গের সন্তান বিদ্যাচর্চার জন্য বারাণসী, বৃন্দাবন যেত। নালন্দা, তক্ষশীলা তো বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

'রথ দেখা ও কলা বেচা'-এ দু'কাজ একত্রে করার মানসিকতা 'চতুর' লোকের লক্ষণ বলে সাধারণ্যে বিবেচিত। এই বিবেচনার মধ্যে একটু 'হীনতা'-র গন্ধ পাওয়া যায় সাধারণতঃ। আবার ঐ দু'কাজ পারলেই করার চেষ্টা করেন এমন লোক কিছু কিছু আছেন, যাঁদের মানসিকতায় 'হীনতা'র লেশ থাকেনা, বৃহৎ কোন তাগিদে অমনটি করে থাকেন। এঁরা এক বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী। এঁদের মানসিকতা উদার, সতত সঞ্চরণশীল। এঁরা গভীরে প্রবেশ করতে চান। স্বল্প জলে সাঁতারে এঁরা আদৌ তৃপ্ত হ'তে পারেন না, চান ও না। এঁরা সর্বভূক, এঁরা সতত পিপাসু। এঁরা চির অতৃপ্ত। তাই এরা 'চিরদিনের শিল্পী'। এ সব ক'টি গুণের, অন্য দৃষ্টিতে দোষের, সমাবেশেই সম্ভব 'সংগ্রামী' চরিত্র।

বঙ্গসন্তান রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন 'সংগ্রামী-চরিত্র' হিসাবে।

সংগ্রাম তাঁর পিতৃ-মাতৃহীন নিষ্করুন অবস্থার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম তাঁর আর্থিক অনটনের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম তাঁর শিক্ষার সাধারণ সুযোগের অভাবের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম তাঁর জীবন ও কর্মক্ষয়ী ব্যাধির বিরুদ্ধে। সংগ্রাম তাঁর জীবনেরই আর এক নাম। শতবৎসর পূর্বের বঙ্গের এক অখ্যাত গ্রাম রাহুতার এক নিম্নমধ্যবিত্ত মুখোটি ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রথম সন্তান আমাদের সংগ্রামী রঙ্গলাল। রাহুতা আমাদের অনেকের জানা, শোনা ও চেনা কালী সাধক রামপ্রসাদের—জন্মস্থান হালি শহরের নিকটবর্তী কিংবা শিয়ালদহ রেল লাইনের উপর অবস্থিত জংশন স্টেশন, নৈহাটি নিকটবর্তী একটি অখ্যাত গ্রাম। জেলা ২৪-পরগণা। জন্ম তারিখ ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় পিতার নাম বিশম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতা ভবসুন্দরী দেবী।

অল্প বয়সেই রঙ্গলাল হারিয়েছিলেন পিতা-মাতাকে, সুতরাং সহজেই বোঝা যায় কিশোর কাল থেকে তাকে সংসার যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হয়। কৈশোর কালের স্বাভাবিক আনন্দ, শান্তি তিনি পেলেন না। পরিবর্তে তাঁকে কাঁধে তুলে নিতে হ'লো বৃহৎসংসারের গুরুদায়িত্ব।

তার আগে সচরাচর যেমন ঘটে, রঙ্গলালের লেখাপড়ার শুরু-গ্রামেরই পাঠশালাতে। ক্রমে গ্রামেরই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বগ্রামে থেকে লেখাপড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান নি। দু'টি কারন। এক শারীরিক অসুস্থতা, দ্বিতীয় কারন আর্থিক অসচ্ছলতা। পরিবারের সিদ্ধান্ত হ'ল—রঙ্গলালকে পাঠানো হোক অধিকতর স্বচ্ছল অবস্থার অধিকারী নিকট আত্মীয় খুড়ো মহাশয়, শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে। খুড়ো মহাশয় বসবাস করতেন মানভূম পুরুলিয়ায়। সেইমত মানভূম পুরুলিয়ায় হাইস্কুলে ভর্তি হ'ন। কিন্তু শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করার সুযোগ রঙ্গলাল সেখানেও পান নি এবং ভবিষ্যতেও আর সে সুযোগ আর আসে নি। সুতরাং হাইস্কুলের প্রায় শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ গ্রহনের অধিকারটুকু সম্বল করেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকালের ছেদ টানতে হয় রঙ্গলাল কে। কারণটা যতদূর জানা যায়—হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে এফ. এ পাশের গৌরব অর্জন করার সুযোগটুকু তাঁরে পক্ষে তৎকালীন সময়ে বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাহুতা গ্রামে পৈত্রিক গৃহে বিরাট সংসার তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করছিল অহরহ।

বালি, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলিতে রুটিরোজগারের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তৎকালীন সময় থেকেই। রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও সুযোগ জুটলো বালি শহর নিকটবর্তী বালুটি গ্রামে ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ। অর্থাৎ দু' পাঁচ টাকা নগদ রোজগারের সুযোগ। তৎকালীন যুগে ইংরেজী শিক্ষায় সামান্য পুঁজি নিয়েই চাকরী করা যেত। এখানেও বেশী দিন শিক্ষকতা তাঁকে করতে হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ তাঁর জীবন দেবতা তো রঙ্গলালকে শান্ত নিরুপদ্রব—উদ্বেগহীন, স্বচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ দেবেন না। কক্ষচ্যুৎ হওয়াই রঙ্গলালের জীবন-লক্ষণ। কারণ রঙ্গলালের প্রতি নিয়ত সংগ্রাম করে 'জয়'-কে ছিনিয়ে আনতে হবে, করায়ত্ব করতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাই এলেন চন্দননগরে, ফরাসী শাসিত শহর-রাজ্যটিতে। পেশা সেই শিক্ষকতা, শিক্ষকতার সব চেয়ে বড় সুযোগ 'স্ব-শিক্ষিত' হওয়া, অর্থাৎ ইচ্ছাটুকু থাকলেই হ'ল। চল্‌তে চল্‌তে শেখা যায়, পড়ে পড়ে শেখা যায়। গাড়ী, বাড়ী, লোক লস্কর, ঘর গুদাম, হাতিয়ার জমি-জায়গা কিছুরই দরকার নেই। শিক্ষার উপকরণ চারি পাশে। দেখ, পড়, জান, বোঝ, শিক্ষা গ্রহণ কর। 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠো, জ্ঞানী হও। ঐ সুশিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য্য রঙ্গলালের জীবনে অতি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তাহা আজকার দিনের ৯ম-১০ম শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষার ভিত্তিটুকুকে সম্বল করে আপন চেষ্টায় ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, গণিত, কাব্য, ব্যাকরণ—বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

শিক্ষকতা এখানেও বেশী দিন করেন নি। নিকটবর্তী ইছাপুরের, পূর্ব ভারতের অন্যতম অস্ত্র কারখানা ঐখানেই গড়ে উঠেছে।

স্কুলের পণ্ডিতের পদে আসীন হ'লেন এবার। ম্যালেরিয়া তৎকালীন সময়ে বঙ্গভূমিতে পাশাপাশি ভাবে আসর পেতেছে। প্রায় কোন গ্রামই ম্যালেরিয়া জরের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পায় না। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে ঐ জরের প্রকোপে। রঙ্গলালেরও প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ ম্যালেরিয়া জর, ঐ রোগের পুনঃ আক্রমণের জন্য রঙ্গলাল ইছাপুর ত্যাগ করলেন। এলেন কলকাতায়, রুটী রোজগারের পথ হ'ল এবার টাকা-তৈরীর কারখানায়, অর্থাৎ টাকশালে। রাজধানী শহর হ'লে হয় কি, ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সেখানেও কম নয়। তা ছাড়া ঐ জরের বীজ তো সেই কিশোর কাল থেকেই তাঁর দেহ-

অন্তরে। তাই ঐ জ্বরের প্রকোপ বারে বারে দেখা দিতে থাকল। কলকাতার বাস তাকে তুলতে হ'ল ঠিক হ'ল তার উত্তর প্রদেশে বসবাসকারী জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়ে জলহাওয়া বদল। উদ্দেশ্যে—এর ফলে যদি ম্যালেরিয়াকে দেহ-চ্যুত করা যায়। এখন জ্যাঠামহাশয়ের আশ্রয়ে গাজিপুরে। গাজিপুর মুঘল আমলের শেষ যুগ থেকেই আতর উৎপাদনে সুখ্যাতি পেয়ে আসছে। উত্তর প্রদেশের শুক্‌না আবহাওয়ায় ও বিশেষ চিকিৎসায় রঙ্গলাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। দেহ রোগ মুক্ত। কিন্তু দেহ ধারণের জন্য চাই খাদ্য বাসস্থান। তা পাওয়া যেতে পারে চাকরি করে। চাকরি নিলেন পুলিশ বিভাগে। ঐ বিভাগের বিশেষ পদ্ধতি-রীতি এখনও যেমন অস্বস্তিকর বলে বিবেচিত হয়' তখনও হ'ত রঙ্গলালের মত মানুষের মানসিকতা ঐ চাকরিতে কিছুতেই আনন্দ, স্বস্তি পেতে পারে না। তাই বিতশ্রদ্ধ রঙ্গলাল পুলিশের চাকরি ত্যাগ করলেন। চাকরি ত্যাগ মানেই উপার্জন বন্ধ। তার অর্থ আর্থিক বিপর্যয়, মানসিক বিপর্যয় তো সঙ্গে থাকবে। কিন্তু রঙ্গলালের জীবনে তো ঐ বিপর্যয়গুলি জীবনযুদ্ধের নামান্তর। প্রতিটি বিপর্যয়, প্রতিটি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেই তো রঙ্গলালের আজীবনের সংগ্রাম।

যৌবনে প্রারম্ভেই তৎকালীন যুগের রীতি অনুযায়ী জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বেত্যবাটী শহরের লক্ষীনারায়ণ পণ্ডিতেরা কন্যা জ্ঞানদাদেবীকে বৈবাহিকসূত্রে। রাহুতার গৃহে অনেকগুলি পরিবার পরিজন তাঁর উপার্জনের অপেক্ষায় দিনানিপাত করছে। আমরা এই অবসরে রঙ্গলালের ফেলে আসা কিছু পূর্ব অধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিই। ম্যালেরিয়ার মত শত্রুকে তাঁকে বার বার মোকাবিলা করতে হয়েছে আমরা তা দেখেছি। দেখেছি জন্মরাজ্য বঙ্গকে ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যেও যেতে হয়েছে রোগমুক্তির সুবিধার জন্য। রোগী হয়ে রোগের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছে বার বার। আর ততবার মনে হয়েছে এই শত্রুর সঙ্গে সহজে যুঝবার হাতিয়ার অধিকার করতেই হবে। সংগ্রামী চরিত্রের লক্ষণই তাই। শুধু সংগ্রাম নয়, সংগ্রামে 'জয়ী' হওয়া চাই। এই সংগ্রামের আয়ুধ লাঠি-সোঁটা নিশ্চয়ই নয়। চাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা অধ্যয়ন। গুরুর প্রয়োজন এখানেও। গুরু হয়ে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করলেন দু'জন। নিজ চিকিৎসক, বন্ধুব্য রামচন্দ্র সাধু এবং বিদেশী চিকিৎসক ট্যাঙ্গউ সাহেব। এঁরা দু'জনেই এ্যালোপাথিক চিকিৎসক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর শাখার জ্ঞানও অবহেলিত হয়নি রঙ্গলালের কাছে। বিজ্ঞানী মনের অধিকারী তো রঙ্গলাল। তাই হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রও

পাঠ করলেন গভীর অনুসন্ধিৎসায় ও অনুরাগে। এসবের সুযোগ ঘটেছিল রঙ্গলাল যখন চন্দননগরে বসবাস করছিলেন, সেই সময়ে, এই চিকিৎসা বিদ্যাকে তখনও পর্যন্ত জনসেবায়, রুটী রোজগারের প্রয়োজনে রঙ্গলাল ব্যবহার করেন নি। তবে কিছুই যাবে না ফেলা' একথার তাৎপর্য রঙ্গলালের পরবর্তী জীবনের অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছিল।

আমরা পুলিশের চাকরি ত্যাগ ও তৎজনিত কারণে আর্থিক বিপর্যয়ের অবস্থায় রঙ্গলালকে রেখে এসেছি। এবার তাঁর প্রসঙ্গে ফিরব। সম্ভবতঃ 'পুলিশের আপাতঃ লোভনীয় চাকরি' ত্যাগ উত্তর প্রদেশের আত্মীয় স্বজনেরা ভাল মনে গ্রহণ করেন নি। তাই বিরূপ আত্মীয়দের নিকট হতে দূরে সরে আসতে চাইলেন। সম্ভবতঃ জন্মভূমির আহ্বানও তাঁর নিকট তীব্রতর হয়ে উঠেছিল তাই ফিরতে চাইলেন বঙ্গে।

এবারে সাহায্য করলেন আর এক আত্মীয় উচ্চ পদস্থ শিক্ষাবিভাগীয় রাজ-কর্মচারী হরকালী মুখোপাধ্যায়। তাঁর চেষ্টায় আবার শিক্ষকতার সুযোগ। শিক্ষক হিসাবেই আমাদের এই জন্মভূমে রঙ্গলালের পদার্পণ। তারপর বীরভূমেই তাঁর দিনানিপাত, শেষ আশ্রয় ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং বীরভূমের রাঙামাটির বুকেই চির-শান্তিলাভ, সংগ্রামের নিবৃত্তি।

বীরভূমের তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ গ্রাম দাঁড়কায় এসে পদার্পণ করলেন। উদ্দেশ্য দাঁড়কা গ্রামের ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে শিক্ষকতা। যখন এলেন, তখন রঙ্গলাল গেরুয়া বসনধারী। স্বল্পবাক্, উদাসী। নূতন মানুষ। চারিত্র বৈশিষ্টের জন্য সহজে বন্ধু জোটে না, শিক্ষকতা করেন, অবসর সময়ে অধ্যয়ণ করেন নানা শাস্ত্র, বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ঘুরে বেড়ান ময়ুরাক্ষী নদীর কূলে কূলে চষা মাঠের ধারে ধারে। সম্ভবতঃ এই সময় 'যোগ' সাধনার চেষ্টা করতেন। রঙ্গলালের সমাধি ফলক, যা এখনও লাঘোষা গ্রামের বিশেষ স্থানে রয়েছে অবহেলিত অবস্থায়। তাতে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—'মহাযোগী', ঐশব্দটি এবং তৎকালীন তাঁর বেশভূষা, আচার নিভৃতে থাকার ইচ্ছা, লোকজন কোলাহল পরিহার এই সবই যোগ সাধনার অনুযায়ী। যদিও প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গলালের যোগসাধনা বিষয়ক 'প্রমাণ' সংগ্রহ করা যায়নি !

ক্রমে গেরুয়া বসন ত্যজিত হ'ল, প্রধান শিক্ষকের পদে থাকার জন্য জন-পরিচিতি বাড়ল। বন্ধু স্বজনের আগমন বাড়ল। সামাজিক দায় দায়িত্ব ও পালন

করতে লাগলেন আর দশজনের মতো। 'স্বভাব কবির' সহজাত গুণেরও অধিকারী ছিলেন রঙ্গলাল। তাই কাব্য শুধু পাঠই করেন?' কাব্য অনুভূতির উন্মেষ ও ঘটেছিল রঙ্গলালের মধ্যে। এই মণি-কাঞ্চন যোগেই কবির আত্ম প্রকাশ ঘটে। রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও তা ঘটছিল। মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। লিখিত প্রকাশ তো ছিলই। তৎকালীন যুগের 'সোমপ্রকাশ', 'আত্মদর্শন', 'জন্মভূমি', 'কল্পদ্রুম'-প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। প্রকাশনায় স্বাধীনতার সুবিধার জন্য ১২৯০ বঙ্গাব্দে কলকাতায় নিজেই একটি ছাপাখানা বসিয়ে ছিলেন। 'হরিদাস সাধু' নামীয় পুস্তকটি কয়েক বারই ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

স্বভাব কবি রঙ্গলালের একটু পরিচয় আমরাও এখনই পেতে পারি, দাঁড়কার স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যিনি তৎকালীন যুগে অন্যতম জ্ঞানী, গুণী বাঙালী। শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদস্থ পরিদর্শক।

স্কুল পরিদর্শনের পর জনসমাবেশ ঘটানো হয়েছে গ্রামে। গ্রামের শিক্ষা বিষয়ক আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গে কোন একজন রঙ্গলাল অনুরাগী, গুনমুগ্ধ ব্যক্তি প্রকাশ করলেন—'উনি ভাল শিক্ষকইনন, একজন উঁচুদরের কবি।' সভাস্থ জনসাধারণ সমস্বরে বলে উঠলেন—'রঙ্গলাল বাবু একটি কবিতা শুনিয়ে দিন স্যারকে।' কেউ বলে উঠলেন 'মাননীয়-ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব, আপনি শুধু একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করুন। রঙ্গলালবাবু ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবেন কবিতায়। স্বভাব লাজুক রঙ্গলাল স্মীতহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। ভূদেব বাবু খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন। হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল?' রঙ্গলাল পাদ পূরণ করলেন কবিতায় তাৎক্ষনিক ভাবে—

একদিন ~~আমি~~ আমি শশিমুখী রাই
কহিলেন গুণ গুণ প্রাণের কানাই,
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ
আগমন করিয়াছ এই ব্রজ মাঝ।
ললাটে অল্প তব বাঁকা ভাবে আঁকা,
চরণে নূপুর পরো তাও শ্যাম বাঁকা,
সকলি তোমার বাঁকা সোজা কিছু নয়,
বাঁকা আঁখি, বাঁকা ঠাস বাঁকাই সকল
হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল?

আমরা সহজেই বুঝতে পারছি—এ যে বিশেষ শক্তির অভিসার। এ তো বিরল। হ্যাঁ, রঙ্গলাল নিশ্চয় বিরের বঙ্গসন্তানদের মধ্যে একজন। বিরল সংগ্রামী সামান্য প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তিকে অবলম্বন করে বিরাট সাহিত্যকর্ম 'বিশ্বকোষ' রচনা পর্যন্ত এই রঙ্গলালের কীর্তি, Britanica Encyclopedea এর মত বিশ্বকোষের সমপর্যায়ভুক্ত হওরার যোগ্য। এই বিশ্বকোষ রচনায় তাঁকে জ্ঞান-রাজ্যের প্রতিটি মণি কোঠায় খোঁজ রাখতে হয়েছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই বিশ্বকোষ রচনা করার পর প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেও, মাত্র ২টি খণ্ড মুদ্রিত আকারে প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ আরব্ধ কর্ম শেষ করে অভাবনীয় সুখ্যাতি লাভ করেন জ্ঞানী, গুণী, জ্ঞান তাপস নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব মহাশয়।

নাটকও লিখছিলেন রঙ্গলাল। নাম 'রাম বনবাস।' এখানেও রঙ্গলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খবর পেতে পারি। নাটকটি লেখা হ'ল বীরভূমের হেতমপুর রাজবাড়ীতে অভিনয় করার জন্য। দাঁড়কা গ্রামের জমিদার বাড়ীর সঙ্গে হেতমপুর রাজ বাড়ীর বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাই হোক, রাজ বাড়ীর নাট্য-পরিচালক প্রস্তাব করলেন নাটকটির কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। নম্র শিক্ষক রঙ্গলাল ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন বিশেষ কৌশলে। পরিবর্তনের সুযোগের জন্য নাটকটি ফিরিয়ে আনলেন নিজের কাছে এবং নাটকটি আর ফেরৎ পাঠালেন না। রঙ্গলালের বক্তব্য 'নাট্যকার আমি, নাট্যকের ভালমন্দ আমার। ফরমায়েসী নাটক লেখা নাট্যকারের কর্ম নয়। ওটা বেতন ভোগী কর্মচারীর কাজ হতে পারে। ইত্যাদি। সংগ্রামী চরিত্রের লক্ষণও তাই। একটু বেশী স্বাধীনচেতা হয়ে থাকেন এঁরা। অথচ—এঁরা জনসেবী প্রকৃত অর্থে। জনসেবার জন্যই শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনেকদিনের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নকে পুনরুজ্জীবিত করলেন দাঁড়কা গ্রামে এসে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সব ব্যবচ্ছেদ একটি বিশেষ অধ্যায়। ঐ অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার সুযোগ রঙ্গলাল এর পূর্বে পান নি। পারেন রহুতা গ্রাম ছাড়ার পর প্রায়শঃই আধা শহরে বসবাস করেছেন। সব সংগ্রহ ও ব্যবচ্ছেদ ঐ পরিবেশে সহজ ব্যাপার নয় আবার তিনি প্রাতিষ্ঠানিক চিকিসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীও নন, শিক্ষকতা ত্যাগ করার পর অদূরবর্তী 'লাঘোষা' নামক গ্রামে তখন বসবাস করছেন রঙ্গলাল। রঙলাল ডাক্তার নামে সে সময় পরিচিত—প্রখ্যাত। নিজস্ব চিকিৎসাগার স্থাপন করেছেন। এমনকি সব ব্যবচ্ছাগারও। লাঘোষা গ্রামের কিছুদূরে শ্মশান ভূমি রাত্রের অন্ধকারে পরিত্যক্ত করে শব দেহ—গৃহে এনে নিভৃতে ব্যবচ্ছেদ করতেন

এবং দেহ যন্ত্রের জটিলতা বোঝবার চেষ্টা করতেন। সুতরাং শাস্ত্র অধ্যয়নে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ফলে সব্যসাচী চিকিৎসক হিসাবে রোগ মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লেন এবং আজও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের যেটুকু ক্ষীণ স্মৃতি আশে পাশের গ্রামবাসীদের মধ্যে রয়েছে তা এই রকম—' —ও, রঙলাল ডাক্তাররা··· ।' বহুল খ্যাত ধন্বন্তরীর মতই খ্যাতি লাভ কছিলেন তৎকালীন যুগে রঙ্গলাল বীরভূমে।

'সেই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সমাধি ফলকটি রয়েছে—দাঁড়কা সন্নিকট লাঘোষা গ্রামে অবহেলিত অবস্থায়। সমাধিস্থ হওয়ার বাসনা রঙ্গলালের নিজেই ছিল। তাই তাঁর দেহ দাহ করা হয়নি। সমাধিস্থ করা হয়েছে।

সমাধির উপরে ইঁট বাঁধানো বেদী। উত্তর পার্শ্ব সংলগ্ন এক খণ্ড মর্মর প্রস্তরে লেখা :

ওঁ তারা

দয়া সিন্ধুর্মহাযোগী 'বিশ্বকোষ' প্রবর্ত্তকঃ।

জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালোর হৃদয়ে বিশ্ব বাসিনাম্॥

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—

আবির্ভাব গ্রাম রাহুতা জেলা ২৪ পরগণা

২৪শে আষাড় ১২৫০

তিরোভাব ১৭ই কার্ত্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ—

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদৃশাম্।

নষ্টে দেহে তথেবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥

যে সমাধি অন্য কোথাও নাই

সিরাজুল হক
সম্পাদক বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি

পূজ্য পূজার অভাবে একটি বিরল দৃষ্টান্ত সমাধি অবহেলিত রয়ে গেল বিগত ৭৮ বছর ধ'রে। রীত্যনুসারে যেসব ধর্মাবলম্বীর মরদেহ মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে থাকে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ-ই নন তিনি। অথচ অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট একটি সমাধি। চারপাশের মাটির থেকে এক ফুট ছ'ইঞ্চি উঁচু মূল বেদীটি। মাঝখানে অর্থাৎ বক্ষ বরাবর আর একটি থাক, উচ্চতা প্রায় ইঞ্চি নয়েক-কাঠের বাক্সের মত একটি শবাধার যেন। সমাধিটি উত্তর-দক্ষিণে দশ ফুট দু' ইঞ্চি দীর্ঘ, প্রস্থ সাত ফুট দশ ইঞ্চি। চতুষ্কোণ। শিরোভাগ উত্তর দিকে। এইখানেই সমাধিবেদীর গাত্রসংলগ্ন একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ পরিচয় যাদৃশং লিপি ও সেই সঙ্গে পবিত্র উপনিষদ গ্রন্থের দুটি শ্লোক, "ঘটপুং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তদৃশম্। / নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজত।।" অর্থাৎ ঘটসদৃশ এই দেহ পরিত্যক্ত হলে, আত্মা আদিরূপেই অবস্থান করে। সমাধিটি পাকা; যথারীতি চূর্ণ সুরকি ইট সিমেণ্ট দিয়ে নির্মিত। চিতাগ্নিতে যেসব মরদেহের প্রথাসিদ্ধ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে থাকে তৎস্থলে এই সমাধিটির বিদ্যমানতা অবশ্যই বিস্ময়কর, ব্যতিক্রমবাহী ও অভাবিত নিদর্শন একটা। কৌতূহলী প্রশ্ন এসে যায়, কার এবং কোথায় এই সমাধিস্থান? এটাতো সাধারণ একটা গোরস্থানও নয় যে আশেপাশে ইটবাঁধানো না হলেও আরও কিছু সংখ্যক ভূমিসাৎ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধির চিহ্নাদি থাকবে। গ্রামটিতে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু আর মুসলমানের বসবাস। চাষী প্রধান গ্রাম। সামান্যতম ব্যবধান বজায় রেখে পৃথক পৃথক পাড়া। সমাধিটি হিন্দুপাড়াতেই তবে বেশ একটু লোকালয়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বাইরের দিকে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা গ্রামের সাধারণ রাস্তার পাশেই। কয়েক হাত দূরে পূর্ব ও দক্ষিণে খণ্ড খণ্ড চাষের জমি। বাঁশঝাড়ে ছায়াচ্ছন্ন একটি জীর্ণ মন্দির দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমদিকের জায়গায় গা-লাগাও ছোটখাটো একটা পুকুর। পারিপার্শ্বিকতার সবটুকু জড়িয়ে ধরলে কেবল সমাধির জায়গাটি-ই কিছুটা ফাঁকা। তৃণাচ্ছাদিত। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাস থেকে কার্ত্তিক পর্যন্ত সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা।

পরিবেশটি শান্ত, নীরব অথচ বেদনাদায়ক একটা বিষন্নতায় আত্মশীল। তবে বিভিন্ন ঋতুতে ঝড় জল, চৈতালী ঘূর্ণীতে নিকটবর্তী গাছপালার উড়ে-আসা শুষ্ক ছিন্ন পত্রাদি আর প্রত্যহ গোধূলি লগ্নে গ্রামফেরা পালপাল গরু মোষ ছাগল ভেঁড়ার পদতাড়নায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল, গরু-গাড়ীর চাকায় উড়ন্ত ধূলিকণা জায়গাটিকে স্বাভাবিকভাবেই মলিন করে রাখে। কে আর মার্জনার প্রতি নজর দিবে? অথচ আলোচ্য সমাধি গর্ভের মানুষটি কী অসীম বুকভরা মানবপ্রীতি আর মানবসেবার মহাব্রত নিয়ে আজ থেকে ১২৪ বছর আগে এখানে এসেছিলেন একদিন এবং রোগার্ত নরনারীর সেবা-চিকিৎসা করে জীবনান্তে এই খানের মাটিতেই শেষ শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কোন এক সময় তাঁর এক ভ্রাতৃ-পুত্র এসে পরিচয়ফলকসহ সমাধিটি পাকা করে বাঁধিয়ে দিয়ে যান। সেই অবস্থাতে আজও রয়েছে। বিগত ১৯৭৮ সালে ময়ূরাক্ষী নদীর বিধ্বংসী বন্যায় সমাধিটির সামুহিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এতদ্‌প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক ন্যাথনিয়েল হার্থত্তর্ন সাহেবের একটি উক্তি মনে পড়ে, "A grave, wherever found, preaches a short and pithy sermon to the soul." অর্থাৎ সমাধি বিশেষ যেখানেই দেখা যাক্, তা মানবাত্মার কাছে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ধর্মোপদেশের কথা-ই নীরবে বহন করে চলে। এই তত্ত্বকথা নিয়ে মানুষ ভাবে, চিন্তা করে, অনুসন্ধানী হয়। আর সেই ভাবনা-চিন্তা অনুসন্ধিৎসা আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে অনুপ্রাণিত করেছিল বঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিতাগ্রগণ্য 'বীরভূম বিবরণী' কার প্রয়াত সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তদীয় সুহৃৎ বঙ্গীয় নাট্যজগতের একদা সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চাভিনেতা, নাট্য বিদ্যাভারতী, কবিভূষণ রায় নির্মলশিব ব্যানার্জি বাহাদুরকে এই পবিত্র সমাধিটি দর্শন করতে। সেকালে রাস্তাঘাট ছিল অতীব দুর্গম। তাঁরা গোযানের সাহায্যেই এসেছিলেন গ্রামটিতে। আর তারই ফলশ্রুতি হল উপরোক্ত সাহিত্যরত্ন প্রণীত 'বীরভূম বিবরণী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচায়িকাটুকু। পরবর্তী সময়ে তাঁর 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে একটি বিশেষ অধ্যায় লিখিত হয়ে মানুষটিকে অধিকতর চেনাজানার সুযোগ করে দিয়েছে। নচেৎ কেবল নামটি ছাড়া বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও অজ্ঞাতই থেকে যেতেন সুধি সমাজে। অথচ সমসাময়িক কালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গসাহিত্যের বরেণ্য কবি সাহিত্যিকগণের গ্রন্থবদ্ধ চরিতমালার বাইরে থেকে গেলেন তিনি, এটা কম আক্ষেপের বিষয় নয়! সে

যাই-ই হোক, কিন্তু আজও থাকবেন কেন অজ্ঞাতসারে? দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ চল্লিশ বছর হল। দিকে দিকে আজ জাতীয় জাগৃতি আর পূজ্য-পূজার আয়োজন অনুষ্ঠান। অভাব শুধু এইখানে। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কাশীরাম-কৃত্তিবাস-ভারতচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গভারতীর বরপুত্রদের আনুষ্ঠানিক স্মৃতি উদ্‌যাপন আর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদি হয়েছে। হালফিল শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদেরও হয়েছে, হওয়া অবশ্যই উচিত, তবে এ ব্যাপারে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে পূর্ণাঙ্গতার গৌরব অনুভব করা যায়। এ-ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা বিষয়বস্তুর উপর অফুরন্ত গবেষণা কার্যের দ্বার খোলা রয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু সেদিকে আজও কোন গবেষণাকর্মীর আগ্রহ দৃষ্টির আকর্ষণ অথবা প্রীতি পোষণার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে বলতে বাধা নাই, গবেষণাকার্যও আজ বহুলাংশে বাণিজ্যধর্মী বণিকবৃত্তি প্রভাবিত। যে কাজে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা সেই দিকেই নজর পড়ছে সবার। রবীন্দ্রগবেষণার বন্যায় দেশ ভেসে যাক, একশ্রেণীর কবি সাহিত্যিক সমালোচক পণ্ডিতের হাতে পড়ে রবীন্দ্রভাবনা শিল্পপণ্যে পরিণত হয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করার সুযোগ করে দিক তাঁদের—অসূয়া করব না। কিন্তু দেশের অতীত ইতিহাস, সভ্যতা, বিজ্ঞানসাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্প ও স্থাপত্যকলায় ঐতিহ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরাপর যাঁরা রেখে গেলেন নানা অবদান, সমৃদ্ধতর করে গেলেন সেগুলিকে চিত্ত বিনোদন ঐশ্বর্যসম্ভারে তাঁদের প্রতি কি কোন জাতীয় কর্তব্য নাই আমাদের? বিশেষতঃ উপেক্ষিত আর অবহেলিত যাঁরা? বেদনা এইখানেই। আর তা অপূর্ণতাজনিতই। অতএব অপূর্ণতার বেদনাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সার্বিক জাতীয় অনুসন্ধান প্রয়োজন।

যেহেতু নিবন্ধটির শিরোনাম "যে সমাধি অন্য কোথাও নাই" কাজেই সমাধিটি কার এবং কোথায় সেই আলোচনায় আসা যাক এখন।

এই পবিত্র সমাধিটি বিশ্বকোষ প্রবর্তক, কাব্য রত্নাকর, ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক মহাযোগী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অথবা তার লেখক-লেখিকাগণের এক একটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত জীবন কাহিনী সম্বলিত পুস্তক মধ্যে তিনি পরিবর্জিত থেকে গেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এক আধ ছত্রে কোথাও কোথাও তাঁর নামটি দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। অথচ তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর স্বনামখ্যাত সাহিত্যসাধক এবং সেইসঙ্গে একজন বিচিত্রকর্মা পুরুষপ্রবর। একাধারে

কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিকিৎসা নৈপুণ্যে প্রবাদ পুরুষ, অধ্যাত্মচর্চায় তন্ত্রসাধক, মহাযোগী, আবাল্য জীবন-সংগ্রামে তথা প্রচণ্ড দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত একজন অসমসাহসী যোদ্ধা। শূর-বীর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'-এ একটি অনন্যসাধারণ চরিত্রাঙ্কণ আমরা দেখতে পাই। যেহেতু পেশায় তিনি (রঙলাল) ছিলেন চিকিৎসক অতএব বাস্তববাদী লেখক তারাশঙ্করবাবু যথাযথভাবে চিকিৎসকের চরিত্রটি প্রয়োজনবোধে বেছে নিয়েছিলেন এবং সেইভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁকে। উপন্যাসের চরিত্রটি হল 'রঙলাল ডাক্তার'। পড়তে পড়তে মনে হবে এ-রকম একজন মানুষ থাকা কি সম্ভব? চরিত্রটি কাল্পনিক নিশ্চয়ই। না। আদপেই কল্পনাপ্রসূত নয়। বইটি বের হওয়ার অব্যবহিত পরেই ব্যক্তিবিশেষের চিঠিপত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তারাশঙ্করবাবু প্রত্যুত্তর জানিয়েছিলেন পত্রপ্রেরককে, "চরিত্রটি একান্তই বাস্তব এবং মানুষটি-ও (রঙলাল) রক্তমাংসেরই দেহধারী। আমার এলাকায় (লাভপুর) এরূপ একজন মানুষ ছিলেন একদিন।" শতাব্দীপূর্বে মহানগরী থেকে সুদূর এক ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত শিক্ষাদীক্ষায় অনুন্নত অজ পাড়াগাঁয়ে ব'সে শুধু ডাক্তারী করা নয়, মরা-মানুষের লাশ সংগ্রহ করে নীরবে-নিভৃতে নিজস্ব শবব্যবচ্ছেদাগারে তাকে ছুরি চালিয়ে কেটেকুটে এ্যানাটমির সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুধাবন আর মৃতব্যক্তির দেহাভ্যন্তরস্থ জটিল আধি-ব্যাধির জন্ম-কারণ সংঘটনগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আর একাগ্রচিত্ত সাধনা-গবেষণা চালাতেন। সেকালে আচার সর্বস্ব অতি কঠোর রক্ষণশীল হিন্দুজাতির মধ্যে তীব্রতম কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে যাঁর জন্ম তাঁর পক্ষে পাড়াগাঁয়ে বসবাস করে এরূপ একটি রোমাঞ্চকর কর্মসাধনার নজীর স্থাপন ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি দেখা গিয়েছে কি কোথাও? নিদান হাঁকা ডাক্তার। রুগীর মৃত্যু অবধারিত। দিনক্ষণের নড়চড় হ'ত না। আবার এমন এমন জটিল রোগের রুগীর চিকিৎসা করে নিরাময় করে দিয়েছেন, সেসব ঘটনা কিংবদন্তী হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত। অথচ রঙলাল ডাক্তার কোন মেডিকেল স্কুল-কলেজে, ইউনির্ভাসিটি:তে শিক্ষালাভ করেন নি এবং সে সুযোগও তাঁর হয় নি। সেলফ্‌মেড ম্যান—আত্মসাধনাকৃত মানুষ। স্বায়ম্ভু জ্ঞানতপস্বী। বলা যেতে পারে তিনি নিজেই নিজেকে একটি এ্যাকাডেমিতে পরিণত করে ফেলেছিলেন।

অতঃপর পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা রঙলাল ডাক্তারের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশভূষা, রুগীবাড়ী যাওয়ার যানবাহন, ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে তারাশঙ্করবাবু বলেছেন, "উত্তর থেকে আসতেন রঙলাল ডাক্তার—তসরের প্যাণ্টালুন, গলাবন্ধ

কোট, গলায় কারে ঝোলানো পকেট ঘড়ি। রঙলাল যাওয়া-আসা করেন পাল্কীতে ......এ-অঞ্চলে তিনিই প্রথম এ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন, (১২৭৮) অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যক্তি।" আর রঙলালের সেই অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক চেহারার বর্ণনায় পাই, স্বাস্থ্য-সবল, গৌর দেহবর্ণে সমুজ্জ্বল, চোখের চাউনি অন্তর্ভেদী, ব্যক্তিত্ব প্রখর, সাহসে অটল, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। সেই আত্মবিশ্বাস তাঁকে পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গশীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল ব'লে তিনি স্বীয় সমাধিগাত্রে মর্মরফলকে উৎকীর্ণ স্বরচিত শ্লোকটিতে জীবিতকালে ব'লে যেতে পেরেছিলেন, "দয়া সিন্ধুর্মহাযোগী বিশ্বকোষ প্রবর্তকঃ।/ জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ব-বাসিনাম্।" অর্থাৎ দয়াসিন্ধু এবং মহাযোগী, যাঁর দ্বারা বিশ্বকোষ প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই রঙ্গলাল জীবিত বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বিরাজ করছেন। অনুরূপ আত্মোপলব্ধি আর আত্মপ্রত্যয় দেখতে পাই মেঘনাদ বধ কাব্যে মহাকবি মধুসূদনের মধ্যে, "রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" আর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামে পাই, "বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি/ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া/খোদার আসন আরশ ছেদিয়া/ উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর/'' অথবা "দেখব এবার জগৎটাকে আপন হাতের মুঠোয় পুরে।'' মহাভারতীয় একটি চরিত্র কুন্তীপুত্র মহাবীর কর্ণের কম্বুকণ্ঠ শুনি, "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।" অর্থাৎ দৈবকুলে আমার জন্ম, পৌরুষ আমার করায়ত্ত। দৈবকুলে রঙ্গলাল অবশ্যই জন্মগ্রহণ করেন নি, কিন্তু স্বাভাবিক জন্মসূত্রেও পুরুষকার তাঁর করায়ও হয়েছিল ; রঙ্গলালের জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করে দেখলে এ-কথার সমর্থন না মিলে যাবে না।

রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন ১২৫০ বঙ্গাব্দে ২৪শে আষাঢ় মঙ্গলবার, ২৪-পরগণা জেলার নৈহাটী থানার অন্তর্গত রাহুতা নামক গ্রামে। পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতা ভবসুন্দরী দেবী। বাল্যকালেই মাতৃপিতৃহারা ; তদুপরি দুর্বহ দারিদ্র্য। পড়াশুনা গ্রামের পাঠশালা ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে। তৎপরে মানভূম-পুরুলিয়ায় খুল্লতাতের আশ্রিত হয়ে তথাকার ইস্কুলে পঠন-পাঠন। কিন্তু সবক'টি শ্রেণীর শিক্ষালাভ তাঁর হয়নি। সুতরাং এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি। পাঁচ পাঁচটি সহোদর রঙ্গলালের। রঙ্গলাল জ্যেষ্ঠ। নিজের ও ভাইদের অশন-বসনের, অন্নসংস্থান চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন রঙ্গলাল। রঙ্গলাল অর্থোপার্জনের তাগিদে ঘর ছাড়লেন। ন্যূনাধিক কুড়ি বছর বয়সে সর্বপ্রথম শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করলেন বালির নিকটবর্তী বালুটী গ্রামের ইংরাজী-বাংলা

বিদ্যালয়ে এবং কিছুদিন পর চন্দননগরে বদলী হয়ে সাহিত্য ও গণিত শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করলেন। কলেজাদিতে বিদ্যাশিক্ষা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও আপন প্রচেষ্টায় ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতশাস্ত্রে তিনি প্রভূত জ্ঞানার্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চন্দননগরের পর ইছাপুর স্কুলে পণ্ডিতপদে নিযুক্তি। সেকালে দেশব্যাপী ভয়াবহ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ ইছাপুরে-ও। আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায় রঙ্গলাল। ইছাপুর ত্যাগ করে কলকাতা গেলেন। চাকরী নিলেন টাঁকসালে। এখানেও রেহাই নাই। ম্যালেরিয়া তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। অতএব গাজীপুরে জেঠামশাই মতিলালের গৃহে আশ্রয় নিয়ে চিকিৎসান্তে আরোগ্য লাভ করে পুলিশবিভাগে চাকরী নিলেন। কিন্তু তাতে তিনি সুস্থির থাকতে পারলেন না; ইস্তফা দিলেন সে চাকরীতেও। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখে এবং নিজেও ভুক্তভোগী হয়ে রোগার্ত মানুষের অব্যক্ত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযন্ত্রণা বুকভরা বেদনা দিয়ে তিনি অনুভব করলেন। তার প্রতিকার মানসে তিনি উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও চিকিৎসানুশীলনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। সংকল্প করলেন তিনি, হাতে-কলমেই শিক্ষালাভ করবেন। চন্দননগরে থাকাকালীন তাঁর এই মানসিক বিপ্লবটি বোধ করি কোন এক অদৃশ্যশক্তির প্রভাবেই ঘটে গিয়েছিল। একাজে পরম হিতৈষী হিসাবে পেয়ে যান তৎকালীন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার রমণচন্দ্র সাধু ও ডাক্তার আই হ্যাঙ্গার্ড সাহেবকে। অত:পর কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ রাজেন্দ্রলাল ও দেশবিশ্রুত হোমিওপ্যাথ বেরিণী সাহেবের স্নেহদৃষ্টিলাভকরতঃ তাঁদের অধীনে অধ্যয়ন ও অনুশীলনরত হয়ে নিজেকে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন করে তুললেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন স্বনামখ্যাত বন্ধুবর লোকনাথ কবিরাজের কাছে। এই ত্রিবিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ লব্ধজ্ঞানের ফলশ্রুতি হল উত্তর-জীবনে সেল্‌ফমেড—'রাঙ্গলাল ডাক্তার' যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

চন্দননগরে থাকাকালীন রঙ্গলাল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, বৈদ্যবাটীর লক্ষ্মী-নারায়ণ পণ্ডিতের কন্যা জ্ঞানদাদেবীর সঙ্গে।

পুলিশের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রঙ্গলাল অর্থসংকটের অথৈ জলে পড়েছিলেন। সংসার অচল, ভাইদের ভরণ-পোষণ নিয়ে চরম বিপদাপন্ন। এই দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে তৎকালে বীরভূমের বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক রঙ্গলালের আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায় মশায় প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপত্র

দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সে সময়ের প্রসিদ্ধ গ্রাম দাঁড়কার (বীরভূমে) ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ে।

১৭৭১ সালে ভাদ্রমাসে দাঁড়কা গ্রামে স্কুল-শিক্ষকতা করতে আসেন রঙ্গলাল। সন্ন্যাসীর বেশে। পরিধানে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। বয়সে তরুণ হলেও মুখমণ্ডল ঋষিসুলভ শ্মশ্রু-গুম্ফ মণ্ডিত। সম্ভবতঃ তিনি সে সময় যোগসাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করে থাকবেন। আবার আবাল্যই তিনি সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। দাঁড়কায় থাকাকালীন তাঁর নিভৃত কাব্যচর্চার কথাও জানাজানি হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গাজীপুরে থাকার সময় তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জমিদার ঠাকুরদত্তের নিকট পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও পাণিনির কিছু কিছু পাঠ নিয়েছিলেন। এই সময়েই কানপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মবর্তের পণ্ডিত গিরিজাদত্ত শাস্ত্রী, নওগাঁয়ের পণ্ডিত যুবক মন্নূলাল শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ মন্নূলাল শাস্ত্রীর নিকট তিনি কাব্য, নাটক, আগম-পুরাণাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাজেই শুধু একজন স্কুল শিক্ষক নন, তদুপরি একজন গুণীশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধজন হিসাবেও দাঁড়কার জনসমাজে সহজেই সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলেছিলেন রঙ্গলাল। তাঁর দাঁড়কায় শিক্ষকতা কালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিভাগীয় স্কুলসমূহের পরিদর্শক স্বনামখ্যাত প্রাবন্ধিক-সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মশায় দাঁড়কায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে রঙ্গলালের মুখে মুখে কবিতা রচনার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে সবিশেষ চমৎকৃত হন। ঘটনাটি ছিল পরীক্ষামূলক। ভূদেববাবু প্রশ্ন করে যান, আর রঙ্গলাল করে যান তার যথাযথ তাৎক্ষণিক পাদপূরণ। ভূদেববাবু সেইদিনই বুঝেছিলেন এই তরুণ শিক্ষকটি একজন সামান্য ব্যক্তি নন। অসামান্যই। বিকাশের পথে অপেক্ষমান একটি প্রতিভা বিশেষ। রঙ্গলাল দাঁড়কায় একটি ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তথাকার স্বনামখ্যাত জমিদার রায়পরিবারের সঙ্গে হয় তাঁর সুগভীর মিত্রতাস্থাপন। এই পরিবারের গুণগ্রাহী পঞ্চানন রায় ও মহাতাপচন্দ্র রায় রঙ্গলালের বহুরচনা কলকাতার তৎকালীন একাধিক সম্ভ্রান্ত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। দাঁড়কায় বছর পাঁচেক কাল শিক্ষকতা করার পর স্কুলকর্তৃপক্ষ উপরোক্ত রায়পরিবারে গৃহবিবাদ দেখা দিলে স্কুলটি লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং রঙ্গলাল দাঁড়কার পাট চুকিয়ে দিয়ে চিরকালের মত শিক্ষকবৃত্তি ত্যাগ করে নিকটস্থ লাঘোষা নামকগ্রামে ঘরবাড়ী তৈরী করে চিকিৎসালয় খুলে শুরু করে দেন ডাক্তারী এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই চিকিৎসাবৈগুণ্যে প্রশংসনীয় পসার জমিয়ে ফেলেন এক বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী গ্রামগুলিতে। চিকিৎসাবিদ্যা ও

তৎসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা তো ত াঁর আগেই উপযুক্ত পরিমাণে অর্জিত হয়েই ছিল। রঙ্গলাল একই আধারে ছিলেন চিকিৎসক এবং তন্ত্রাচারী। কিন্তু মনোধর্মে ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যসাধক। আর এই সাধনা-ই ত াঁকে বাংলা সাহিত্য-জগতে চির অমর করে রেখেছে বাংলা ভাষায় 'বিশ্বকোষ' বৃহদভিধান প্রবর্তনায়।

১২৯০ সাল। রঙ্গলাল ডাক্তার তখন বসবাস করছেন বীরভূমে। চিকিৎসালব্ধ সুপ্রচুর অর্থে একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন সে সময় কলকাতায়। দেখাশুনা আর উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বহুটাকা লোকসান হয়। কাজেই ছাপাখানাটি উঠিয়ে পৈত্রিক গ্রাম রাহুতায় নিয়ে যান। এইখানেই ত াঁর ছাপাখানা 'বিশ্বকোষ' যন্ত্রে ত াঁর অমর কীর্তি 'বিশ্বকোষ' বৃহদভিধানের প্রথম খণ্ড (প্রকাশকাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এরূপ একটি আকরগ্রন্থের প্রকাশনা দেখে বিদেশী সাহিত্যসেবিগণ পর্যন্ত তার যথাযোগ্য সমাদর করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। একাজে সহায়ক ছিলেন ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থের সুবিখ্যাত লেখক ত াঁর মধ্যম সহোদর স্বনামধন্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বিশ্বকোষ' প্রবর্তন ও সংকলন শতবর্ষ পূর্ব সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার্য একটি দুরূহ ও দুঃসাধ্য (বলা যেতে পারে অচিন্ত্যনীয় কেননা নিতান্ত অজ্ পাড়াগাঁয়ে বসে যেটি করা হয়েছিল) কর্ম যা ভেবে দেখতে গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। রঙ্গলাল-প্রণীত কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, নাটক ও ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থগুলি হল—'চিত্তচৈতন্যোদয়,' 'বৈরাগ্য-বিপিন বিহার,' 'হরিদাস সাধু,' 'রামবনবাস,' 'শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ,' 'শরৎশশী' 'বিজ্ঞান দর্শক' প্রভৃতি। এছাড়া তৎকালীন সম্ভ্রান্ত সাহিত্য পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' এর বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং 'এডুকেশন গেজেট,' 'কল্পদ্রুম,' 'জন্মভূমি,' 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর স্বনামে ও বেনামে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়। এইসব রচনার ভাষাশৈলী যদিও শতবর্ষ পূর্বের কিন্তু আধুনিকতার পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ অযথা তৎসম-তদ্ভব শব্দে ভারাক্রান্ত হয়ে পাঠকবর্গের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটায়নি। এমনই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যময় প্রসাদ গুণান্বিত প্রাঞ্জল ভাষা।

রঙ্গলালের গ্রন্থ ও রচনাদি পাঠ ক'রে বিদ্যোৎসাহী বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ এতদূর পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত ক'রে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখনকার মত সাহিত্য-বিচারক মণ্ডলীতে স্তাবকগোষ্ঠী পরিবৃত ও দলীয় প্রভাব বিস্তার করত: অর্থ পুরস্কার অথবা

খেতাব প্রাপ্তির সলুক-সন্ধানের সুযোগ তখন আদপেই ছিল না বা কল্পনারও অতীত ছিল তা'। মনীষীদীপ্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের যথাযথ পাণ্ডিত্যের ও যোগ্যতার বিচার-বিশ্লেষণ তখন রাজদরবারের সুযোগ্য সভাপণ্ডিতগণই স্থির করে দিতেন। সেই বিচারে তিনি 'কাব্যরত্নাকর'। উল্লেখ্য, ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ তাঁর কবিতার পরমপ্রিয় রসাস্বাদক ছিলেন। রঙ্গলাল স্বয়ং তাঁর চন্দননগরে গঙ্গাতীরের বাড়ীতে গিয়ে রাজসমীপে কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে আসতেন। হেতমপুর রাজবাড়ীর নাট্যপ্রিয়তা ছিল সুবিদিত। শোনা যায়, তাঁর 'রামবনবাস' নাটক-খানি হেতমপুর রাজবাড়ীর শখের থিয়েটারে অভিনয়ার্থে প্রদত্ত হয়েছিল। ডাক্তার হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর ছিল রাজবাড়ীতে। আর বাঁকুড়ায় মালিয়াড়ার রাজপুত্রের গৃহশিক্ষকও কিছুকাল ছিলেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর জীবনেতিহাসের আরও অসংখ্য দিক আলোচনা করার আছে যেগুলি গ্রন্থিত হলে তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনের অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করে বিস্ময়াপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। বক্ষ্যমান নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা থেকে আপাততঃ বিরত থাকতে হল।

২৩ বছর বয়সে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমে আগমন করেন। তার পর থেকেই আমৃত্যু তিনি বীরভূমেরই স্থায়ী বাসিন্দা। অর্থাৎ ৪৪ বছর কাল বীরভূমই তাঁর সাহিত্য, অধ্যাত্ম ও চিকিৎসা কর্মের সাধনপীঠ। দেশব্যাপী ভয়াবহ ম্যালেরিয়া জ্বর, উদরজোড়া প্লীহা, ব্যয়সাধ্য কলেরা-বসন্ত-নিউমোনিয়া, দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ক্ষয়রোগ প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় শত শত আর্তজনের নিরাময় করণে নিবেদিত প্রাণ রঙ্গলাল মানবসেবার মহাব্রত সমাপন করে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্তিক 'লাঘোষা' নামক গ্রামের মৃত্তিকা নিয়ে তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধজনের অশ্রুধারায় স্নাত মরদেহটি সমাহিত রেখে গেছেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে 'তাঁকে দাহ করা হয়নি। বীরভূমের প্রতি এমনই ছিল তাঁর অপরিমেয় মায়া মমতা প্রাণাধিক ভালবাসা। দক্ষিণবঙ্গের কোথায় সেই নৈহাটী থানার রাহুতা গ্রামে গর্ভধারিণী ভবসুন্দরীর কোল আলো ক'রে তিনি এসেছিলেন একদিন এই পৃথিবীতে আর জীবনান্তে রাঢ়বঙ্গের এক প্রত্যন্ত জেলা বীরভূমের বক্ষস্থল বরাবর প্রবাহিতা গৈরিক জলধারার ময়ূরাক্ষী নদীর উপকণ্ঠে লাভপুর থানার লাঘোষা গ্রামে দ্বিতীয় মাতা বসুন্ধরার ক্রোড়ে চিরশান্তির আশ্রয় নিলেন রঙ্গলাল। জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস (তৎকালে

কন্দরা গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এর লীলানিকেতন আর সমাধিভূমিতে আর একটি চিরপ্রণম্য সারস্বত মহাজনের সংযোজন ঘটেছিল এইরূপে।

দেশ আজ স্বাধীন। অতএব দিকে দিকে আজ নানাক্ষেত্রে জাতীয় জাগরণের উন্মেষ। শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মকর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার আর সেকালের ক্ষেত্রে যাঁরা স্মরণীয়-বরণীয় পুরুষ অথচ অবহেলিত, বিস্মৃত, বিস্মৃতপ্রায়—দেশবাসী ও জাতীয় সরকারের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আজ, তঁাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণের পাদপীঠে আনা ও তঁাদের যথাযোগ্য স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা করা। রঙ্গলালের পবিত্র সমাধির সংস্কার ও সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। বীরভূমের মাটিতে পাঁচ পাঁচটি পীঠস্থান ও সেই সঙ্গে কবিতীর্থ নানুর ও জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামে সম্বৎসর বাইরে থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী এসে থাকেন; সভক্তি প্রণাম নিবেদন ক'রে যান। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ী। সিউড়ী দাশকলগ্রাম সদর রাস্তাটি পূর্বমুখে লাভপুরের পাশ দিয়ে প্রলম্বিত; তার মাইলখানেক পশ্চিমে রাস্তার গা-লাগাও আহম্মদপুর-কাটোয়া রেললাইনের গোপালপুর শেখমপুর হল্ট স্টেশন থেকে খাড়া উত্তরমুখী একটি মেঠো রাস্তার মাত্র মাইল চার ব্যবধান আধুনিকীকরণ করলে যানবাহন যোগে দেশ বিদেশের পর্যটকগণ অনায়াসে রঙ্গলালের সমাধিমূলে পৌঁছে যেতে পারেন এবং সেই বিরল দৃষ্টান্ত সমাধিটি দর্শন ক'রে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন। পক্ষান্তরে পর্যটন শিল্পেও আর একটি সংযোজন অন্তর্ভুক্তি লাভ করতে পারে। অতএব সহৃদয় দেশবাসী ও জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? আর বীরভূমের সাহিত্যসেবী বিশেষতঃ নাম বুভুক্ষু তরুণ সাহিত্যসেবিগণ শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রচার তথা অতিরিক্ত নাম-যশাকাঙ্খার পিছনে প্রাণান্ত ছুটোছুটি না ক'রে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে পূর্বসূরিদের প্রতি কিঞ্চিৎ কর্তব্য পালন করবেন কি?

বিজ্ঞানমনস্ক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ড. অশোকানন্দ গোস্বামী

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতায়, সমাজ সংস্কারে বাংলার আকাশ বাতাস তখন প্রাণবন্ত। এমনিই এক সময়ে বাংলাসাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছিল এক বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার। তিনি বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলার সাহিত্যসেবী সমাজেও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে পরিচিত করাতে হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দাদা বলে।

বীরভূম বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বীরভূম বিবরণী' ও 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ দিক নির্দেশনা আছে।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বাংলার সাহিত্য জগতে প্রথম অনুসন্ধান যোগ্য প্রশ্ন তোলেন বীরভূম সাহিত্য পরিষদের কার্য নির্বাহী সদস্য জনাব সিরাজুল হক। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য কৃতিকে বর্তমান প্রজন্মের নিকট উপাস্থাপন করার জন্য তিনি গঠন করেন বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি। এই উদ্যোগী, কর্মবীর, সাহিত্যামোদী ও সংগঠক শ্রদ্ধেয় সিরাজুল হক মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

ইতিহাস বড়ই নির্মম। সহজে সে কাউকে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে ভাবি, দাঁড়কা, ভূকৈলাস, মালিয়াড়া, হেতমপুর প্রভৃতি রাজপরিবারের সঙ্গে যাঁর হৃদ্যতা, বর্ধমানের মহারাজা যাঁকে কাব্যরত্নাকর উপাধিতে ভূষিত করেন, বাংলায় কোষগ্রন্থ রচনা করার ধৃষ্টতা (অপপ্রয়োগ হলে মাপ করবেন। তবে অপরিমেয় পাণ্ডিত্য, সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ এবং আত্যন্তিক সাহস না থাকলে কোষগ্রন্থ রচনা করার কল্পনা করাও ধৃষ্টতা বৈকি। বিশেষতঃ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্য অনুসারে 'ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গলালের নিজের রচিত'।) যিনি দেখাতে পারেন তিনি কিভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন।

অতীব সুখের কথা, রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রঙ্গলালের বহুমুখী প্রতিভার কার্যকরী বিশ্লেষণ সমন্বিত স্মারকগ্রন্থ বের হচ্ছে। অগ্রজ সাহিত্যসেবীরা এতে তাঁদের ত্রুটী সংশোধন করবেন বলে আশা করি। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের

বিজ্ঞান মনস্কতার উপর দু'চার কথা আলোচনা করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে।

'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' এবং 'বীরভূম বিবরণ' গ্রন্থে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে বিবরণটুকু পাওয়া যায়, তাতে একটু একমুখিনতা প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিচরণ, জ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় অবগাহন জীবিকার বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি, জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিকে সঙ্কলন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রবেশ ও প্রস্থান আমাদেরকে রঙ্গলালের ব্যক্তি মানস সত্তায় অস্থিরমতিত্ব আরোপ করতে বাধ্য করে।

অতিচঞ্চলকে যেমন শেষ পর্যায়ে অতিশান্ত হিসাবে দেখা যায়, তেমনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পরিবেষ্টনে রঙ্গলালকে দেখে যেন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

দারিদ্র্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে রঙ্গলালকে বৃত্তি পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল। ম্যালেরিয়া তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। আত্যন্তিক অভিমান বোধে তাঁকে সাংসারিক দিক থেকে নিস্পৃহ করে তুলেছিল। কোন একটা কিছুর জন্য যেন তিনি সারাজীবন শুধু সাধনাই করে গেলেন। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচ ন,-এর সার্থক উদাহরণ হয়ে রইলেন।

রঙ্গলাল একই জীবনে পুলিসের কেরাণীগিরি থেকে বিশ্বকোষ সম্পাদনা, কাব্য-লিখন থেকে শবব্যবচ্ছেদ, ভাষাতত্ত্ব থেকে টাকশালে পয়সা কাটার অধ্যক্ষ, দুর্গোৎসব থেকে পরিণাম বাদ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। একজনের জীবনায়ণে, জীবন দর্শনে ও জীবনবোধের প্রকাশে এত বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতা আর কোথাও দেখা যায় কিনা জানা নেই।

রঙ্গলালের প্রবন্ধ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দু' চারটি নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে। তাঁর চিন্তার স্তর কত সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক ছিল।

১) অদ্ভুত ভৌতিক তত্ত্ব (২) অদ্ভুত কাব্য জগৎ (৩) জাতিভেদ (৪) কন্দজাতি (৫ বাংলাভাষা ও ব্যাকরণ (৬) ভাষার নমনীয়তা (৭) গোল্ড স্টুকারের পাণিনি সংক্রান্ত বিচার (৮) সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে (৯) স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয় ব্যয় (১০) তুমিই কি সেই দৈবকীনন্দন ? (১১) রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বা-পর্য্য সম্বন্ধে (১২) পরিণামবাদ (১৩) যোগতত্ত্ব (১৪) প্রেমতত্ত্ব (১৫) বেদব্যাসের প্রাচীন তত্ত্ব ও উৎপাদন (১৬) দুর্গোৎসব (১৭) শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ (পর্যটন গ্রন্থ) ইত্যাদি। এইরূপ বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব প্রবন্ধ

লিখেছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে আরও অবাক হতে হয়। কাব্য-রত্নাকর যে একই সঙ্গে কত সুন্দর বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন। তা অবাক বিস্ময়ে ভেবে দেখতে হয়।

রঙ্গলালের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির সবগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং একই সঙ্গে ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় 'যথালাভেই' বিরতি দিতে হয়েছে। সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে।—

১) প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি (২) পত্রদ্বারা রসশোষণ (৩) বর্ষুক বৃক্ষ (৪) পিপীলিকা জাতির মনোভাব ব্যক্তি ও সংলাপশক্তি (৫) পক্ষীজাতির পক্ষবল (৬) মানব দেহতত্ত্ব (৭) মোমাই (৮) আমিষ ভোজনের ঔচিত্যানৌচিত্য (৯) সমুদ্রমন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি (১০) বিষ্ণুর যোগমায়ার সূর্য্যাবরণ ১১) পৃথিবীর অবয়বাকৃতি (১২) সৌরতেজ ও কলঙ্ক (১৩) পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান (১৪) দাহ্য কার্পাস (১৫) পরমানুক ও দ্ব্যনুক তত্ত্ব।

রঙ্গলালের এইসব প্রবন্ধের আলোচিত ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরবর্তীকালে অনেক উন্নতি হয়েছে। একটি বিষয় কিন্তু লক্ষ্যনীয়, ভবিষ্য ইঙ্গিত যদি যুক্তি নির্ভর হয়, তা ফলবতী হতে বাধ্য।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞানের চর্চা সর্বদাই মানবহিতকর এবং পার্থিব উন্নতির সহায়ক।

রঙ্গলালের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশ বলা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বীরভূমের প্রত্যন্ত প্রদেশে এরকম একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির অধিষ্ঠান বিরল বৈকি।

মঞ্জিষ্টা গাছের শেকড় থেকে আগে লাল রং (ম্যাজেণ্টা রং) তৈরী হত। নীলগাছ থেকে নীল রং তৈরী হত। এই সব উদ্ভিজ রং বর্তমানে কার্বন থেকে তৈরী হয়। বস্তুত আলকাতরা ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রায় ২০০০ রকমের রং কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে ; এবং মানুষ আজ গর্ব করে বলতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন বর্ণ নেই যা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত সম্ভব নয়।

রসায়ণ বিদ্যার অগ্রগতি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে রঙ্গলালের মনোভাব তাঁর ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাক।

(১) আশ্চর্য দেখ, রাসায়ণিক বিদ্যার অসাধ্য কিছুই নাই—এখনও যাহা মানুষের সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে কালক্রমে তাহাও সুসাধ্য হইবে।

(২) পাশ্চাত্ত্য রাসায়ণিক শাস্ত্র সর্বপ্রস্ট। বিধাতার নিপুণ হস্তের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছে। (পার্থিবাঙ্কারের বর্ণকোপাদান)

বিজ্ঞানের উপর এই যে অগাধ বিশ্বাস, এটিই তো প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রমাণ।

'তথ্য' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের একটি বিশেষ উপাদান। রঙ্গলালের প্রবন্ধে তথ্যের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়।

'তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব প্রবন্ধ লেখা হয়। তাতে প্রচলিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় করে যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠামূলক সিদ্ধান্ত টানা হয়। রঙ্গলালের প্রবন্ধে এই যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণ প্রচুর রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে সর্বজনবোধগম্য উদাহরণ। রঙ্গলালের প্রবন্ধগুলিতে এরূপ প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

পৌর্ব্বাপর্য্য সংরক্ষণ যে কোন প্রবন্ধের একটি বিশেষ শৈলী। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে এই শৈলীরক্ষণ একটি বিশেষ সমস্যা। রঙ্গলাল এ সমস্যায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতিপয় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই তখনও ছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন। রঙ্গলাল রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও এই সংস্কার বোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে রঙ্গলালের উক্তি, '১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই মহোপকারিণী বিদ্যা তমসাচ্ছন্ন ছিল। সকলেই জড় জগতের তথ্যানুসন্ধান করিতেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে কখন যে কেহ হস্ত প্রসারণ করিতে পারিবেন, অতি বিচক্ষণ রাসায়নিকও একবার সাধ করিয়া মনে তাহা ভাবেন নাই।' স্পষ্টতই রঙ্গলাল এখানে বিজ্ঞানী উলারের (Wholer) কৃত্রিমভাবে 'ইউরিয়া (urea) প্রস্তুতের কথা বলেছেন। উলারের কৃত্রিম ইউরিয়া প্রস্তুতকরণ জৈব-রসায়ণের দ্বারোদঘাটন করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই জৈব রসায়ণ যে কতখানি যুগান্তর এনেছে তা বর্ণনাতীত। আজ শতবর্ষ পরে আমরা রসায়ন বিজ্ঞানে সাধ্য অসাধ্য নির্ণয়ে যে মন্তব্য অবলীলাক্রমে করি রঙ্গলাল তা একশ বছর আগে করেছিলেন।

'কিন্তু এই শাস্ত্র দিনে দিনে গুপ্ত বিষয়ে যেরূপ আবরণ খুলিয়া দিতেছে, তাই ভাবিতেছি—একদিন সকল পদার্থ যে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না, সেকথা বা কেমন করিয়া বলি? (পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান)

বিজ্ঞানের সাধনা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। ভারতের বিজ্ঞান সাধকেরা বারবার সেকথা বলে গিয়েছেন। রঙ্গলালের মুখে যেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পূর্বধ্বনি।

'বিদ্যার আদর সর্বত্র।...কিন্তু সে বিদ্যা দর্শনহীন, বিজ্ঞানহীন, তাহা জীবনহীন দেহের মত।...আজ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সূত্র, কালে যে এই জগৎকে বাঁধিয়া ফেলিবে না তাহা কে বলিতে পারে?...ইউরোপের এত গৌরব, এত সুখ সমৃদ্ধি' কেবল বিজ্ঞানের প্রভাবে; ভারতবর্ষের এত অনাদর, এত দরিদ্রতা, কেবল বিজ্ঞানের অভাবে। ইউরোপ বুদ্ধিবলে মাটীকে সোনা করিতেছেন, ভারত অসার রসের রসিক, আমোদ করিয়া সোনাকে মাটী করিতেছেন। দেখ, সম্মুখে দুর্ভিক্ষ তর্জনী তুলিয়া তর্জন করিতেছে, তবু কি চৈতন্য নাই? ভারতবর্ষ কবে বিজ্ঞান বলে বলিষ্ঠ হইবে? ভারত সন্তান! ভারতের মুখ কবে উজ্জ্বল করিবে? (পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান)।

উড়োজাহাজ বিহারী থেকে বিজ্ঞানী সকলেই একমত যে জগতে কলাকৌশল সমন্বিত যত প্রকার বস্তু আছে। পাখীর দেহ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বোধহয় জটিলতার দিক থেকে সর্বোত্তম। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, তাড়িত বল, স্নায়ুবল, বিভিন্ন ধরণের জটিল লিভার সমন্বয়, হাড়ের গঠন দেহের গঠন কৌশল, প্রভৃতি নিয়ে পাখীর দেহ এক বিস্ময়। রঙ্গলাল 'পক্ষজাতির পক্ষবল' প্রবন্ধে এই জটিল তত্ত্বের সুন্দর প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করেছেন।

মানুষের অস্থির ভারসহ ক্ষমতা ও পাখীর অস্থির ভারসহ ক্ষমতা, মানুষের খাদ্য সম্ভারের প্রয়োজনীয়তা ও পাখীর খাদ্য সম্ভারের প্রয়োজনীয়তার তুলনা, মানুষ ও পাখীর অস্থির গঠন ও বিন্যাস কৌশলের তুলনা প্রভৃতি এতে রয়েছে। বর্তমানের ফোরেনসিক বিজ্ঞানের মূল কথা তাঁর প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়।

'কোন একটি বৃত্তের কিঞ্চিৎ নির্দিষ্ট অংশ দেখিতে পাইলে তাহার সহস্র পরিধি অঙ্কিত করা যায়। জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরস্পরের উপযোগী করিয়া এমন আশ্চর্য কৌশলে বিধাতা নির্মাণ করিয়াছেন যে, তাহার কোন একস্থানের কিঞ্চিৎ অংশ দৃষ্টি করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাপূর্ব খাটাইয়া দেওয়া যায়।' (প্রবন্ধ—পক্ষীজাতির পক্ষবল)

একটি পাখীর শুধুমাত্র চক্ষুটী দেখে গোটা পাখীটার দেহতত্ত্ব সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত টানা যায় তার বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন তিনি।

অবশেষে তাঁর ভবিষ্য ইঙ্গিত, 'যাহা হউক, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি

হইলে এককালে মানুষও পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড়িতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।' (প্রবন্ধ—পক্ষীজাতির পক্ষবল)

অপরিমেয় পর্যবেক্ষণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে 'পিপীলিকাজাতির মনোভাব ব্যক্তি ও সংলাপশক্তি' প্রবন্ধে। কিভাবে পিপীলিকারা পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করে, তাদের কোন সংলাপ শক্তি আছে কি'না, নানা বিচার বিশ্লেষণ করে উদাহরণ দিয়ে অবশেষে লিখেছেন, 'পাঠক! নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি পাঠ করুন। ঈদৃশীভাব প্রকাশ শক্তির যত্মপি অন্য কোন নাম রাখিতে পারেন, ভাবিয়া দেখুন। আপনাদিগের উপর এ ভার অর্পণ করিলাম।' তিনি নিজে এই শক্তিকে বাক্‌শক্তি বলে অভিহিত করেছেন, যদিও, 'তাহাতে কাব্য নাটক রচনা করা না চলুক।'

পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাটি তাঁরই ভাষায় বলা যাক্। 'যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাক, আমি তোমার সম্মুখে আছি—দেখিতে পাইবে বৈ কি! কিন্তু একবার আপাদমস্তক দৃষ্টি করিয়া নিরস্ত হইও না, কিঞ্চিৎ চিন্তাশীল হইয়া আমারে দেখ—প্রবন্ধ—যদি দেখার উপর আরও কিছু থাকে বুঝিতে পারিবে।' মোমাই) পর্যবেক্ষণ শুধু দৃষ্টিপাত নয়, দৃষ্টির সঙ্গে মননের চিন্তাশক্তির ফলশ্রুতি। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রঙ্গলালের ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য, 'ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা আশ্চর্য্য দেখি, যে ঔষধের গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন উপকারী, মনুষ্য বুদ্ধিবলে যে ঔষধের গুণ স্থির করিয়াছেন, সে ঔষধ পীড়ায় ততদূর হিতকর নয়।' (মোমাই)। এরকম বহু ঔষধের উদাহরণ তিনি দিয়াছেন যাদের গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আজন্ম সংস্কারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাতটি তিনি বেশ ধীরমস্তিষ্কে বিবেচনা করেছিলেন।

'চক্ষে কোন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোন তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন না। যেখানে বড় আশ্চর্য দেখিলেন, তথায় দেবত্ব আরোপন করিয়া মনের সুখে পূজা করিতে লাগিলেন।' (মোমাই)

ভারতবাসীর এই মনোভাব সম্বন্ধে প্রকৃত বিজ্ঞানান্বেষীরা প্রায়ই এই দোষারোপ করে থাকেন।

পাথুরিয়া কয়লা সম্পর্কে ভারতবাসীর মনোভাব, রঙ্গলালের ভাষায়, "বালকেরা ঘসিয়া উহাতে লিখিবার কালী প্রস্তুত করিত, ইতরলোকে জ্বালিয়া 'শীতকালে

অগ্নিসেবন করিত,' পণ্ডিতেরা 'মরুত্তরাজার যজ্ঞের অঙ্গার' বলিয়া কচকচিতে আসর গরম করিতেন।" (মোমাই)।

বোঝা যায় কয়লা তখনও 'Black Diamond' হয়নি।

আগম পুরাণ, বেদবেদান্ত অভিজ্ঞ কাব্য নাটক উপন্যাস প্রণেতা ভাববাদী রঙ্গলালের বৈজ্ঞানিকোচিত সিদ্ধান্তটী অবহিত হওয়া যাক। 'আমরা দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার শিখিতে পারি না—সে পাঠ যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বৈদান্তিকেরা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া কি গুরুমন্ত্র যে কাণে পড়িয়া দিয়াছেন, আমরা সকল কাজেই দেখি দেবলীলা নাবিয়া বেড়াইতেছে।...নৈসর্গিক তত্ত্বানুসন্ধান অচলা ভক্তিতে গিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়াছে।' (মোমাই)।

বস্তুতঃ ইউরোপ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বস্তুর ব্যবহারিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেনি। অনুসন্ধানের বিষয় ছিল দুটি একটি অ্যালকেমি (অল্‌কিমিয়া) বা স্বর্ণোৎপাদন, আর একটি এলিক্সির (অল্‌-ইস্কর) বা অমরত্ব লাভের টনিক। বাকী সব আবিষ্কার তো এদেরই উপজাতি।

'Oriental Materia Medica' থেকে সংগৃহীত 'মোমাই' ওষুধের বিবরণ অধ্যাপক সেলিগম্যান কর্তৃক প্রচারিত হবার আগে পর্যন্ত এটি সাধারণের অগোচর ছিল।

রঙ্গলালের ভাষায় 'দেহের কোন স্থান আহত হইলে মোমাই লেপনে আশুফল দর্শে। এমন কি, সেখানে আহত হস্তপদ কর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা হয়, সেখানেও মোমাই লেপনে কোন উৎকট ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। দুঃখের কথা এই মহোপকারী ঔষধ নিতান্ত দুর্লভ।'..উহা আশ্চর্য কৌশলে প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।' (মোমাই)।

কিন্তু এর সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত ছিল সেটি রঙ্গলালের বিবরণ অনুসারে এইরূপ—

'অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পারস্যরাজ হাবসীদিগকে ক্রয় করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে বলকর বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী খাইতে দেন। যখন দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের ব্রহ্মতালুতে একটি ছিদ্র করিয়া উৰ্দ্ধপদে অধোমুণ্ডে উচ্চে বাঁধিয়া রাখেন। নিম্নে একটি কটাহে বিবিধ মসলাযুক্ত তৈল অগ্নিতে ফুটিতে থাকে। ঐ তৈলে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িয়া এক একটি চাপ হয়। পাক সিদ্ধ হইলে ঐ চাপ মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখেন। কিছুকাল গত হইলে উহা

মোমাই তে পরিণত হয়।' (মোমাই) রঙ্গলালের মন্তব্য, 'এটি একটি অমূলক গল্প' এবং এই অলীক গল্প শুনিলে ঐ ঔষধেও অশ্রদ্ধা জন্মে।'

মোমাই এর আবিষ্কার, উপাদান, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণের পর বিজ্ঞান-মনস্ক রঙ্গলালের প্রবন্ধের উপসংহারটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। শতবর্ষ পূর্বের এইরূপ একজন বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের উপসংহারটি এইরূপ,—

'পারস্যদেশীয় লোকেরাও ভারতবাসীদের ন্যায় কাল্পনিক গল্প রচনায় পটু। কিন্তু মোমাইয়ের তত্ত্বসন্ধানে তাঁহাদের বিচক্ষণতা দেখিতে পাওয়া যায়।... সৌভাগ্যের বিষয়, নির্ঝরের জলে তাঁহারা কোন দৈবশক্তির আরোপ করেন নাই। বোধ করি, ভারতবাসী হইলে তৎক্ষণাৎ ফুল বিশ্বপত্র লইয়া অর্চনা করিতে বসিতেন। সকল পদার্থে ঈশ্বরত্ব জ্ঞান—উন্নতির দ্বারে কণ্টক। যতদিন উহা পরিষ্কৃত না হইতেছে, ততদিন এ শোচনীয় অবস্থা ঘুচিবে না।......ঝড়ে চাল উড়িয়া যায়, আর এমন প্রবল বাত্যায় চাল উড়িতে দিব না, এ সকল নূতন সৃষ্টি কস্মিনকালে তোমার ক্ষমতায় হইয়া উঠিবে না। যদি বড় বিপদগ্রস্ত হও, আচমন করিয়া পবনদেবের স্তব পাঠ করিতে বসিয়া যাইবে।......যদি স্বদেশের উন্নতি চাও, ভারতের যদি শ্রীসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, অধ্যবসায়, সহকারে সকল বিষয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান কর—তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে, তোমার মাতৃভূমি ভারতের কোল আলো হইবে।' (মোমাই)।

ভারতীয় তন্ত্রসাধনা ও যোগবিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করার কথাও চিন্তা করতেন তিনি। চৈতন্য হরণ (Hypnotism) এবং উত্তর সাধন (Mesmerism) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মুখবন্ধে বলেছেন, 'এগুলি জীবনীর তাড়িতশক্তির (Electro biology) লক্ষণ ও প্রকৃতি এবং প্রাণবান দেহীর স্নায়ুচক্রে তাহাদের কার্যকারিতা অনেককেই বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে যাদুকরণ প্রভৃতি বিদ্যার যে প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, এতদ্দারা স্পষ্ট অনুমিতি হয়, —এতদ্দেশে ঐ সমস্ত নিগূঢ় তন্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন ছিল।' (প্রবন্ধ চৈতন্যহরণ)

উপসংহারে কিন্তু তাঁর মন্তব্য, 'এতদ্দেশীয় উদ্‌ঘাটন, বশীকরণ প্রভৃতি যে অভিচার বিদ্যা প্রচলিত আছে, তাহারও এইরূপ কিছু মূল থাকিবে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত থাকুক, তাহা কিন্তু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এখন প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রচুরভাবে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এখন ইহার আলোচনা বিড়ম্বনার বিষয়। আমরা কেবল পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

(চৈতন্যহরণ) নিজের দেশের বিদ্যাবলে সংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে তিনি তার বর্তমান অবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত বলে মেনে নেননি।

সত্যকার বিজ্ঞানমনস্কতার এটা আর একটি উদাহরণ।

'কোন একটি অদ্ভুত যন্ত্র দেখিলে স্বতঃ তাহার নির্মাণ কৌশল জানিবার জন্য আমাদের অভিলাষ জন্মে।' এই অভিলাষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ 'মানবদেহতত্ত্ব' প্রবন্ধ। রঙ্গলালের এই প্রবন্ধ তাঁর প্রতিনিয়ত বিক্ষণাগারে মানুষের দেহ পরীক্ষার ফলশ্রুতি। ডাক্তার হিসাবে 'মানবদেহ তত্ত্ব' সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আবশ্যক ছিল। এই আবশ্যকতা তিনি পুস্তকপাঠে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ময়ূরাক্ষী নদীতে শবদেহ অথবা বেওয়ারীশ মৃতদেহ মনা ডোম পার্ষচরের মারফৎ সংগ্রহ ক'রে স্বীয় ব্যবচ্ছেদাগারে ব্যবচ্ছেদ করে তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

"প্রকৃত কবি এবং কাব্যই বা কি? প্রকৃত কবি অনেকটা ঋজু প্রকৃতির লোক। তিনি মুগ্ধস্বভাব সম্পন্ন, বালকোচিত চপল, তাঁহার চিত্তের গাম্ভীর্য্য নাই; যাহা দেখিতেছেন, সকলি যেন অলৌকিক অসামান্য; যাহা ভাবিতেছেন, সকলি যেন কৌতুকাকুলিত। মন নাচিল, নিজেও একবার নাচিলেন; মন ভাবের উৎসে দুলিয়া উঠিল, নিজে ও দুলিতে লাগিলেন। কবির চক্ষে এ জগৎ নতুন, ইহার সকলি অদ্ভুত।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

শান্তিনিকেতন

রঙ্গলালের জন্ম : ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪এ আষাঢ় ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী থানার 'রাহুতা' গ্রামে। মৃত্যু ১৩১৬ সালের ১৭ই কার্তিক বীরভূম জেলার লাভপুর থানার লাঘোষা গ্রামে। লাঘোষা গ্রামটি ময়ূরাক্ষী নদীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। রঙ্গলালের প্রথম জীবন কেটেছে ২৪ পরগণা জেলাতে। পরে তাঁর বিচিত্র জীবন বীরভূম জেলাতে আসার পর সমাপ্ত হয়।

গত সাতের দশকে শ্রীসত্যজিৎ রায় চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশ্বকোষকার রঙ্গলালের জীবনচিত্র অনুসন্ধান করেছিলেন। একটি প্রবন্ধও পেয়েছিলেন। ২৪ পরগণার বঙ্গীয় শব্দকোষকার রচিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমান্তরালে রঙ্গলালের জীবন অনুসন্ধানের মূলে তাঁর এই প্রয়াস ব্যক্ত করেছিলেন আমার নিকট। একই জেলায় দুই কোষকারের আবির্ভাব তাঁর শিল্পী মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির কর্মকর্তা সিরাজুল হক সাহেবকে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার পরিচয় দিচ্ছি। সত্যজিৎবাবুর লব্ধ তথ্যগুলি বিশেষ মূল্যবান হবে :

রঙ্গলালের প্রকাশিত গ্রন্থ :

১। বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড/দ্বিতীয় খণ্ডের ৮০ পাতা

২। কাব্য : বৈরাগ্য বিপিন বিহার

৩। কাব্য : চিত্ত চৈতন্যোদয়

৪। জীবনী পুস্তক : হরিদাস

৫। বিজ্ঞান : বিজ্ঞানদর্শন

৬। উপন্যাস : শরৎ শশী

৭। নাটক : রাম বনবাস

৮। ভ্রমণকাহিনী : শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ

তৎকালীন যে সব পত্রপত্রিকায় তিনি লিখতেন

১। সোমপ্রকাশ

২। আর্য্যদর্শন

৩। কল্পদ্রুম

৪। এডুকেশন গেজেটের ১৮৮২ সালের নিয়মিত লেখক ছিলেন

৫। জন্মভূমি

বিষয়সূচী (অসমাপ্ত)

বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের ১ম সংস্করণের Title page ও ভূমিকা ২৪ পৃষ্ঠা
বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের ২য় সংস্করণের Title page ও ভূমিকা ২ পৃ.

বিশ্বকোষ/নামপত্র

বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃ. ত ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষতত্ত্ব এবং আর্য্যও অ।ার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক উদ্ভিদ,

রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

প্রথম খণ্ড

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর; বিশ্বকোষ প্রেসে

বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

উপক্রমণিকা। এই পুস্তকে পানিনি প্রভৃতির যে সকল প্রত্যায়াদি গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা নিদর্শন ১-২৪ পৃষ্ঠা।...

১৩০১ সালের পরে বিশ্বকোষের ভোরের কোকিল শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ১৩৪২ সালে নবকলেবরে নতুন বিশ্বকোষের আবির্ভাব ঘটলো সঙ্কলন শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গভাষায় বিশ্ববিশ্রুত বৃহদভিধান

বিশ্বকোষ/নামপত্র

ENCYCLOPAEDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত, সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম ভাগ

প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ সংখ্যা

[অ-অদ্বৈধ]

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, তত্ত্বচিন্তামণি শব্দ রত্নাকর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও

৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার—বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন দ্বারা মুদ্রিত ১৩৪২

প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥৹ আনা প্রতি ভাগের মূল্য ১২॥৹

এই সংস্করণের 'বক্তব্য' অংশে সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ১ম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা ৫১ বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অনুজ খ্যাতনামা বহুদর্শী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রাম হইতে ১২৯১ সালে ১ম সংস্করণের ১ম সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং ১২৯৩ সালে উভয়ের যত্নে প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—১ম সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল।—বলা বাহুল্য এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে জ্ঞানরাজ্যের পরিধি অভাবনীয়রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে নব নব গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অসাধারণ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই নব নব আবিষ্কার ও জ্ঞানসাধনার ফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই ২য় সংস্করণের আয়োজন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনার জন্য প্রথম সংস্করণের [আমরা দেখি নাই ?] অধিকাংশ শব্দ আমূল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর আরও বাড়িয়া যাইতেছে ; তাহা উভয় সংস্করণ মিলাইলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।*

১২৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের ২য় ভাগ হইতে সঙ্কলনভার আমার উপর ন্যস্ত হয় এবং ভগবাদিচ্ছায় ১৩১৮ সালে ২২শ ভাগে এই সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়।...

এখানে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও স্বনামধন্য ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল বিশেষ বিশেষ শব্দ লিখিয়াছেন, তাহা অবিকল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
৮ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা সম্পাদক
২০এ শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল

এ ছাড়া, বৈয়াকরণ, কবি, জীবনীকার, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার এবং ডাক্তার রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গবেষণার বিষয়। এই বিষয়ে এখনই লেখা যাচ্ছে না। সে আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি কেউ পারেন তাঁকে অনুরোধ জানানো রইল।

রঙ্গলাল সম্পর্কে চন্দ্রভাগায় (৭ই অক্টোবর ১৯৮৮) প্রকাশিত একটি সংবাদ দেখলুম। গত ৫ই অক্টোবর বাসনগর হাইস্কুলে একটি সভায় বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সম্পন্ন ১৪৭তম স্মরণসভার আনুপূর্বিক প্রস্তুতি বিষয়ক বক্তব্য রাখেন রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীসিরাজুল হক। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসাধক রঙ্গলালের বিচিত্র জীবন কাহিনী শুনে সকলে বিস্ময়াভিভূত হন এবং তাঁর অনুষ্ঠানটিকে সফল করবার সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

অনুসন্ধান সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। কেননা উৎসাহী ছাত্রকে নির্দেশ দিয়ে ডাঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করার একটি ভাষা গবেষণাপত্র তৈরি হতে পারে এবং তাকে Ph.D ডিগ্রি স্বচ্ছন্দে দেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যসাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মানব সংসারে স্মরণের যেমন একটি স্থান আছে বিস্মরণেরও তেমনি। বস্তুত সংসার এক আনাকে স্মরণ রাখে, বাকি পনেরো আনাই বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। যতই অনভিপ্রেত হোক এটাই কঠিন বাস্তবের চেহারা। একে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু উত্তরসূরীর কৃত্যও থাকে কিছু। বিস্মরণের ধূলিজাল থেকে মূল্যবান অতীতকে উদ্ধার করা, সর্বজন সমক্ষে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এরও প্রয়োজন আছে।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যজগতের একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। অথচ খুব একটা প্রাচীন নাম নয়, অদূর অতীতেই তাঁর অবস্থান। সাহিত্য সাধনার সারস্বত চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাঁর সঞ্চরণ ছিল। সেই নানামুখী প্রয়াস এবং তার সার্থকতার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু তাঁর কিছু গ্রন্থের সঙ্গে আমি পরিচিত।

রঙ্গলাল বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ লিখেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর মনের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক আশ্চর্য উৎসুক ও জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী ছিলেন রঙ্গলাল। তাঁর সজীবমন স্বতই নানামুখী চিন্তায় ব্যাপৃত হয়েছে। সমকালীন ভাষা ও সাহিত্যের নানা সমস্যা সম্বন্ধে তিনি শুধু সচেতন ছিলেন না তার সমাধানকল্পে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু শুধু মনের সজীবতা বা সক্রিয়তাই এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে না। অন্য মূলধনও প্রয়োজন, যার নাম অধীতবিদ্যা বা পাণ্ডিত্য। আর তারই সঙ্গে প্রয়োজন মেধার। রঙ্গলালের ক্ষেত্রে এ দুটির উপস্থিতিই স্মরণযোগ্য। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য জগতের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন প্রসূত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। ফলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা প্রায় সর্বত্রই ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে বৃহৎ বৃত্তে সংস্থাপিত হয়েছে। বঙ্গেতর সাহিত্যের আলো হাওয়া অবাধ প্রবেশ লাভ করেছে তাঁর রচনায়।

আমরা তাঁকে ভাষা বিজ্ঞানী না বললেও তাঁর ভাষাচিন্তার জগৎটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলায়, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য একাধিক ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দের ব্যুৎপত্তি, অভিধা প্রভৃতি নিয়ে তাঁর সজাগমন সততই সক্রিয় থেকেছে দেখা

যায়। তঁার সিদ্ধান্তগুলি যে সকলের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে এমন নয়, কিন্তু তা যে ভাবনা উদ্রেককারী, উদ্দীপক এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের সাহিত্যিক মহলে ভাষা সম্বন্ধে চিন্তায় খুব বেশি আগ্রহী দেখা যায় না, যদিও ভাষাই সাহিত্যের অবলম্বন বা ভিত্তি। রঙ্গলাল সেই মুষ্টিমেয় অধ্যবসায়ীদের একজন যাঁরা ভাষার জগৎ নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে ও অন্যকে ভাবিত করতে উৎসুক। এ প্রসঙ্গে লেখকের 'ভাষার নমনীয়তা' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলে আমার মনে হয়।

রঙ্গলাল যদিও ভাবুক এবং সাহিত্যিক তথাপি তাঁর মনের গঠনটির একটি অন্য স্বাতন্ত্র্যছিল। সেই স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চেতনা। নিছকভাবের বাষ্পে আচ্ছন্ন থাকায় তাঁর তৃপ্তি নেই। স্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে, বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে তিনি বিচার, বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষায় উৎসাহী। এক্ষেত্রে তাঁর রচনার অন্য সম্পদ হ'ল নিরুদবেগ প্রকাশভঙ্গি। এখন আমাদের পাঠ্য বিষয় কি ?' প্রবন্ধটিকে এক্ষেত্রে তাঁর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাবলে গ্রহণ করতে চাই। শুধু এপ্রবন্ধে নয়। অন্যত্রও তিনি বিশ্বজীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে তুলনামূলক আলোচনা ও সমীক্ষার সাহায্যে আমাদের জীবন ও সাহিত্যের অপূর্ণতাকে লক্ষ্য, বিচার ও উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত এই দৃষ্টি বাঙালী লেখকের মধ্যে খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বার বার বাংলা সাহিত্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একটি বিষয়ে যে শুধু ভাবরসের জগৎটাই সাহিত্যের একমাত্র জগৎ নয়। এর অপরিহার্য অনুপূরক হ'ল চিন্তাসমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ রচনা। শুধু আবেগ নয় চাই মনন-সমৃদ্ধ সৃষ্টি। রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধে এই চিন্তা ও মননকে অতি মূল্যবান উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের সাহিত্যের একমুখী অতিরেকের দিকে লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে আপন সাধ্যমত এ বিষয়ে সাহিত্য কর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধ এ উদ্দেশ্যই নিয়োজিত। এই মানসিকতা, চেষ্টা ও নিষ্ঠাকে আমি একান্ত ভাবে অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করি।

রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় সাধক। তাঁর রচনার পুনঃপ্রকাশ ও নবযুগের পাঠকের সামনে উপস্থাপন যেমন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি উপায় তেমনি অন্য এবং গুরুত্বপুর্ণ আর একটি উপায় তঁার পন্থানুসরণ ও অনুগামিতা। সেই দিকে সাহিত্য অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সাহিত্য সাধক রঙ্গলালের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করি।

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণোৎসবের তাৎপর্য

সুভাষ মহান্তি

বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম সমসাময়িক একজন সাহিত্য সাধক। "ডমরু-চরিত" ও "কঙ্কাবতী" খ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ রঙ্গলাল সীমাহীন দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাঁর বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁকে দাসত্বের প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। বরং দারিদ্র্য তাঁকে মহান করে তুলেছিল। কারণ ছেলেবেলা থেকেই পৃথিবীর পথে হাঁটতে হাঁটতে পৃথিবীর পাঠশালায় তিনি জীবন সম্পর্কে এক অমূল্য শিক্ষালাভ ক'রেছিলেন, বুঝেছিলেন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত কিছুই সুন্দর ও পবিত্র। এই শিক্ষাই তাঁকে এক বিচিত্রকর্মা আত্মপ্রচার বিমুখ দয়াসিন্ধু মহাযোগী করে তুলেছিল। এই শিক্ষার জন্যই তিনি এই মর পৃথিবীতে অমর পথের যাত্রী হয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীর হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করতে। তাই দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থেকে তিনি একাধারে হয়ে উঠেছিলেন 'আদর্শ' শিক্ষক, ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক ও বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য সাধক। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁর তিরোধানের আশি বৎসর পরেও বঙ্গ সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাঁর যথাযোগ্য আসন আজও উপেক্ষিত হয়ে আছে। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য আলোচনাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্যাবধি হয় নি। অথচ তিনি সেকালের "সোমপ্রকাশ", "কল্পদ্রুম", "জন্মভূমি", "আর্যাদর্শন", "এডুকেশন গেজেট" ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে তাঁর এ সকল লেখা প্রকাশিত হয়েছে ঐসব পত্রিকায়। আমি নিজে ঐ সকল লেখার কিছু কিছু যান্ত্রিক অনুলিপি স্বচক্ষে দেখেছি। ঐ লেখা-গুলিতে সাহিত্য সাধক রঙ্গলালের বিচিত্র প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর লেখা "এ্যানাটমি", "অদ্ভুত কাব্য জগৎ", "প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি", "শত-বর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ" ইত্যাদি প্রবন্ধে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় নিশ্চিত রূপেই ধরা পড়েছে।

উক্ত লেখাগুলি উল্লেখিত মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ দেখে আমার মনে একটি বিশেষ

চিন্তা উঁকি দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে যে, বোধহয় একালের মতো সেকালেও সাহিত্য রাজ্যে বিশেষ কোন পত্রিকা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজের কোলে একদল সাহিত্যিকদের টেনে এনে পাদপ্রদীপের তলায় উজ্জ্বল করে তুলত। প্রতিভার বিচার সেখানে গৌণ ছিল তাই যথার্থ প্রতিভাধর হয়েও শুধুমাত্র ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার জন্যই অনেক যথার্থ প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও উত্তরকালের সাহিত্য প্রেমীদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছেন। একথা সকলে-ই জানেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের একদল শিষ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনায়াসে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমমতাবলম্বী লেখকদের-ই তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এভাবেই গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ সাহিত্য গোষ্ঠী, এই গোষ্ঠী বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এতে প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীতে যুক্ত হন নি, হলে তাঁর লেখা নিশ্চয়ই "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ পেত।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাঘোষা গ্রামে বসবাস ক'রে রঙ্গলাল বঙ্গভাষায় বিশ্বকোষের মত গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এ থেকেই তাঁর মনীষার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে অথচ তিনি কেন বঙ্গদর্শনে লিখলেন না অথবা তার লেখা কেন বঙ্গদর্শনে ছাপা হল না তা আমাদের ভাবায়। আমার মনে হয়, একালের মত সেকালেও কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিক ভাগ্যবিধাতারা গ্রামের সাহিত্য সাধকদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হতেন। তাছাড়া গ্রামের ঐ সাহিত্য সাধক যদি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিভার অধিকারী হতেন তবে একালের মত সেকালেও কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিক কর্তা ব্যক্তিরা তাঁকে সহযোগিতা করা অপেক্ষা অসহযোগিতা করে ডোবাতেই বেশী ভালবাসতেন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের অপ্রচারিত থেকে যাওয়ার মূলে উক্ত দুটি কারণই সমান কাজ করেছিল বলে আমাদের মনে হয়। এরকম মনে হওয়ার কারণ এই যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ছিল মূলতঃ হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের মন্ত্রবাহী একটি পত্রিকা। স্বভাবতঃই মুক্তমনা বিশ্বকোষ প্রণেতা রঙ্গলালের কার্যাবলী ও রচনাবলী তাঁদের অপছন্দ ছিল। যাঁর মন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব প্রজাতির প্রগতির চিন্তায় মগ্ন ছিল, যিনি সামাজিক অহঙ্কার ও সংস্কারকে পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণ

সন্তান হয়েও অন্ত্যজ মালপাড়ায় বাড়ী করে আপামর জনসাধারণের চিকিৎসার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষীর গর্ভ থেকে মৃত দেহ তুলে এনে শব ব্যবচ্ছেদের দ্বারা মানব দেহ বিদ্যা অধ্যয়ন করে মানব মনের মত মানব দেহকেও সুস্থ করে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন, তাকে আর যাইহোক বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর পক্ষে যে সহ্য করা অসম্ভব ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। সেকালের প্রচলিত হিন্দুরীতিকে অগ্রাহ্য করে তিনি যে নিজের দেহকে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য স্বহস্তে সমাধি লিপি লিখে গেছিলেন—এ থেকে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়টি নিশ্চিতভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই সংস্কারমুক্ত মনের মননময় লেখা যে বঙ্গদর্শনে ছাপা হবে না তাতে আর আশ্চর্য কী? তাই বোধহয় তিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচারিত পত্রিকা "সোম প্রকাশ" ও "কল্পদ্রুম" ইত্যাদিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে তাঁর ঐ সকল লেখাগুলি সম্পূর্ণভাবেই গতানুগতিকতা বর্জিত ও একান্ত-ভাবেই বাস্তব সচেতন। সুতরাং তাঁর লেখা প্রচার করার অপরিসীম এক সামাজিক গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি। কারণ মানব প্রজাতির প্রগতি-ধারায় এই ক্রান্তদর্শী মানব প্রেমিকের অবদান আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। একজন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত চিকিৎসক, শিক্ষক ও সাহিত্যসাধকরূপে রঙ্গলালের প্রভাব এখনো প্রবাদরূপে লাঘোষা গ্রাম অঞ্চলে জীবন্ত। আমাদের মানব অস্তিত্ব যে কোটি কোটি জীবিত ও মৃত মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল—এই সত্য বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েই রঙ্গলাল কর্মক্ষেত্ররূপে অবহেলিত গ্রামাঞ্চলকেই বেছে নিয়েছিলেন। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বসবাস করতেই তিনি ভালবাসতেন, তাদের অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিলিয়েই গ্রামের নিরালা কোনে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অপূর্ব সাহিত্যসম্ভার। তাঁর "চিত্ত চৈতন্যোদয়" "বৈরাগ্য-বিপিন বিহার" ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি গ্রামে বসেই রচনা করেছেন।

লেখাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল লেখার উদ্দেশ্য। কেন তিনি লিখতেন? কাদের জন্য লিখতেন, নিশ্চয়ই সুলভ কবিযশ প্রার্থনার জন্য নয়। তিনি লিখতেন কারণ না লিখে তিনি পারতেন না। যে মন নিয়ে তিনি শবব্যবচ্ছেদ করতেন, সেই দরদী মন নিয়েই লিখেছিলেন "এ্যানাটমি।" রঙ্গলাল জীবকে ভাল-বেসেই জীবনের জন্যই লিখতেন। তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসের "রংলাল ডাক্তার শুধু মানব দেহের চিকিৎসা করেই খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু সেটাই রঙ্গলালের সব পরিচয় নয়। তিনি জীবনের জন্য সামাজিক অহংকার

ও সংস্কারশাসিত 'রুগ্ন' মনের চিকিৎসা করতেই সাহিত্য সাধনা করেছিলেন— এখানেও তিনি ডাক্তার তবে দেহের নয় মনের। আমাদের দেশে দৈহিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা হয়, মানসিক মৃত্যুর তো পরিসংখ্যান রাখা হয় না। রাখলে দেখা যেতো নিরোগ দেহের জন্য যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন নিরোগ মনের জন্য তেমনি চিকিৎসার প্রয়োজন। রঙ্গলাল সাহিত্য সাধনায় এই ব্রতই উদ্যাপন করেছিলেন। তাই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৭ তম জন্মজয়ন্তী মূলক স্মৃতি উৎসব পালনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠুক রঙ্গলালের অহঙ্কার ও সংস্কার মুক্ত চিন্তার প্রচার। এই প্রচারে সমস্ত মানুষের শ্রম সময় ও অর্থের অবাধ আদান প্রদানের পথ প্রশস্ত হোক, রঙ্গলাল স্মরনোৎসব যথার্থ শুভ উৎসব ও আন্তরিক উৎসব হয়ে উঠুক, এই আন্তরিক কামনা করে রঙ্গলালের অমর আত্মার প্রতি জানাই আমার বিনম্র প্রণতি।

"পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাগ্রে সভ্যতাদ্বারীতে পদার্পন করেন·········ভারতে কি না হইয়াছিল? অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের তুলনা? অন্য দেশের বনে হিংস্র পশু জন্মে; ভারতের তেমন বন নয়। জান না?—এ বন রত্ন প্রসব করিয়াছে। এই বেদ এই স্মৃতি এই বনের ধন; কাব্য নাটক এই বনে, অঙ্কশাস্ত্র ও জোতির্বিদ্যা এই বনে হইয়াছিল। ভারতের সঙ্গে কার তুলনা?··· জিজ্ঞাসা কর কিনিক্ আরব মিশর কি বলে।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃতির অতলে

সৌমেন অধিকারী, শান্তিনিকেতন

ময়ূরাক্ষী তীরে লাঘোষা গাঁয়ের এক নির্জন কোনে আশি বছর আগে তিনি মাটির নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন। রঙ্গলাল ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়লেন। গাঁয়ের লোকেরা জানে সেটা। বোধহয় আর বিশেষ কেউ না।

তারপর আশি বছর পরে তাঁকে কবর থেকে টেনে তুললেন রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সিরাজুল হক সাহেব। টেনে তুলে হকসাহেব নিজেই দেখলেন যে ময়ূরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়। স্মৃতি সভা করতে হবে, স্মরণিকা প্রকাশ করতে হবে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেখা গেল, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে এখনকার বাঘা বাঘা এ্যাকাডেমিক পণ্ডিতেরা কিছুই জানেন না, বাংলা সাহিত্যের গবেষককেরা বিশেষ কিছু খবর রাখেন না, ইস্কুল কলেজ-এর মাষ্টাররা তাঁর নামই জানেন না। বিশ্বকোষ প্রবর্তক, বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচয়িতা রঙ্গলালের কোনো বইপত্রও অধিকাংশ বড় বড় গ্রন্থাগারেই নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে বা সাহিত্যসাধকচরিতমালাতেও তিনি উল্লেখিত নন। ব্যাপার কি? আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে অবাক হচ্ছি। তবু রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতি তাঁদের কর্মসূচি নিয়ে এগুচ্ছেন, জুতোর শুকতলা অর্থ সংগ্রহ ও লেখা সংগ্রহের কাজে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

রঙ্গলাল শুধুমাত্র বিশ্বকোষ প্রবর্তক বা সাহিত্য স্রষ্টাই ছিলেন না। তিনি ডাক্তারও ছিলেন। একশো সতেরো বছর আগে তারাপীঠ-কংকালী-বক্রেশ্বরে যখন কারণসাগরে ডুবে ভৈরবীচক্রের সাধন চলছে? জয়দেব কেন্দুলীতে মানুষ যখন 'রতিসুখসারে' রমণীরমণ সাধনায় বিহ্বল, রাঢ়ের গাঁয়ে গাঁয়ে যখন হাতুড়ে, তুকতাক, ওঝাদেয়াসির, দৈবজ্ঞের অবাধ রাজত্বে মানুষ শান্তি খুঁজছে,—ঠিক সেই সময় রঙ্গলাল ডাক্তার ময়ূরাক্ষী নদী থেকে বেওয়ারিশ মরা যোগাড় করে ব্যবচ্ছেদ করে দেখছেন ইড়া পিঙ্গলা প্লিহা, পাকস্থলি, জরায়ু, মূত্রনালী,—গভীর নিষ্ঠায় কেটে কেটে দেখছেন তাদের গঠন, প্রকৃতি, কাজ। বাইরে পাহারা থাকছে তাঁর বিশ্বস্ত ডোম ভৃত্য। সেই যুগে, সেই সামাজিক পরিবেশে বিজ্ঞান মনস্ক রঙ্গলালের এই ধ্যানীরূপ ভাববার মত, অনুভব করার মত ঘটনা।

লজ্জার মাথা খেয়ে আমিও স্বীকার করছি, রঙ্গলাল সম্বন্ধে আমিও কিছুই জানিনে। তবে জানবার প্রতিজ্ঞা করেছি। তাই শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অভিনন্দন জানাছি রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতিকে।

পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের সেই দিনটি

কল্যাণী রাণো

গত ১৬ই জুলাই '৮৮, শনিবার, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ়, ক'জন অটল প্রতিজ্ঞ ভাব পাগলের জন্যে প্রকৃতিদেবীকেও বোধকরি একটু থমকে যেতে হয়েছিল —কারণ একটানা কয়েকদিনের মেঘমেদুর এবং বর্ষণমুখর আকাশ সেদিন কিন্তু সকাল থেকেই ছিল প্রসন্ন আলোক-উদ্ভাসে উজ্জ্বল।

সেদিনের প্রাতের নির্মল আলোকে স্নাত হয়ে একদল পদযাত্রী শোভাযাত্রা করে চলেছেন আজকের সারস্বত-সমাজ উপেক্ষিত বঙ্গের এক বিস্ময়কর প্রতিভাধিকারী সন্তানের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁরই আবির্ভাব দিবসে সশ্রদ্ধে মাল্যার্পণ করতে। যাত্রাপথটি শুধু দীর্ঘই নয় দুরধিগম্যও।

খ্যাতকীর্তি কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা লাভপুর গ্রামের সুসজ্জিত অঙ্গন থেকে ছ' মাইল দূরবর্তী ময়ূরাক্ষী নদীর উপকণ্ঠের লাঘোষা গ্রামের ছন্দহীন প্রাঙ্গন অবধি অধিগমন করতে হবে যাত্রীদের। ওঁদের সহগামিনী হওয়ার জন্যে সাগ্রহে এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রতীক্ষা করেছিলাম—স্ববাস ভালাষ গ্রামে। একসময় সামিল হয়েও গেলাম পরম আনন্দের সঙ্গে।

বিশ্বকোষ প্রবর্তক কাব্যরত্নাকর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়-চিকিৎসা জগতের এক প্রবাদ পুরুষ-একশ সাতচল্লিশ বছর আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন দক্ষিণ বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার রাহুতা গ্রামে। অশান্ত জীবন চক্র, বিচিত্র জীবন দর্শন অদ্বিতীয় তপোশ্চর্য্যা অবশেষে নিঃশব্দে শেষ শয্যা বরণ বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী পলি বিধৌত এক অখ্যাত গ্রাম-লাঘোষায়।

সেই রঙ্গলালের তর্পণেই চলেছি আমরা। কাদামাখা পিছল মেঠো পথ-জলস্ফীত খাল কান্দর পেরিয়ে চোরা কাঁটায় কণ্টকিত সিক্ত বসনে-স্খলিত পদ বিক্ষেপে।

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও যে লাঘোষা গ্রামের অস্তিত্বটি ভারতের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবেনা—সেই গ্রামেই আমরা চলেছি হিমালয় প্রমাণ-গৌরব বুকে বয়ে নিয়ে। পিছনে পড়ে রইল আলেপুর, কামতপুর, শাসপুর গ্রামের মৃন্ময় কুটির আর ছায়াছন্ন তরুদল-গ্রামের সরল প্রাণ মানুষগুলির মুগ্ধ বিমোহিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির শিকার হয়ে আমরা কণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছি চরৈবেতির মন্ত্র।

ক্লেশ যে সুখের চেয়েও সুন্দর হতে পারে—জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তে তা উপলব্ধি করেছি সেদিন। মনীষী বলেছেন—"God helps them who help themselves"—এই আপ্ত বাক্য মিথ্যা হবার নয়।

অবশেষে পাওয়া গেল সেই মহাযোগীর শেষ শয্যাটিকে। যিনি আজীবন এই চিন্তায় ছিলেন আত্মমগ্ন—"Morality is the base ; Sadhana is the means and life divine is the goal.

সাগ্রহে এবং সানন্দেই ওখানকার বেশ কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এগিয়ে এলেন।

শঙ্খধ্বনিসহ চন্দনের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হল সমাধিগাত্রে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যথা লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর যাদবলাল উচ্চবিদ্যালয়, সত্যনারায়ণ শিক্ষানিকেতন, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, বীরভূমের অন্যতম সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা 'দিদি-ভাই,' বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি, ভালাষ মহিলা সমিতি, লাঘোষা গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ, বাউল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বীরভূমের খ্যাতনামা বাউল কার্তিকচন্দ্র দাস—একে একে পরম ভক্তি ভরে মাল্য অর্পণ করলেন সমাধিতে। নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আনন্দে তৃপ্তিতে দেহমন ভরে উঠ্‌ল। সাধনব্রত মহাযোগীর পবিত্র সমাধি সন্নিধান হয়ে আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম ; সেই মুহূর্তে আমাদের একটা আলোকচিত্র গৃহীত হল—আজিকার এই পুণ্যলগ্নটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখতে। সহযাত্রীদের সঙ্গে ঐক্যমত হলাম, সাধনা ও সৎকর্ম কখনও বিফল হয় না ; একদিন না একদিন তার মূল্যায়ন হবেই। চিরপ্রণম্য সারস্বত মহাজনের প্রতি আজকের এই শ্রদ্ধানিবেদনের পুণ্যক্ষণটি তার জলন্ত প্রমাণ।

এই অনুষ্ঠানের পর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। সেখানে স্মরণোৎসব-অনুষ্ঠানের বিপুল ব্যয়বহুল ও শ্রমসাপেক্ষ একটি মহতী পরিকল্পনার ভারে বিব্রতাবস্থ রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রী সিরাজুল হক মহাশয়ের সহজ সরল মন ও অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে অভিব্যক্ত হল বিশ্বকোষ প্রবর্তককে প্রতিটি জনমনে শ্রদ্ধার আসন পেতে দেওয়ার স্বপ্ন, যে স্বপ্ন হবে শীঘ্রই সার্থক, এবং তার বাস্তবরূপ পরিগ্রহ সর্বজনের কাছেই হবে কল্যাণকর। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, যা যে মেঠো পথ আজ চলাচলের পক্ষে দুরধিগম্য সে রাস্তা অদূর ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে পাকা এবং 'রঙ্গলাল সরণী' নামাঙ্কিত হয়ে বিরাজ করবে কাল থেকে কালান্তরে আর সেই রাস্তা বেয়ে আসবেন শ্রদ্ধাবণতচিত্তে

দেশ বিদেশের কত কবি সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণী—এমনকি মহানগরী থেকেও যে একদিন আসবেন না তা বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সাধক, বিচিত্রকর্মা ভারতীয় সমাজ বিশেষের অঙ্গীভূত হয়ে-ও এক বিরল দৃষ্টান্ত সমাধি তাঁরা দেখতে আসবেন না? আসবেন। ২৪শে আষাঢ়ের এই দিনটিতে মাল্য অর্পণ করতে, প্রণতিজ্ঞাপন করতে। এই আশা শুধু সম্পাদক মহাশয়ের নয়, আমাদেরও।

অতঃপর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের অনন্য সাধরণ কীর্তিস্থল—যে ঘরে তিনি অন্ধকার রাতে সংগৃহীত মানুষের লাশ কেটে কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, শারীর শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতেন, মানুষ শুনে, জানতে পেরে বিস্ময়ে, কৌতুহলে নির্বাক হয়ে যেত; সেই স্থানটি দেখলাম। বর্তমানে সে গৃহটি নেই। কবে ধ্বংস হয়ে ভিটেতে পরিণত হয়ে গেছে আর সেই ভিটেটিতে নানা আগাছা আর খানখন্দ। যেখানে একদিন এ্যানাটমি নিয়ে রঙলাল ডাক্তারের গবেষণা কর্ম হয়েছে তার আজ এই রূপান্তরের মর্মবাণী কে অনুভব করবে!

শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যকৃতি ও অস্বাভাবিক মানব হিতৈষণার কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেয়েই সেই মহাযোগীকে প্রত্যক্ষ দর্শন না করেই যদি তাঁর সঙ্গে আমাদের এক আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় তা হলে তাঁর সান্নিধ্য লাভ কতনা আনন্দদায়ক হত—তাই ভাবি! জানিনা তাঁর বহিরাবরণের অন্তরালে ছিল কোমলতা—না কাঠিন্য, ছিলেন স্বল্পভাষী না গম্ভীর প্রকৃতি, না ভিতরে বাহিরেঅপরূপ। হায়! সেই সমকালের রঙ্গলাল প্রত্যক্ষদর্শীর যদি একজন কারুর দেখা সাক্ষাৎ মিলত তাহলে অনন্ত জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সকল কৌতুহল চরিতার্থ করতে পারতাম! বলতাম, এমন মানুষের আবির্ভাব মানুষের ইতিহাসে এক স্বর্ণস্বাক্ষর! যার নজীর নাই ভূ-ভারতে!

সবশেষে ফিরে এলাম আবার সেই সমাধি মূলে। ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হল। মনে মনে শপথ করলাম বঙ্গসাহিত্যকে যিনি আজীবন সুসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন তাঁর সেই অতুল অবদানের যথার্থ মূল্য আমরা দেব; তাঁর কাব্যকৃতি অনাবিষ্কৃত, অমূল্যায়িত থাকতে দেবনা। প্রবন্ধকৃতি পুরনো ধারণায় পর্যবসিত হতে দেব না। বিশ্বকোষের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেব, তাঁর কষ্টার্জিত শ্রম ও সাধনার যথার্থ মূল্য দেব তাঁকে অনাদরে অবহেলায় আর হারাবো না। প্রথিতযশার যশগীতি গেয়ে চলব দুয়ারে দুয়ারে।

বিচিত্র মানুষ—রঙ্গলাল জীবনে ও সাহিত্যকর্মে

অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক
সভাপতি : বীরভূম সাহিত্য পরিষদ

যাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না, যিনি ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের মন থেকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছেন—হঠাৎ তাঁর সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য পেলে একপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়। আজ বিগত যুগের এক মনীষী, বীরভূমের এক বরেণ্য পুরুষ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুচার কথা লিখতে গিয়ে সেই রকম একটি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। রঙ্গলাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত ছিল সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বীরভূম বিবরণের বর্ণনার মধ্যে। রঙ্গলালের রচিত কোন সাহিত্য কর্মের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না। কিছুকাল পূর্বে রঙ্গলালের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল দুটি সাক্ষাৎকারে। একটি সাক্ষাৎকার বীরভূমের দাঁড়কার রায় পরিবারের এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক জলধিকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার দাঁড়কার রায় পরিবারের অপর এক ভদ্রলোক হেতমপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ রায়ের বৃদ্ধা মাতা সুরবালা দেবীর সঙ্গে। এঁরা দুজনেই তাঁদের বাল্যকালে তাঁদের অঞ্চলের সুবিখ্যাত চিকিৎসক রঙ্গলাল ডাক্তার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই আজ পরলোকগত—সুতরাং এই প্রবন্ধ লিখতে বসে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কিন্তু উপরি লিখিত কেউ রঙ্গলালের সাহিত্য জীবনের কোন পরিচয় দিতে পারেন নি। সম্প্রতি রঙ্গলাল স্মৃতিরক্ষা কমিটির সুযোগ্য সম্পাদক অক্লান্ত কর্মী বন্ধুবর সিরাজুল হক সাহেব বহু পরিশ্রমে রঙ্গলালের রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন। তিনি চারিটি প্রবন্ধ আমায় দিয়েছেন ব্যবহার করবার জন্য। রঙ্গলালের জীবনের গল্প শুনে আর তাঁর রচনা পড়ে আমার মনে হয়েছে—এক বিচিত্র মানুষ ছিলেন এই রঙ্গলাল—কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, কি তাঁর সাহিত্য কর্মে। তাঁর এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে।

রঙ্গলালকে বিচিত্র মানুষ বলার কারণ, তিনি বাংলা ১২৭৩ সালে বীরভূমের দাঁড়কায় আসেন তেইশ বৎসর বয়সে। কিন্তু এই তেইশ বৎসরেই ঘটেছিল তাঁর

জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ছোট বয়সে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যালাভ, কিছুকাল জন্মস্থান স্বগ্রাম ২৪ পরগণার রাহুতা ইংরাজি বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষা, কিছুকাল পুরুলিয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ, বিদ্যালয় ত্যাগ—প্রভৃতি তাঁর প্রথম জীবনের কথা স্মরণ করলে আমাদের মনে জেগে ওঠে এক বিচিত্র, খাম-খেয়ালী যুবকের চিত্র। বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও কিন্তু তিনি পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। কারণ মধ্যে বালুটি চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। তিনি আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া জ্বরে। কিন্তু চিকিৎসা করাতে করাতে তিনি নিজেই চিকিৎসাশাস্ত্রে কৌতুহলী হলেন এবং এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন ইছাপুর স্কুলে পণ্ডিতের কাজ করে আবার কলিকাতায় টাকশালে কিছুকাল কার্য করেন। কিন্তু বার বার ম্যালেরিয়া রোগে পর্যুদস্ত হয়ে তিনি পশ্চিমে গাজিপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান। সেখানে আবার একদিকে পুলিশের কেরাণীগিরির কাজ করেন, অন্যদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে দাঁড়কায় আগমনের পূর্বে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন বিচিত্র মানুষ রঙ্গলাল।

দাঁড়কার জলধিবাবু যখন বালক, রঙ্গলাল তখন বৃদ্ধ। জলধিবাবু সে যুগের বৃদ্ধদের মুখে যে গল্প শুনেছেন, সেই গল্প শুনিয়েছেন আমাকে। রঙ্গলাল শিক্ষকতা নিয়ে যখন দাঁড়কায় আসেন তখন তাঁর সন্ন্যাসীর বেশ, পরিধানে গেরুয়া কাপড, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে দাড়ি। তিনি না, সকাল সন্ধ্যায় একা একা ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে তাঁকে ঘিরে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ বলতেন তিনি শ্মশানে রাত্রে শব সাধনা করেন, কেউ বলতেন হিমালয়ের গুরুর কাছে তিনি সিদ্ধিলাভ করে এসেছেন দাঁড়কায় গুরুর আদেশে।

পরবর্তী কালে রঙ্গলাল শিক্ষকতা ছেড়ে পুরোপুরি চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করেন। আমি যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি তাঁরা রঙ্গলালকে 'রঙলাল ডাক্তার' হিসাবেই দেখেছেন। সমস্ত ব্যাপারে তাঁর ছিল অসীম কৌতূহল। দাঁড়কা থেকে খানিকটা দূরে লাঘোষা গ্রামে রঙ্গলাল চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলেন। শোনা যায় তাঁর গৃহে একটি কাঁচের ঘর ছিল। তাঁর এক অতি-বিশ্বস্ত ডোমজাতীয় অনুচর ময়ূরাক্ষীর তীরে শ্মশানভূমি থেকে অপঘাতে মৃত ব্যক্তির অথবা বেওয়ারীশ মৃতদেহ নিয়ে আসত, আর রঙ্গলাল সেই কাঁচের ঘরে

বসে 'এনাটমি' বই খুলে শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। গ্রামের লোকেরা ভাবত তিনি শব-সাধনা করেন। এমনি অসীম কৌতুহল ছিল রঙ্গলালের। এলোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ মিলিয়ে এক মিশ্র চিকিৎসায় রঙ্গলাল সিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আয়ুর্বেদ মতে নাড়ীজ্ঞান ও এলোপ্যাথ মতে শারীর বিদ্যা আয়ত্ব করে তিনি চিকিৎসক হিসাবে এক কিংবদন্তীপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন যার পরিচয় মেলে তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে দাঁড়কার জলধিবাবু এবং সুরবালা দেবী দুজনেই রঙলাল ডাক্তারকে দেখেছেন পাল্কী চড়ে রুগীর বাড়ী যেতে। তাঁদের বিবরণ মতে রঙলাল ডাক্তার রুগীর বাড়িতে গেলেই রুগীর অর্ধেক কষ্ট কমে যেত। তাঁর হাসি খুশী ভাব, সরল হাস্যোচ্ছ্বল কথাবার্তা রুগীর রোগ কমিয়ে দিত। যে বাড়িতে রঙলাল ডাক্তার রুগি দেখতে আসতেন, সে বাড়িতে যেন উৎসব শুরু হয়ে যেত। তাঁর অভ্রান্ত নাড়ীজ্ঞান, চোখে দেখে রোগ নির্ণয় নির্ভুল ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য তিনি ঐ অঞ্চলের লোকের কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

এমনি বিচিত্র মানুষ রঙ্গলাল, এমনি বিচিত্র তাঁর জীবন। জীবন শুরু করলেন শিক্ষকতা দিয়ে, মাঝে হলেন টাকশালের কর্মী, তারপর সাজলেন সন্ন্যাসী, শেষে হলেন সুদক্ষ চিকিৎসক। কিন্তু না—তাঁর জীবনের একটি মস্ত বড় দিকের উল্লেখ বাকী আছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি করেছেন সাহিত্য সাধনা, শুরু করেছিলেন "বিশ্বকোষ" সঙ্কলনের মত একটি বিরাট কাজ।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত হাস্যরসিক সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ। কৌতুকরস সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। রঙ্গলালের মধ্যেও শিক্ষকতা বা চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়াও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় স্পষ্ট। দাঁড়কায় তিনি ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'এই ধর্মসভায় গীত হওয়ার জন্য তিনি অনেকগুলি গানও রচনা করেন। 'শরৎশশী'' "বিজ্ঞান দর্শক'' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছেন। হেতমপুর রাজ বাড়িতে রাজকন্যা ভূপবালার চিকিৎসার জন্য তাঁকে হেতমপুরে আনা হয়। হেতমপুর রাজবাড়িতে নাট্যচর্চা দেখে তিনি "রামবনবাস'' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁর বীরভূম বিবরণী (২য়) খণ্ডে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কথিত আছে একবার দাঁড়কার পঞ্চানন রায় মহাশয় রঙ্গলালকে প্রশ্ন করেন—

"হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল ?" রঙ্গলাল তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনা করে পাদপূরণ করেন যার শেষ পংক্তিটি হল "হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল।" অনুরূপ ভাবে কথিত আছে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে রঙ্গলালের তাৎক্ষণিক কবিতা রচনার ক্ষমতা আছে জেনে তাঁকে পাদ পূরণ করতে দেন "গোদ হয়নি চুলে," রঙ্গলাল নাকি তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করে পাদপূরণ করেন। আগেকার দিনে এরকম পাদ পূরণের খেলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বাক্‌পটুত্ব ও তাৎক্ষণিক রচনা প্রতিভা এক ধরণের প্রতিভার পরিচয় হলেও প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় নয়। তাঁর প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় রয়েছে সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সুচিন্তিত পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধাবলী ও অন্যান্য রচনার মধ্যে।

রঙ্গলালের কোন গ্রন্থ বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় না; সুতরাং এ যুগের মানুষ তাঁর রচনার রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত। রঙ্গলাল স্মৃতিরক্ষা কমিটির সুযোগ্য সম্পাদক সিরাজুল হক সাহেব বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন স্থান ঘুরে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে রঙ্গলালের বহু প্রবন্ধের জেরক্স কপি সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে মোট চারিটি প্রবন্ধ আমায় ব্যবহার করবার জন্য দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বৈচিত্র্যময় জীবনের মতই জ্ঞানান্বেষণ ও মনীষার ক্ষেত্রেও রঙ্গলালের ছিল বৈচিত্র্য। তিনি লিখেছেন "অদ্ভুতকাব্য জগৎ"—যে প্রবন্ধের মধ্যে কবি সত্তার বৈশিষ্ট্য, কাব্য জগতের বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব জগৎ ও কাব্যজগতের পার্থক্য কোথায়—তা পাঠকের সামনে পরিস্ফুট করেছেন। আবার পরমুহূর্তে রঙ্গলাল ইতিহাস ও পুরাণের জগতে অবগাহণ করে রচনা করেছেন "তুমিই কি সেই দৈবকীনন্দন ?" ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও ইউরোপের খৃষ্ট কি এক ? কে প্রাচীন ও কে নবীন—এই কূটতর্কের মধ্যে অবতরণ করেছেন রঙ্গলাল। "চৈতন্য হরণ" প্রবন্ধে তিনি অবতরণ করেছেন অবচেতন মনের জগতে। আবার 'ভাষার নমনীয়তা' প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষায় স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। চারিটি প্রবন্ধেই রঙ্গলালের মনীষা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশিত। তাঁর পাঠ্য বিষয় কত সুবিস্তৃত ছিল তা আমরা বুঝতে পারি ইংরাজি ভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত প্রদত্ত পাদটীকা গুলি থেকে। যে মানুষ বাল্যকাল থেকে বাংলা দেশের এবং ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরেছেন, যিনি দাঁড়কার মত পল্লীগ্রামে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাটিয়েছেন, যিনি তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়

করেছেন চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করার এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে—তিনি কখন কেমন করে বিশ্ব সাহিত্যের এত গ্রন্থ পাঠ করলেন, ধ্যান ধারণা ও চিন্তার দ্বারা বিচিত্র বিষয়ে নিজের অভিমত গঠন করলেন এবং তা প্রকাশ করলেন প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

'অদ্ভূত কাব্য জগৎ' প্রবন্ধটি রঙ্গলাল আরম্ভ করেছেন ভারতবর্ষে আর্যগণের সাহিত্য ও কাব্য সৃষ্টির আদিযুগের ইতিহাস থেকে। তাঁর ভাষাতেই বলা যায় "সম্মুখে যাহা কিছু অদ্ভূত, যাহা কিছু প্রতাপান্বিত,—মুক্ত কণ্ঠে করুণ স্বরে তাহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখনো সূর্যকে কখনো চন্দ্রকে কখনো বরুণকে, বিপদ উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিতেছেন। এটি তাঁহাদের সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বাভাবিক বুদ্ধির ফল। এইখানেই কাব্যের সূত্রপাত।" লেখকের বক্তব্য —এরপর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানের উদ্রেক হ'ল। "সূর্য কে?" "তুমি ডাকিলে তিনি তো তোমার আশা পূর্ণ করিলেন না?"—এই কূট তর্ক মীমাংসার মধ্য দিয়েই বেদান্ত, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র সমূহের উদ্ভব। লেখক একে একে কাব্য, চিত্র, সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যার বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। কবিগণ ব্যাঙ্গোক্তি দ্বারা, সরল কপটতা পূর্ণ মাধুর্য দ্বারা এক অলৌকিক মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই জগৎই কাব্যের জগৎ। এ জগৎ অদ্ভুত, সত্য অথচ সত্য নয়। এ জগতে শিশুর সারল্য। রঙ্গলাল তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেমন একদিকে সংস্কৃত বিভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তেমনি macaulay, Addision, Pope, Milton থেকে অজস্র উদ্ধৃতি পাদটীকায় যুক্ত করেছেন। কাব্যের রস ব্যঞ্জনায় লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ।

"তুমিই কি সেই দৈবকী নন্দন?" রচনাটি পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক বিতর্ক মূলক রচনা। লেখক স্বীকার করেছেন—বৈদেশিক রাজবিপ্লবে ভারতবর্ষে'র সমস্ত ইতিহাস বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের সকল পুস্তকই মনের কপোল সম্ভূত কল্পনা রাশিতে পূর্ণ। সেইজন্যই খ্রীষ্টিয় ধর্ম পুস্তক এখন পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির উপাস্য। তাই ভারতবর্ষে'র অনেক মানুষ মনে করেন লেখক পাদটীকায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন) যে সেণ্ট পল্ ভারতবর্ষে এসে খ্রীষ্টীয় মত ও বিশ্বাস প্রচার করেন এবং তাঁরই নিকট হিন্দুগণ খ্রীষ্ট বৃত্তান্ত অবগত হয়ে কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। হিন্দুদের বর্ণিত পুলস্ত আসলে সেণ্ট পল। প্রসঙ্গ ক্রমে লেখক প্রথমে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের শুধু নামের মিল নয় লীলা কাহিনীর মিল কোথায় কোথায় তার উল্লেখ করে প্রাথমিক

ভাবে মন্তব্য করেছেন "এই অনুমান সত্য ও সমূলক হইতে পারে।' কিন্তু তার পরেই লেখক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন বিপরীত দিক থেকে।—"মেরীপুত্র খ্রীষ্ট কি সেই দৈবকীনন্দন? না য়িহুদিরা ব্রাহ্মণ দিগের কৃষ্ণনাম সুধাভিসিক্ত দেখিয়া তাহা আপনাদের পুস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন?" এরপর লেখক রামায়ণ মহাভারতের কাল, কলিযুগের কাল, মহাভারতের প্রাচীনত্ব, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের রাবণ কাহিনী বিশ্লেষণ করে সপ্রমাণ করেছেন যে কৃষ্ণ বৃত্তান্ত খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বের ঘটনা। তাই তাঁর যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্ত—"আমাদের কৃষ্ণ খ্রীষ্ট নহেন, তিনি মেরীকে আবার মা বলেন নাই—যা বলিয়াছিলেন সে কেবল যশোদাকে। বিষয় লিপ্সা করিশূন্য ব্রাহ্মণেরা চৌর্য্যবৃত্তি জানিতেন না—জেরুজালেম বাসীরাই গোপীদের মনোচোরাকে চুরি করিয়াছেন।"

"চৈতন্য হরণ" রচনাটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের রচনা। এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল চৈতন্যহরণ বলতে বুঝিয়েছেন ইংরাজিতে যাকে বলে Hypnotism। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন—উত্তর সাধন (Mesmerism) এবং জীবনীর তড়িৎশক্তি (Electro Biology)। এর থেকে বোঝা যায় রঙ্গলাল এ সকল বিষয়েও কৌতূহলী ছিলেন এবং পড়াশুনো করতেন। তিনি প্রেয়ার, সিম্পার, সেসমার—প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 'চৈতন্য হরণ' শুধুমাত্র চৈতন্যের অবলুপ্তি, কিন্তু উত্তর সাধন বা masmerism হ'ল ব্যক্তিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের সদুত্তর দান। রঙ্গলাল বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করেছেন। অবশেষে মন্তব্য করেছেন—"অন্য মনস্কতা এতাদৃশ ফলোৎপত্তির কারণ। ঐচ্ছিক স্নায়ুর জাড্য সম্পাদন ইহার গৌণ কারণ। যে কোন উপায়ে হউক, প্রথমে চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিলে অন্যমনস্কতা জন্মে।" রঙ্গলাল এই বিদ্যাকে কুহকিনী বিদ্যা বলে উল্লেখ করে সহজে কিভাবে একজন মানুষের চৈতন্য হরণ করা যায় তার কৌশল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মন্তব্য করেছেন "বলবান কিংবা অস্থির চিত্ত ব্যক্তির চৈতন্যহরণ করা সুসাধ্য নহে।"—জানিনা চিকিৎসক রঙ্গলাল এ বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন কিনা, তবে তাঁর বর্ণনা থেকে এমত সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়। তবে উপসংহারে রঙ্গলাল এ মন্তব্যও করেছেন যে—এ বিদ্যা আজও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা প্রচুরভাবে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে।

'ভাষার নমনীয়তা' প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য, খানিকটা রচনা ধর্মী। প্রথমে প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন গাছের ডালে পাখী বলে—"বউ

কথা কও" কিংবা "ফটিক জল", অথবা "চোখ গেল।" লেখক বলতে চান আসলে পাখি পাখির ভাষাতেই বলে, কি বলে জানিনা। কিন্তু মানুষ নিজের মনের কথাটুকু পাখীর কথার মধ্যে আবিষ্কার করে। তেমনি বর্তমানে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বহির্দেশের অনেক ভাষার ধ্বনিসাম্য থেকে অনেক পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে মূলে এই সকল জাতি এক ছিল। কিন্তু রঙ্গলাল এ মতবাদে বিশ্বাসী নন। তাঁর ধারণা বহির্দেশীয় ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দের মিলের কারণ সংস্কৃত ভাষার কোমল নমনীয়তা ও স্থিতি স্থাপকতা। তাঁর মন্তব্য—"উহাকে সঙ্কুচিত কর, সম্প্রসারিত কর, ফিরাও—কিছুতেই উহা ভাঙ্গিবে না মচ্‌কাইবে না। অতএব অন্য ভাষার শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার শব্দের যে সৌসাদৃশ্য হইবে, তাহা বিচিত্র নয়।" লেখক তালিকা করে দেখিয়েছেন কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত, পারসিক, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় প্রায় এক। শাব্দিক গণের মত যে আর্যেরা ভারতবর্ষের আদি নিবাসী নন্ তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছেন এশিয়া খণ্ডের মধ্য দেশ থেকে—রঙ্গলাল এ মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষই আর্যগণের আদিনিবাস এবং ব্রাহ্মণেরাই আর্য জাতির মধ্যে প্রধান। পরিশেষে রঙ্গলাল বলেছেন যে ভারতবর্ষ থেকেই যদি আর্য গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তাহলে অন্য দেশে সংস্কৃত চর্চা লুপ্ত হয়ে গেল কেন এবং কেনই বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত ভাষার মূল কাঠামোটি বজায় আছে?—এ প্রবন্ধটির মধ্যে রঙ্গলাল যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন হয়ত তা বর্তমান কালে সর্বজন গ্রাহ্য হবে না—কিন্তু যেভাবে তিনি যুক্তি জাল বিস্তার করেছেন তাতে তার মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় সন্দেহাতীত।

রঙ্গলালের ব্যবহৃত ভাষা প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর ভাষা সাধু, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের উপযোগী। সাধুভাষা হ'লেও তাঁর ভাষা কিন্তু বেশ সহজ সরল। অবশ্য মাঝে মাঝে বর্তমানে অপ্রচলিত তৎসম শব্দের কিছু ব্যবহার আছে। তবে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা সহজেই পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে।

রঙ্গলালের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে তাঁর 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলনের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দাঁড়কায় অবস্থান কালে তিনি কিছুদিন দাঁড়কা পরিত্যাগ করে কলিকাতা চলে যান এবং মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে মধ্যম ভ্রাতা সুসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় "বিশ্বকোষ" সঙ্কলনের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। "অ" এবং "আ" এর কিছু অংশ সঙ্কলন করে খামখেয়ালী বিচিত্র মানুষ রঙ্গলাল হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে আবার দাঁড়কা ফিরে আসেন এবং লাঘোষায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। সত্যই বিচিত্র তাঁর জীবন, বিচিত্র তাঁর কর্ম সাধনা।

জীবনের এবং মনের এই বৈচিত্র্য তিনি শেষবারের মত দেখিয়ে গেলেন তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, মুসলমান বা খ্রীষ্টান নন্; তিনি ছিলেন শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত, বৈষ্ণব মন্ত্রে নয়—অথচ তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন দাহ করা না হয়, সমাহিত করা হয়। তাঁর জন্মস্থান ২৪ পরগণার রাহুতা। লাঘোষা তাঁর শেষ জীবনের কর্মভূমি। কিন্তু তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে গেলেন, তাঁর দেহ যেন লাঘোষার মাটিতেই সমাহিত করা হয়।—এই বিচিত্র কর্মযোগীর সমাধি বেদীর দিকে তাকিয়ে তাই আমরা বিস্ময়ে হতবাক্। আজকের মানুষ এই জীবন-তপস্বীর কর্মব্রতের পরিচয় জানে না। তাঁর বিচিত্র কর্মজীবনের সামান্যতম অংশ প্রকাশ করতে পেরে আমরা কৃতার্থ। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।



রাহুতায় রঙ্গলালের জন্মগৃহ। বিশ্বকোষ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে রঙ্গলালের কতিপয় আত্মীয় ও প্রতিবেশী। বাঁ দিকে সামনে দাঁড়িয়ে সিরাজুল হক ও চতুর্থ বদরুদ্দোজা মল্লিক। ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

সাহিত্য সাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য (নবদ্বীপ)

বিন্দু বিন্দু বারি সমবায়ে নির্মিত মহাসাগরের মত শত শত সাধকের জীবন রসে নির্মিত হয়েছে সহস্র বৎসরের বাংলা সাহিত্যসাগর। কত সাহিত্যিকের কত সাধনার দানে পুষ্ট এই বিপুল সাহিত্য সম্ভার তার হিসাব কেউ-ই মনে রাখে না। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় হয়ত কতকটা আভাস মেলে কী বিপুল সংখ্যক সাধকের মহাদানে তৈরী হয়েছে আজকের এই বিপুল সৌধখানি। কিন্তু আত্ম বিস্মৃত বাঙালী মনে রেখেছে ক'জনকে? অতীত পর্যবসিত হয়েছে বিলুপ্তির অন্ধকারে। অতীতের কয়েকজন মাত্র উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক এখনও বেঁচে আছেন বাঙালী পাঠকের হৃদয়াকাশে। এমনি একজন বিস্মৃত বাঙালী মনীষী সাহিত্যসাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে হাইফেনের মত দণ্ডায়মান যে বর্তমান, অতীতকে বাদ দিয়ে ত তার কোন পরিচয় নেই। অতীতের হারানো দিনগুলির গৌরব স্মরণে মননে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাহিত্য সংসার ও সমাজজীবন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাঙালী জীবনে যে চরম অবক্ষয়, যে দুঃসহ অধোগতি তা থেকে উন্নয়নের একমাত্র উপায় অতীত গৌরবের দিনগুলিকে স্মরণ করা অনুসরণ করা পুরনদিনের মনীষীদের কীর্তি কাহিনী!

বাঙালীর সাহিত্যাকাশে অত্যুজ্জল দীপ্তি নিয়ে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যের পূজারীরা আসেন নি ঠিকই, কিন্তু ছোটবড় দীন মহৎ নিয়ে যেমন মানব সমাজ। সাহিত্য সংসারও তেমনি বড় বড় সাহিত্যরথীর পাশে ছোট মাঝারি অসংখ্য সাহিত্যিকের অবস্থান যে স্বাভাবিক, সেকথা বলাই বাহুল্য। মহারথীর সংখ্যা ত সর্বদেশে সর্বকালেই স্বল্প। ছোট মাঝারিরা সমাজের ছোট তথা সাহিত্যে হাটে যে পসরা সাজায় সমষ্টিগত ভাবে তার পরিমাণ বড়দের থেকে অনেক বেশী। অথচ মাঝারি ছোট সাহিত্যিকদের মনে রাখার প্রয়োজন বিশেষ কেউ বোধ করে না। সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত সভায় একতারা যাদের তাদেরও ত যোগ্য মর্যাদাটুকু দিতে হবে। নইলে আমরা শুধু কর্তব্যভ্রষ্ট হব না, পূর্বপুরুষের ঋণকে অবজ্ঞার অপরাধে হব অপরাধী, উত্তরপুরুষের জীবনেও আদর্শচ্যুতির হেতু হব।

চব্বিশ পরগণার রাহুতাগ্রামবাসী বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রঙ্গলাল জন্মসূত্রে ২৪-পরগণার সন্তান হলেও জীবনের অনেকটা কাল যাপন করেছেন বীরভূমের দাঁড়কায়, দেহও রেখেছিলেন তিনি এখাকার মাটিতেই। দারিদ্র্যবশতঃ স্কুল কলেজের গতানুগতিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না হলেও নিজের চেষ্টাতেই রঙ্গলাল ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, জীবন অতিবাহিত করেছেন শিক্ষাব্রতে। নানাস্থানে শিক্ষকতার পর বীরভূমের দাঁড়কায় প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবনের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। রঙ্গলাল শুধু শিক্ষাব্রতী নন, তিনি সাহিত্যব্রতীও। তাঁর মধ্যমভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গলেখক ও উদ্ভট রসের লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। রঙ্গলালের প্রতিভাও ছিল সহজাত। সাহিত্য. বিজ্ঞান দর্শনের বহুবিভাগেই ছিল তাঁর অধিকার, কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনাতেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। সোমপ্রকাশ, জন্মভূমি, কল্পদ্রুম, আর্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সহজাত কবিত্ব শক্তির অধিকারী রঙ্গলাল কবিতার পাদপূরণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে দাঁড়কা স্কুলে এসে (১৮৭০) রঙ্গলালের পাদপূরণ শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সঙ্গীত ও পাঁচালী রচনায় রঙ্গলালের খ্যাতি একসময়ে বিস্তৃত হয়েছিল। চিত্তচৈতন্যোদয় (১২৭৪), বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার (১২৮৫) এবং সংগীত উপদেশ ছিল তাঁর কবিতা ও সংগীতের সংকলন গ্রন্থ। কৌতুকাশ্রিত সংগীতরচনাতেও ছিল তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন,—

বেঁচে গেলুম আলো দিদি একাদশীর দায়ে।
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে॥ ইত্যাদি।

এদিক থেকে তিনি কবি ঈশ্বরগুপ্তেরই যোগ্য শিষ্য। বর্ধমান মহারাজ প্রদত্ত কাব্য রত্নাকর উপাধি তাঁর যোগ্য ভূষণ।

রঙ্গলালের গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিদাস সাধু (জীবনী ১২৯০) এবং বিজ্ঞান দর্শক। তাঁর অপর একটি গ্রন্থ শরৎ শশী। একসময়ে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল। রঙ্গলালের স্মরণীয় কীর্তি বিশ্বকোষের প্রবর্তনা। অনুজ ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তিনি বিশ্বকোষ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরে যন্ত্রটি স্বগ্রামে স্থানান্তরিত করে বিশ্বকোষ মুদ্রণ

করেছিলেন। প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার (১২৯০) পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের তরফ থেকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় তিনি এই বিরাট দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। বিশ্বকোষ অভিধানের উদ্গাতা হিসাবে রঙ্গলাল সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

রঙ্গলালের কোন গ্রন্থ এখন সুলভ নয়। আধুনিক বঙ্গবাসীর কাছে তিনি বিস্মৃতপ্রায় লেখক। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল প্রতিভাবান সাহিত্যসাধক মনীষীদের মধ্যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রথম দুভাগের প্রকাশনার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হওয়ার যোগ্য।

বিস্মৃতির অতলান্তিক গহ্বর থেকে একদা প্রথিতযশা কবি, প্রাবন্ধিক ও বিশ্বকোষের প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধার করে বাঙালীর হারানো গৌরবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যাঁরা তাঁর ১৪৭ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছেন তাঁরা বাঙালীর একটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সম্পাদন করে বঙ্গভাষীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবে আমি অভিনন্দন জানাই।

বিচিত্ররূপী রঙ্গলাল

ডঃ রেবতীমোহন সরকার

চব্বিশ-পরগণার রাহুতা গ্রামের একজন মানুষ তাঁর জীবনের বিস্তৃত কর্মপরিধির কোন এক সময়ে বীরভূমের দাঁড়কা ও লাঘোষা গ্রামের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। এ মিলন এত স্বতঃস্ফূর্ত এবং এত অকৃত্রিম যে পরবর্তী জীবনে সেই মানুষটিকে বীরভূমের জল মাটি মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে উদ্ভাসিত হতে দেখা গিয়েছিল। সেই বিশেষ মানুষটির নাম রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি কখনও কবি রঙ্গলাল, কখনও প্রবন্ধিক রঙ্গলাল, কখনও ধার্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ রঙ্গলাল কখনও শিক্ষক রঙ্গলাল, চিকিৎসক রঙ্গলাল, আবার কখনও বা তিনি মুদ্রাকর রঙ্গলাল। এছাড়াও আমরা রঙ্গলালকে দেখেছি সরকারী টাকশালের নিরলস কর্মী হিসেবে, আবার কখনও বা তিনি পুলিশ বিভাগের করণিক।

একথা অবিসংবাদিত যে রঙ্গলাল বহুবিষয় এবং অধিকাংশ সময়েই পরস্পর বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা রঙ্গলালের জীবনকে নানাভাবে রূপায়িত করেছিল। জীবনের গতিপথ বিভিন্নমুখী এবং ভিন্নগামী হওয়ায় নানা চিন্তাধারা এবং মানসিকতার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং মিলন মিশ্রণ রঙ্গলালের চরিত্রকে এক বিশেষ দিগন্তে উদ্ভাসিত করেছিল। তখনকার দিনে একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন আজকের মত এতটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ত ছিলই না বরং সে পথ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সাবলীলতায় আজ দূর হয়েছে নিকট একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। "দেশে দেশে মোর ঘর আছে"—একথাটা আমরা আজ ভেবে নিতে পারি অতি সহজেই। কিন্তু সেদিন অর্থাৎ রঙ্গলালের সময়ে এটা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। এমন দিনে তাঁর স্থানান্তরে গমনাগমন এবং বিভিন্নস্থানে শিক্ষালাভ, শিক্ষাদান, অন্যান্য কর্মপরিচালনা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না এবং তাকে এগুলি প্রায় একটা চ্যালেঞ্জের মত গ্রহণ করতে হয়েছিল।

অনেকে বলেন রঙ্গলাল ছিলেন অস্থির মস্তিষ্ক; কোন একটা কাজে তিনি অধিকদিন মনসংযোগ করে থাকতে পারতেন না। ফলে একটা ছেড়ে একটা ধরতেন। তবে সেই সাথে আমাদের একথাটা মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র

মানসিক অস্থিরতাই তাঁকে বিভিন্নরূপী কাজে যুক্ত থাকতে সাহায্য করেনি। রঙ্গলালের জীবনধারার সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে একথাইত প্রীয়মান হবে যে তিনি জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। একজন স্বভাব কবির পক্ষে টাকশালের নিরলসকর্মী হিসেবে কর্মসম্পাদন অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ দুরূহ কাজ। কেবল ব্যুৎপত্তি লাভই নয় তিনি এই চিকিৎসাবিদ্যার মাধ্যমে বহু অর্থ উপার্জনও করেছিলেন। কাজেই এইসব ভিন্নধর্মী কর্মগ্রহণকে কেবলমাত্র অস্থিরতা বা চিত্ত বৈকল্য দোষে দুষ্ট করলে যথার্থ হবে বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ আরও নিবিড়ভাবে করলে দেখা যাবে এক একটি ঘটনা রঙ্গলালের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তা এত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতিবিধানে তিনি দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেদিনের ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে গ্রামজীবন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল—সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। চোখের সম্মুখে মানুষ মানুষকে ম্যালেরিয়ার বলি হতে দেখেছে। রঙ্গলাল সেই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েছিলেন। ম্যালেরিয়াই তাঁকে তাঁর শিক্ষকতার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এই ম্যালেরিয়াই তাঁকে বহু জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। রঙ্গলাল সেই বিভিষিকাময় ব্যাধির কবলগ্রস্ত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেননি। কিভাবে এই রোগ থেকে মানুষ পরিত্রাণ পায় তার জন্য তিনি সদা সতর্ক হয়ে পড়েন। কালক্রমে তিনি বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের সান্নিধ্যে আসেন। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজী চিকিৎসার নানা পদ্ধতির আলোচনাই নয় এগুলির বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি উৎসাহিত হয়ে পড়েন। কালক্রমে এই সমস্ত বিদ্যা অতি যত্নসহকারে গ্রহণ করে রঙ্গলাল একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেন। দৈনন্দীন জীবনে তিনি এই চিকিৎসাবিদ্যা প্রয়োগে বহুমানুষের উপকার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটিই তাঁর একটি উপার্জনের পথ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছিল। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর সুখ্যাতি সমগ্র অঞ্চলজুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আপন উদ্যোগে একটি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে যেভাবে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন তাকে আর যাই-ই বলা যাক চিত্তে অস্থিরতারূপী মানসিকতাকে একটি যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জেয়াদ ঘোষণা করে সেগুলির সক্রিয় সমধানের জন্যে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এর জন্য ছিল তাঁর অসীম মনোবল এবং অক্লান্ত কর্ম ক্ষমতা। রঙ্গলালের জীবনে বীরভূমের গৈরিক প্রকৃতি

প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বীরভূমের ঐতিহ্যময়ী পল্লীপ্রকৃতি তাঁর মনে সাহিত্য সাধনার দীপ শিখাটিকে উত্তরোত্তর প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল। বীরভূমের জল, হাওয়া ও প্রাণের পরশ তাঁর কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত করেছিল। দাঁড়কা ও লাঘোষা গ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের সাথে রঙ্গলাল একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে প্রবাহিত বীরভূমের রূপময়ী ময়ূরাক্ষী তাঁকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বর্ষার দুকূল প্লাবিত ময়ূরাক্ষীর গৈরিক জলরাশি তাঁর মনে তুফান ছুটিয়েছিল। বীরভূমে রঙ্গলাল মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বেশে রঙ্গলাল বীরভূমে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বীরভূমের গৈরিক প্রকৃতি সেদিনের সন্ন্যাসীকে অভিনন্দিত করেছিল। সন্ন্যাসী বীরভূমের প্রকৃতিকে ভালবাসলেন—মানুষকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং কালক্রমে সাধারণ মানুষের জীবন পরিগ্রহ করে তিনি সাধারণের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এখানেই রঙ্গলালের জীবনের বৈশিষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বহুরূপী এবং নানা কর্মকাণ্ডে একান্তভাবে কিন্তু রঙ্গলালের স্মৃতি বীরভূম তথা বাংলার জনমনে যথেষ্টরূপে জাগরূক নয়। কালের প্রবাহে রঙ্গলালের কর্মবিচিত্রা এবং জনসাধারণের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসার কথা বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তিনি নানাভাবে জাগ্রত আমাদের মনে—আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি গবেষণার দিগন্তে। সেখানে তিনি ধ্রুবতারার মত প্রোজ্জ্বল—আপন কর্মবিচিত্রার পসরা নিয়ে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। রঙ্গলাল বিচিত্ররূপী ছিলেন—একথা প্রমাণিত হয় তাঁর বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তিনি বহুকাজ করেছেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি তাঁর জীবন ও কর্মদিয়ে বোধকরি সেই বিখ্যাত ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটিকে খণ্ডন করেছেন। Jack of all trades and master of none—একথা তিনি সার্থকভাবে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। রঙ্গলালের জীবন পর্যালোচনা করলে একথা সত্যিই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সববিষয়ই কিছু না কিছু জানতেন। জীবনের প্রায় সকল পরিমণ্ডলেই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা, মননশীলতা এবং পাণ্ডিত্যের মধ্যদিয়ে বিশ্বকোষ প্রবর্তন করে রঙ্গলাল প্রমাণ করলেন যে Jack of all trades হয়েও তিনি একটি বিশেষ ব্যাপারে master. আজও যার তুলনা মেলা ভার।

বাংলা বিশ্বকোষ ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

অর্ণব মজুমদার

বিশ্বের বহুধা বিভক্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্তসারাকারে একটি বিশেষ উপযোগী শৈলীকে অবলম্বন করে একত্রিত গ্রন্থনার নাম জ্ঞানকোষ। এই জ্ঞানকোষ ও শব্দার্থবোধক অভিধানের সমাহারে পরবর্তীকালে বাংলায় যে "বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ". গ্রন্থাবলী রূপে প্রকাশিত হয়—প্রবর্তক রঙ্গলাব মুখোপাধ্যায় তার নাম দেন—'বিশ্বকোষ'।

এই ধরণের জ্ঞান পুস্তকের আদর্শ সম্পর্কে ফরাসী কোষ গ্রন্থের স্বনামধন্য সংকলক (আঁসাইক্লোপিদি। ১৭৫১—৭২) দিদরে"ার উক্তি সর্বকালের জন্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন,—"বিশ্বজুড়ে যে জ্ঞান সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাকে সমাহৃত এবং সুবিন্যস্ত ভাবে একত্রিত করা কোষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঐ জ্ঞানের মর্মার্থ সমকালিক প্রজন্মের কাছে ব্যাখ্যা করা ও উত্তরসূরী বংশধরগণের হাতে তাকে পে"াছে দেওয়া কোষ গ্রন্থের লক্ষ্য। বিগত শতাব্দী জ্ঞানচর্যা যেন অনাগত কালের প্রয়োজনে লাগে। উত্তমপুরুষ যেন আমাদের চেয়ে জ্ঞানী হয়ে আমাদের অপেক্ষা বেশী সৎ ও সুখী হতে পারে।"

কোষ গ্রন্থ প্রণয়নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের—ত"ারাই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা ও প্রবর্তনা করেন।

স্বীকার করতে দ্বিধা নাই যে ডম্বরুচরিতের লেখক ত্রৈলোক্য নাথের সঙ্গে বাংলার পাঠক সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও বিশ্বকোষের স্রষ্টা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৯০৯) সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই বিশিষ্ট জ্ঞানযোগীর জন্ম হয় নৈহাটির সন্নিকট রাহুতা নামক গ্রামে। কিন্তু কর্মসূত্রে তিনি বসবাস করতেন বীরভূব জেলার লাভপুরের কাছে লাঘোষা গ্রামে। তৎস্থানে দাঁড়কা নামক গ্রামে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে ডাক্তারী পেশায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৮১।৮২ খ্রীঃ (লাঘোষায়) সহোদর ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে যুক্তি করে স্থির করেন কলকাতায় একটি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে ২২ খণ্ডে "বিশ্বকোষ" নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশ করবেন।

এ জন্য তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বিশ্বকোষ নামক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে কাজ শুরু করে দেন। পরে লোকসান হলে প্রেসটিকে রাহুতা গ্রামে নিয়ে যান এবং ত্রৈলোক্য নাথের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রীঃ দেশবাসীকে উপহার দেন বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডটি।

ঐ সংকলনটির ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার একটি স্পষ্ট রূপরেখা আমরা জানতে পারি। গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক বিষয় ভাবনার বিশাল সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে। আর সেই কারণেই সংকলনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাংলার সারস্বত সমাজে রীতিমত আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যনাথ হঠাৎ বিলাত চলে যাওয়ার ফলে ২য় খণ্ডের ৮০ পাতা ছাপার পর বিশ্বকোষের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এতদিনের লালিত পরিকল্পনা এভাবে হঠাৎ কেন স্থগিত করা হোল এ বিষয়ে সমকালিক পুঁথি পত্র থেকে কিছু জানা যায় না। তবে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়—ভাই ত্রৈলোক্যনাথের বিলাত যাবার জেদই রঙ্গলালকে চরমতম দুঃখ ক্রোধ ও অভিমানের আঘাতে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তবে সুখের বিষয় যে তাঁর ইচ্ছা অসফল হয়নি। কারণ যোগ্য লোক তার মহাভার সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কিছু দিনের মধ্যেই। এই সময় "শব্দেন্দু মহাকোষ" নামে একটি বৃহদভিধানের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু অন্যতম লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এই গ্রন্থটি বাংলার বুধ সমাজে জনপ্রিয়তা না পেলেও অভিজ্ঞতার উৎস থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী কালে "বিশ্বকোষের" সংকলক হিসাবে সার্থকনামা হয়েছিলেন তিনি। নগেন্দ্র নাথ পূর্ব পরিচিত ছিলেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের। তিনি নিঃস্বার্থ হয়ে, নিঃশর্ত ভাবে "বিশ্বকোষের" সমস্ত দায় দায়িত্বভার সঁপে দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথের উপর। এ সম্পর্কে নগেন্দ্র নাথ লিখেছেন "১২৯৫ সালে ভগবানের দুজ্ঞের্য় বিধানে আমারই উপর এই সংখ্যা প্রকাশের ভার পড়িল

এই ভার বহন করতে কুড়ি বছর ধরে কয়েক শত বিষয় বিশেষজ্ঞ লেখকের পরিমাণ সংহীত অর্থ সাহায্য পরিমান নিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে রঙ্গলালের আরব্ধ কাজকে সমাপ্ত করেন নগেন্দ্রনাথ। প্রথম খণ্ডটি রাহুতা গ্রাম থেকে প্রকাশের পর বাকি একুশটি খণ্ড প্রকাশিত হয় কলকাতার অধুনা বিশ্বকোষ লেন স্থিত 'বিশ্বকোষ প্রেস' থেকে।

অঙ্গীকারবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ স্বদেশবাসীর হাতে তুলে দিতে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে) যে বিশাল কর্মযজ্ঞের অবতারণা করতে হয়েছিল তা' এক রীতিমত ইতিহাস। জনপ্রিয়তার কথা বলতে গেলে, শুধুমাত্র একটি প্রসঙ্গের উল্লেখই যথেষ্ট।—যে মহা সৌভাগ্য বিশ্বের আর কোন স্থানের ভাগ্যে ঘটেনি সেই মহা গ্রন্থের কয়েকখণ্ড প্রকাশের সুবাদে কলকাতার ঐ রাস্তাটির নামকরণ হয় "বিশ্বকোষ লেন।" (তাছাড়া কয়েক বছরের মধ্যেই ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে ২য় সংস্করণ ছাপতে আরম্ভ করেন নগেন্দ্র নাথ ! কিন্তু ৪র্থ খণ্ড প্রকাশের সময় তার মৃত্যুতে মুদ্রণ কার্য্য বন্ধ হয়ে যায়।) এইভাবে সার্থক হয় পথিকৃৎ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের "বিশ্বকোষ" রচনার পরিকল্পনা।—যা বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে—গবেষক ও ছাত্র এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক—সকলের কাছে বিশ্বজ্ঞানের এক প্রামানিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে আজো অম্লান।

মনীষী রঙ্গলাল—কিছু স্মৃতি, কিছু শ্রুতি

শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—বিস্মৃতপ্রায় এক ব্যক্তিত্ব। আজ তাঁর সম্বন্ধে ভাবতে বসলে অনেক প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়। বহুক্ষেত্রেই জবাব মেলেনা—ভবিষ্যৎ কি কি পারবে তার গবেষণায় এর উত্তর মেলাতে ?

কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে এক গ্রামে জন্ম। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার সুযোগ হয়নি। জীবনটাকে নানাভাবে উল্টেপাল্টে দেখেছেন—পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন জীবনভোর।

মেজোভাই ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয়বার কালাপানি পাড়ি দেওয়ার জন্যে বিরক্ত রঙ্গলাল দেশত্যাগী হয়ে চলে গেছেন বীরভূমে। সম্ভবতঃ সেটা ১৮৮৬-৮৭ সাল। বাকী জীবনটা সেখানেই কেটেছে। স্বভাবতই মনে হয়, তিনি ভীষণরকম গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে মরা এনে ব্যবচ্ছেদ করেছেন—ধর্ম তাঁকে পীড়া দেয়নি। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাঁর হিন্দুয়ানী তাহলে গেল কোথায় ? এর মধ্যেই বীরভূমের জীবনে নিয়মিত তন্ত্রসাধনা করেছেন। অনেক গরমিল রয়েছে—তাহলে সত্যি ব্যাপারটা কি ছিল ? তিনি তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই কি দেশ-গাঁ ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে বীরভূমে চলে গেলেন ? নাকি বীরভূমে এসে তাঁর জীবনবেদের পরিবর্তন ঘটেছিল ?

রঙ্গলাল সাহিত্যকর্মে যুগান্তরের পথিকৃত। বিশ্বকোষ বাংলাভাষায়—এ এক অসম্ভব কল্পনা, অন্তত সেই সময়ের নিরিখে। বাংলা ভাষায় কত রককের ধারা এসেছে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামীন ভাষার এত বৈচিত্র্য যেখানে, বিশ্বকোষের প্রবর্ত্তনার চিন্তাটাই অসম্ভব কথাটাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বোঝায়। তাঁর কাব্য-প্রবন্ধ ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যাতে ধন্বন্তরী-কল্প ব্যুৎপত্তি এক বিস্ময়কর প্রতিভার ছবি আমাদের সামনে এনে দেয়।

এবারে একটু প্রাসঙ্গিক কথাগুলো সেরে নিই। রঙ্গলাল ছিলেন আমার ঠাকুর্দার বড়দাদা। নিঃসন্তান রঙ্গলালের অপত্যস্নেহলাভের সুযোগ হয়েছিল আমার পিতৃদেব সুশীলকুমারের। লাঘোষা গ্রামে জেঠামশাইয়ের কাছেই তিনি থাকতেন

সপরিবারে। তাঁর কাছেই ডাক্তারি শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল আমার বাবার। শব-ব্যবচ্ছেদের সঙ্গীও থাকতেন তিনি। পরবর্তীকালে রঙ্গলালের মৃত্যুর পর সুশীলকুমার ঐখানেই ডাক্তারি করতেন এবং তাঁরও যথেষ্ট নামডাক হয়েছিল হয়েছিল ডাক্তার হিসেবে। তবে রঙ্গলালের মৃত্যুর সাতবছর পরে তিনি হঠাৎ মারা যান আর আমাদেরও বীরভূমের পাট চুকিয়ে চলে আসতে হয় রাহুতায়।

রঙ্গলাল সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানা আছে তা সবই শ্রুতিনির্ভর। কারণ আমার জন্ম তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে।

আমার ছোটবেলায় লাঘোযায় যেতে হলে সাঁইথিয়া অথবা আহমদপুর ষ্টেশনে নামতে হ'ত। তারপর গরুর গাড়ীতে। পথঘাট বিশেষ কিছু ছিলনা, অধিকাংশ রাস্তাটাই ছিল ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে। ছই দেওয়া গাড়ীতে পুরু বিচুলির আস্তরণ থাকত। তা সত্ত্বেও আল-গুলো পার হবার সময় ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হত। সে সময় চোর-ডাকাতের উপদ্রব ভালরকমই ছিল। তারপর ঐ অঞ্চলে পারস্পরিক রেষারেষি বা হিংসার ব্যাপারটা খুব প্রকট ছিল। এরকমও শোনা গেছে কারও ভালো লাঙলের বলদকে মারবার জন্যে মুচিকে নিয়োগ করা হয়েছে কিছু পয়সা দিয়ে। আর মুচি কলাপাতায় বিষ মাখিয়ে গরুকে খাইয়ে মেরে ফেলল সকলের অজান্তে। এছাড়া ঘরে আগুন লাগানোর ঘটনাও মাঝে-মাঝে ঘটত।

বর্ষায় বন্যা এক রকম স্বাভাবিক ছিল। গ্রামের মানুষ চাষবাস ছাড়াও জীবিকার জন্যে শাঁখের কাজ করত আর ঘরে ঘরে ছিল 'পলু' পোকার চাষ। ময়ূরাক্ষীর ধারে প্রচুর 'তুঁত' গাছ জন্মাত। তুঁত গাছের পাতা হচ্ছে 'পলু' পোকাদের খাবার। পোকার গুটি থেকে রেশম তৈরী হ'ত।

ঐখানে থাকাকালীন আমি পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলাম আর আমার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আবার মহাপুরুষ রঙ্গলালের কথায় আসি। বীরভূমে পাকাপাকি ভাবে যাবার আগে তিনি নানা রকম কাজকর্ম করেছেন। ডাক্তারি শিখেছেন নানাজনের কাছে। চন্দননগরে এক ফরাসী ডাক্তারের কাছে শিক্ষানবিশী করার সময় একবার একজন রোগী আসেন 'উরুস্তম্ভ' চিকিৎসার জন্যে। রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করছিল কিন্তু

ফরাসী ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, এখনও পাকেনি সুতরাং অপারেশন করা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে বোঝাও যাচ্ছিল না যে ঐ অংশটা পেকে উঠেছে বা সেরকম নরমভাব ছিল না। কিন্তু রঙ্গলাল সাহেবডাক্তারকে জোর দিয়ে বললেন অপারেশন করতে কারণ ভেতরে পুঁজ জমে আছে। ডাক্তার কাটলেন তাঁর কথায় কিন্তু ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল। স্বভাবতই ফরাসী ডাক্তার বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে রঙ্গলালকে দু'চারটে কটু কথা শোনালেন। তখন রঙ্গলাল নিজেই ছুরি নিয়ে পাশের একটা জায়গা একটু চিরে দিতেই ছিটকে এল প্রচুর পুঁজ রক্ত। ডাক্তার আর ছাত্র দুজনেই ঐ দুর্গন্ধ পুঁজে মাখামাখি। কিন্তু রঙ্গলালের মুখে হাসি আর সাহেব তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন 'সাবাশ'। এ'গল্প আমি আমার ঠাকুর্দা শ্যামলালবাবুর মুখে শুনেছি।

বীরভূমের যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন তার পাশেই আরও একটা বাড়ী ছিল, সেখানে তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। সঙ্গে এক ডোম আর অনেক সময় আমার বাবা। বলাবাহুল্য মরা তুলে আনতেন খুব গোপনে হয় ময়ূরাক্ষী নদী থেকে অথবা সদ্য দেওয়া কোন কবর থেকে। তাঁর শোবার ঘরের ঠিক পাশেই একটা ছোট কুঠুরী ছিল। তার শুধু একটা ছোট দরজা। ঘরটার মেঝেটা ছিল শোবার ঘরের মেঝে থেকে দু-তিন হাত নীচে। অর্থাৎ খানিকটা মাটির নীচে ঘরটা ছিল। মা'র মুখে শুনেছি ঐ ঘরে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল। অন্য কারও ঢোকার হুকুম ছিল না সে ঘরে। মাঝে মাঝে তিনি ওখানে সাধনায় বসতেন। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলত আর আনুসঙ্গিক উপচার নিয়ে উনি সাধনায় বসতেন। সেই সময় তিন-চারদিন উনি একদম বের হতেন না। বাড়ীর কাজের লোক মোক্ষদাদিদি দরজার বাইরে থেকে গাওয়া ঘি প্রদীপে ঢেলে দিতেন। তারপর একদিন সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি উপবাস ভাঙতেন। বাড়ীর লোকের ধারণা ছিল কোন কঠিন অসুখের রোগীর নিরাময়ের জন্যে তিনি ঐরকম সাধনা করতেন। এ' ব্যাপারে তিনি কখনও কাউকে কিছু বলেননি। ঠাকুরমাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এ সম্বন্ধে। তাঁর দুই কম্পাউণ্ডারের নাম ছিল কালী পরামানিক আর বিপিন পরামানিক। ওখানে 'মোকদা' নামে এক মহিলাকে তিনি খুব ভালো ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। আমি যখন 'মোকদা' দিদিকে দেখি তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ।

রঙ্গলালবাবু নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। সড়কি খেলাও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার মাঠপাড়ার হেঁতাল শেখ বলে একজনকে তিনি সড়কি খেলায়

জখম করেন। পরে অবশ্য তিনিই হেঁতালকে সারিয়ে তোলেন। দশাসই চেহারার হেঁতালের সেই ক্ষতচিহ্নটা আমার বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন।

ডাক্তারী জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনার কথা আমি বাবার মুখে শুনেছিলাম। হেতমপুরের আশপাশে কোনও জমিদারবাড়ীর ঘটনা। সেটাতে ডাক্তারির ব্যাপার বিশেষ ছিল না বলে সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

শেষ সাত বছর তিনি দুরারোগ্য বাতজ ব্যাধিতে ভোগেন। বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারতেন না। রোগীদের কষ্টের কথা শুনে কম্পাউণ্ডারদের বা আমার বাবাকে নির্দেশ দিতেন ওষুধ দিতে।

তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যেন দেহটিকে দাহ করা না হয় এবং তাঁর মুখাগ্নি করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের মৃত্যুর পর প্রতিবেশিদের পীড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত আমার ঠাকুরমা বাবাকে বলেন তাঁর মুখাগ্নি করতে। বাবাকে তিনি পুত্রবৎ দেখতেন তাই বাবারই অধিকার ছিল তাঁর মুখাগ্নি করার। মুখাগ্নি করা হলেও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় বাড়ীর কাছেই।

তিনি সাতবছর রোগভোগের পর মারা যান আর আমার বাবা তাঁর মৃত্যুর ঠিক সাত বছর বাদে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে, বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও হঠাৎ পনের দিন অজ্ঞাত রোগভোগের পর মারা যান। বাবার মৃত্যুর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তিনি পাল্কী চেপে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন 'ডিবুর' গ্রামের জমিদার বাড়ীতে। তখন গ্রীষ্মকাল, ময়ূরাক্ষী নদীতে জল বেশী ছিল না পাল্কী থেকে নেমে তিনি হেঁটে নদী পার হচ্ছিলেন। ঐ সময় এক শবদেহের পেটের ওপর পা পড়ে যায়। এর অব্যবহিত পরেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারা গায়ে অসহ্য জ্বালা হতে থাকে আর চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। বাবার অকালমৃত্যুর জন্যে পরিবারের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে রঙ্গলালের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর মুখাগ্নি করার জন্যেই ওই রকম হয়েছিল।

বাবার মৃত্যুতে ঠাকুরমা জ্ঞানদা দেবী খুবই শোকাচ্ছন্ন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর আমাদের পরিবার, ঠাকুরমা এবং মোক্ষদাদিদি সবাই রাহুতায় চলে আসেন। ঠাকুরমা রাহুতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রঙ্গলাল বাবুর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র আমার কাছে আছে। তার মধ্যে

থেকে তাঁর ব্যবহৃত থার্মোমিটার এবং একটি হাইড্রোমিটার আমি শ্রীযুক্ত সিরাজুল হক মহাশয়ের হাতে তুলে দিয়েছি, সংগ্রহশালায় রাখার জন্যে।

পরিশেষে জানাই মহাপুরুষ রঙ্গলালের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর উত্তর পুরুষ হিসেবে আমরা কিছুই করতে পারিনি। এ আমাদের ক্ষমাহীন অক্ষমতা এবং সীমাহীন

সাধুবাদ জানাই তাঁদের যাঁরা তাঁর জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে রঙ্গলালের স্মৃতিরক্ষার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন এবং অশেষ পরিশ্রমে তাঁর হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যকীর্তির অনেকাংশের উদ্ধারে সফল হয়েছেন।

রঙ্গলালের অশীতি পর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুপৌত্রের স্মৃতিচারণ

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল

(একটি বিস্মৃতিপ্রায় প্রতিভা)

নিকুঞ্জবিহারী ভৌমিক

সাধারণ ভাবে ইহা সকলেরই জানা যে—স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষ" নামীয় মহাগ্রন্থ রচনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন। দেশবাসী তাঁকে "প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব" উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর সেই বিস্ময়কর প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকের নিকট-ই ইহা অজ্ঞাত যে, এই মহাগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিজস্ব নয়। তিনি "বিশ্বকোষ" রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। যিনি এই "বিশ্বকোষ" গ্রন্থের পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রবর্ত্তনা করেছিলেন তিনি হলেন নৈষ্ঠিক, শিক্ষাব্রতী, সুচিকিৎসক, সুপণ্ডিত ও সাহিত্য-সাধক স্বর্গীয় রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকটবর্তী রাহুতা গ্রামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রঙ্গলাল যে "বিশ্বকোষ" প্রকাশনের প্রবর্ত্তক সে তথ্যটি বিশেষ করে জানা যায় তাঁর সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে। শ্লোকটি হল—

"দয়াসিন্ধু মহার্যোগী বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তকঃ।
জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্॥"

জানা যায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্তিক রঙ্গলাল বীরভূম জেলার লাঘোষা গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে তিনি তাঁর স্বরচিত দুইটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুলিপি তথাকার প্রতিবেশিদের হস্তে অর্পণ করে অনুরোধ—করেছিলেন—মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বর দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত না করে লাঘোষার নির্জন স্থানে যেন সমাধি দেওয়া হয় এবং সমাধির স্মৃতি-ফলকে তার দেওয়া দুটি শ্লোক যেন উৎকীর্ণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। উপরোক্ত শ্লোকটি সেই দুইটি শ্লোকেরই একটি। বলা বাহুল্য তাঁর গুণমুগ্ধ লাঘোষার প্রতিবেশিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের অন্তিম বাসনা বাস্তবায়িত করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি তাঁদের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে সমাধি ফলকের বিষয়বস্তু রচনা করে যাওয়া নিতান্তই অভিনব—সচরাচর যা' দেখা যায় না। কোন কোন স্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতি ফলকে তাঁর রচনাংশ কদাচিৎ উৎকীর্ণ দেখা যায়—কিন্তু তা সমাধি ফলকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে রচিত নয়। প্রয়াত ব্যক্তির রচনাংশ তার শ্মশান-লিপির উদ্দেশ্যের অনুকূল বিবেচনাতেই পরবর্তীরা তা' স্মৃতি-লিপির বিষয়-বস্তু হিসেবে ব্যবহার করছে। তাই প্রশ্ন জাগে—রঙ্গলাল নিজেই তাঁর সমাধি লিপি রচনা করে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের আজ আর কেহ যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। তবে এ কথা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, তাঁরই প্রবর্তনায় যে মহৎ কাজের একদিন শুভ সূত্রপাত হয়েছিল—দেশবাসীকে সে সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা তিনি হয়ত অনুভব করে থাকবেন, যেহেতু—নগেন্দ্রনাথের কর্মৈষণার পশ্চাতে রঙ্গলালের সাধনা তখনই যেন অনেকটা অপসৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। তাঁর দুর্লভ প্রচেষ্টার এ পরিণতি জীবনসন্ধ্যায় তাঁকে হয়ত বেদনাতুর করে তুলেছিল এবং তারি পরিপ্রেক্ষিতে তিনিই তাঁর সমাধি-ফলকে "বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তকঃ" কথাটি যুক্ত করে এই মহাগ্রন্থের সূচনা-তথ্যটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বস্তুতপক্ষে, রঙ্গলালের সমাধি-ফলক "বিশ্বকোষ" সূচনার প্রকৃত অধিকারীকে সঠিক-চিহ্নিত করার এক ঐতিহাসিক দলিল।

॥ ২ ॥

"বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তকঃ" রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনী নিতান্তই বিচিত্র। তার জীবন-বৃত্তান্তের একটা পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য রেখে গেছেন বীরভূম নিবাসী বাংলার অবিস্মরণীয় গৌরব বৈষ্ণবাচার্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অনেকটা আকস্মিক-ভাবে তিনি রঙ্গলাল সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। বীরভূমস্থ হেতম্‌পুরের মহারাজকুমার মহিমা নিরঞ্জন, আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের তৎকালীন কয়েকজন পুরোধা ব্যক্তি বীরভূম জেলার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস সঙ্কলন উদ্দেশ্যে "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" গঠন করে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহারাজ কুমারের আমন্ত্রণে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ সমিতির সহ-সম্পাদকের (সম্পাদক মহারাজ কুমার স্বয়ং) দায়িত্ব গ্রহণ করে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। দাঁড়কা বীরভূমের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সে গ্রামে উপস্থিত হয়ে

তিনি জানতে পারেন যে তথাকার ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অবধি শিক্ষকতা করেছিলেন সুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। তখন পর্যন্ত রঙ্গলাল তার কাছে কেবলমাত্র একজন সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত। রঙ্গলাল দাঁড়কা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেও বাস করতেন দাঁড়কার লাগোয়া গ্রাম লাঘোষায়। এ যাত্রায় তাই তিনি লাঘোষাতেও গমন করেন এবং সেখানকার রঙ্গলালে সমাধিতে স্থাপিত স্মৃতি-ফলক পাঠ করে সর্বপ্রথম অবগত হন যে—রঙ্গলালই "বিশ্বকোষ" গ্রন্থ রচনার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গলাল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েন এবং বহু পরিশ্রম করে তিনি রঙ্গলাল ও তার পরিবার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ করেন। রঙ্গলাল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ উদ্দেশ্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রাহুতা গ্রামেও পদার্পণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়—রঙ্গলাল সম্পর্কে যে সমস্ত লোক বিশেষ করে তাঁর আত্মীয় স্বজন কিছু না কিছু সংবাদ দিতে পারেন বলে মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলাম। একাধিকবার আমি তাঁর বীরভূমের কুড়মিঠা গ্রামের "সারদা কুটির"-এ গিয়েছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা তুলি এবং বলি যে রাহুতা গ্রামের নিকটেই আমার বসত বাটি। শুনে তিনি বললেন,— "রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ দুই ভ্রাতা* বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল। তাঁদের

* ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রঙ্গলালের মধ্যম ভ্রাতা। চুঁচুড়া ও তেলিনীপাড়া স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে আর্থিক অনটনের কারণে কিছু কালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। উড়িষ্যায় কিছুকাল পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেন। এই সময় তিনি উড়িয়া ভাষা সম্যকরূপে আয়ত্ত করেন। "উৎকল শুভকরী" নামে উড়িয়া ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পুলিশের চাকুরী ত্যাগ করে দেশে ফিরেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে উত্তর প্রদেশের কৃষিবিভাগের বিভিন্ন পদে চাকুরী করে সর্বশেষ কলিকাতার যাদুঘরে সহকারী কিউরেটার-এর পদে বহাল হন। এই সময়ে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে তৎকালীন ভারত সরকার তাঁকে বিলাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এক প্রদর্শনীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ফরাসী ভাষাও সম্যকরূপে আয়ত্ত করেছিলেন।

স্থতিকাগার রাহুতা—বঙ্গীয় সাহিত্যের তীর্থভূমি"। বাঙ্গালী মাত্রই এই "তীর্থভূমির মর্যাদা রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকা উচিত"—এই দুই অসাধারণ প্রতিভাধরের জন্য গর্ব অনুভব করা উচিত।' দুর্ভাগ্য আমাদের, রাহুতা গ্রামের এই দুইজন অসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছি। প্রসঙ্গত রঙ্গলাল ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে অনেক কথা শোনালেন। তাঁদের সম্পর্কীয় তথ্যাদি যা তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং পত্র, পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে যা' প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু আমাকেও দিলেন। তাঁর প্রদত্ত সেই অমূল্য তথ্যাদির ভিত্তিতেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

॥ ৩ ॥

তেজস্বীতার জন্য খ্যাত একটি প্রাচীন বংশে রঙ্গলালের জন্ম। তাঁদের বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন।—"ইঁহারা খড়দহ মেলের কুলীন, কামদেব পণ্ডিতের** সন্তান।" এইবংশ ত্রিকুল থাক নামে পরিচিত।

বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। "সংসদ বাঙ্গালী চরিত অভিধান"—গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—"তিনি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক।" বঙ্গীয় ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনতিক্রম্য। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনা "Art manufacturers of India", কঙ্কাবতী, পাপের পরিণাম, ফোকলা দিগম্বর, ডমরু-চরিত, ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, মজার গল্প ইত্যাদি। সাম্প্রতিক কালের "ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী"-র সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,—"বাংলা সাহিত্যের একজন Major বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের হেতু।" ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীধামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

**কামদেব পণ্ডিত—তিনি ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—খড়দহ মেলের শ্রেষ্ঠ কুলীন ও খড়দহবাসী। কামদেবের স্ত্রী রাধারাণীর পিতা কমলাকর পিপলাই মাহেশে জগন্নাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা—মতান্তরে জগন্নাথ বিগ্রহের প্রথম সেবায়েত। কামদেব পণ্ডিতের চেষ্টাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের মহানায়ক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহে বাস করতে সম্মত হয়েছিলেন।

রঙ্গলালের বংশ ত্রিকুল থাক নামে পরিচিত হবার কারণ সম্ভবত এই যে—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন রাজশক্তিপুষ্ট ইসলাম ধর্মের প্রাবল্যে ভেদাভেদ জর্জরিত এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজ নিতান্তই বিপন্ন অথচ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণেরা এই সর্বনাশা সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—ঠিক সেই সময়ে রাহুতার এই মুখোপাধ্যায় বংশের এক পূর্বপুরুষ শ্রীনন্দনন্দন মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের নীচ-কুলোদ্ভবা এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে সন্নিহিত ভট্টপল্লী সহ দেশের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সমাজের বিচারে শ্রীনন্দনন্দনের কুল কলঙ্কিত হয় এবং তিনি পতিত বলে ঘোষিত হন। হিন্দু সমাজের বৃহত্তর সমস্যার কথা চিন্তা করে শ্রীনন্দনন্দন অন্তত ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী চূর্ণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দুঃসাহসিক কাজ সম্পাদন করলেন সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে তিনি তাঁর সেই কাজের যৌক্তিকতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বরং সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তাঁর দুই অকৃত্রিম বন্ধু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়—তিন কুলের এই তিন বন্ধু ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন যে তাদের এই মিলন একটা পৃথক সমাজ বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে এই তিন বংশের মিলিত ত্রিকুল থাকের মধ্যেই তাঁদের পুত্র-কন্যাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবে। তাঁদের এই নূতন সমাজে বহুবিবাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত হল এবং পুত্র কন্যাদের বিবাহে অর্থের আদান-প্রদান করা কোন ক্রমেই চলবে না। প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে রাহুতার যে মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রীনন্দনন্দন সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল কামনায় বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে অকারণ ভেদাভেদ তিরোহিত করতে গঙ্গাবারিস্পর্শে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন রঙ্গলাল সেই তেজস্বী ব্যক্তিরই অধঃস্তন পুরুষ।

রঙ্গলালের পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় এবং মাতা ভবসুন্দরী দেবী। তৎকালীন প্রথানুসারে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে শিশু রঙ্গলালের বিদ্যারম্ভ হয়, পরে স্থানীয় বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজী বাংলা শিক্ষা করে তিনি পুরুলিয়া চলে যান। সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করতেন খুল্লতাত শশীশেখর বন্দোপাধ্যায়। তাঁরি তত্ত্বাবধানে রঙ্গলাল ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা করেন। এই সময়ে রঙ্গলালের পারিবারিক

বিপর্যয় দেখা দেয়—তার পিতা ও মাতা উভয়ই পরলোক গমন করেন। রঙ্গলালরা ছিলেন পাঁচ ভ্রাতা—তিনিই সর্বজ্যেষ্ঠ। তাই সংসার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করার উদ্দেশ্যে রঙ্গলালকেই এগিয়ে আসতে হল। ফলে পুরুলিয়ার বিদ্যাধ্যয়ন ত্যাগ করে তাঁকে বালুটি গ্রামের (বালির পশ্চিম দিকের এক গ্রাম) ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হয়। ইহার কিছুদিন পর শিক্ষকতার কাজ নিয়েই তিনি চলে আসেন চন্দননগরে—এখানে তিনি গণিত ও সাহিত্য পড়াতেন। ঐ সময়ে বৈদ্যবাটি নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের কন্যা জ্ঞানদা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বিবাহের পর রঙ্গলাল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল অবধি কষ্ট ভোগ করেন। রোগে ভুগে চিকিৎসা বিদ্য সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং তাঁর চিকিৎসক ডাঃ রামচন্দ্র সাধু ও তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রামচন্দ্র সাধু ও তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ হাঙ্গার্ডের নিকট এলোপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। শুধুমাত্র এলোপ্যাথি নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট রইলেন না। তৎকালীন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও ডাঃ বেরিণী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতেও সবিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। আমাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অবধি ছিল না। তৎকালীন সর্বজন পরিচিত সুবিখ্যাত কবিরাজ লোকনাথ কবিরঞ্জনের নিকট তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। স্বভাবে রঙ্গলাল ছিলেন নৈষ্ঠিক সাধক—বিশেষ করে বিদ্যার্জন ও সাহিত্য চর্চায়। একবার কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সে বিষয়ের কূল-কিনারা না করে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন না। চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ পরিশ্রম ও অপ্রতিরোধ্য উদ্যমসহকারে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ পদ্ধতির চিকিৎসায় সেকালের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল জ্ঞান আয়ত্ব করেন। পরবর্তী জীবনে এই চিকিৎসা ব্যবসায়ের মাধ্যমেই তাদের বংশানুক্রমিক আর্থিক সঙ্কটের সমাধান করে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠার পর রঙ্গলাল চলে আসেন ইছাপুরে একটি বিদ্যালয়ে, এখানে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত। শিক্ষক হিসাবেও তিনি

বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। যখন যে বিষয়ে ডাক পড়েছে সে বিষয়ের দায়িত্ব নিয়েই তিনি অক্লেশে শিক্ষকতা করেছেন।

অনেক আশা করে তিনি বাড়ীর কাছে ইছাপুরের বিদ্যালয়ে চাকুরি নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এখানে তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া যেন নূতন করে বল পেল—দ্রুত গতিতে শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। হিতৈষিরা পরামর্শ দিলেন—মফঃস্বলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। কলিকাতা অধিকতর নিরাপদ স্থান। তাই ম্যালেরিয়া হতে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে বাসস্থান পরিবর্তন করে কলিকাতায় যাওয়া উচিত। বন্ধুজনের পরামর্শে তিনি ইছাপুর স্কুলের শিক্ষকতায় ইস্তাফা দিয়ে কলিকাতায় উঠে গেলেন। সেখানে কাজ নিলেন টাকশালে। কিন্তু কলিকাতায় যেয়েও তিনি রোগ থেকে মুক্তি পেলেন না। অবশেষে রোগ মুক্তির আশায় তিনি দেশত্যাগী হলেন। চলে গেলেন উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে। গাজীপুরের আবহাওয়ায় রঙ্গলাল কিছুদিনের মধ্যেই দূরারোগ্য ম্যালেরিয়া হতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়ে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পান। মনে ভাবলেন গাজীপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন। তাই সেখানে চেষ্টা করে পুলিশ বিভাগে একটা চাকুরী জোগাড় করে নিলেন। কিন্তু পুলিশের কাজ তাঁর ভাল লাগল না। কিছুদিন পর পুলিশের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বীরভূম জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টার তাঁর আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় সে জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম দাঁড়কার ইংরেজী বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন। এই দাঁড়কা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় তিনি পার্শ্ববর্তী লাঘোষা গ্রামে স্থায়ীভাবে নিজের বাসস্থান গড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই লাঘোষাতেই দেহরক্ষা করেছিলেন।

গাজীপুরে থাকাকালীন সময়ে রঙ্গলাল বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সেখানে সংস্কৃত চর্চায় গভীর ভাবে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। আশ্চর্য প্রতিভা এই রঙ্গলাল। যখন যে বিষয় আয়ত্ব করার তিনি সংকল্প করেছেন, তা সম্পূর্ণ আয়ত্ব না হওয়া পর্যন্ত কখনো ক্ষান্ত হননি। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তাঁর এতই প্রবল ছিল যে কোন প্রতিকূল অবস্থা-ই তাঁর সে পবিত্র সঙ্কল্পকে ব্যাহত করতে পারত না। রোগজীর্ণ দেহ, মাতাপিতার মৃত্যু জনিত শোক বা পারিবারিক শোচনীয় আর্থিক সঙ্কট কোন কিছুই বিদ্যার্জন ক্ষেত্রে তাঁর বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। গাজীপুরে তাঁর জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টার বিবরণ দিতে যেয়ে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—

"গাজীপুরে অবস্থিতি কালে তিনি (রঙ্গলাল) সেখানকার জমিদার ও পণ্ডিত ঠাকুর দাস দত্তের নিকট পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পানিনির অষ্টাধ্যায়ীর কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ঠাকুর দত্তের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মল্লীনাথকৃত টীকা দেখিয়াছিলেন। কানপুরের বৃদ্ধ মন্নূলাল শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতার জ্ঞানেশ্বরী টিকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কানপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মাবর্তের পণ্ডিত গিরিজা দত্ত শাস্ত্রী, নয়াগাঁয়ের বৃদ্ধ মন্নূলাল ও যুবক মন্নূলাল তাঁহাকে সিদ্ধান্ত কৌমুদী, বামন জয়াদত্তের কাশিকা, কাত্যায়ন বররুচি—কৃত বার্তিক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং বিবিধ পুরাণ ও কাব্য নাটকাদি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।"

রঙ্গলালের এই বিদ্যানুরাগই সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁকে সুপ্রতিষ্টিত করে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর দান হিসেবে—"বৈরাগ্য বিপিন বিহার", "শরৎশর্শী", "বিজ্ঞান দর্শক", "হরিদাস সাধু" (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ রাহুতা গ্রাম হতে প্রকাশিত হয়েছিল), "চিত্ত চৈতন্যোদয়" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিদ্বৎ সমাজে সবিশেষ আদৃত হয়েছিল। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাপচান্দ রঙ্গলালের কাব্যসৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে "কাব্যরত্নাকর" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

॥ ৫ ॥

রঙ্গলালের একটা অসাধারণ গুন ছিল—তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। সেকালে কবিতা পরিবেশনের একটা রীতি-ই ছিল—সুধীজনের সমাবেশে প্রশ্নোত্তরছলে মুখে মুখে কবিতা বা গান রচনা করে দেওয়া। রঙ্গলাল যখন চন্দননগরের শিক্ষক তখন তিনি যুবক। তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ। সেই সময়ে ভূ-কৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মাঝে মাঝে তাঁদের চন্দননগরের বাড়ীতে এসে সাময়িকভাবে বাস করতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী। চন্দননগরে এলেই তাঁর বাড়ীতে সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগীদের বৈঠক বসত। একদিন ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে যথারীতি সঙ্গীত ও সাহিত্যের আসর বসেছে। সেদিনের বিশেষ আকর্ষণ হল—কলিকাতা হতে এসেছেন প্রসিদ্ধ কবি গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালও সেই সভায় উপস্থিত হলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সভায়, তাঁকে দেখা মাত্রই ঘোষাল মহাশয় পরম

আগ্রহে রঙ্গলালকে একজন 'সুকবি' বলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবি গোপাল চন্দ্র মুখে মুখে গান রচনা করে সভাস্থ গায়ককে গাইতে দিলেন। গানটির পদ—

"রাইলো তোমার কালো কিসে ভাল লাগে।
কালো বরণ বাঁকা গড়ন
কুল মজালি তার সোহাগে॥
চম্পক জিনি তোমার বর্ণ
তুলনা যার হয়না স্বর্ণ
খুঁজে দেখ তন্ন তন্ন কার লাবণ্য তোমার আগে॥
শ্যাম কি সখি তোমার তুল্য
কোন গুনে তার এত মূল্য
কি দেখে তোর নয়ন ভুলল
মরলি কালের অনুরাগে॥"

গান সমাপ্ত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলাল দাঁড়িয়ে গেলেন গোপাল চন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গলাল রচনা করে যেতে লাগলেন,

"কালোর রূপে জগৎ আলো।
আমার শ্যামের রূপে জগৎ আলো॥
সে হয় কুৎসিত কিসে মনে যারে লাগে ভালো॥
ভালবাসার অনুরাগে,
ভালবাসায় ভাল সবই—
কালোরে না লাগে কালো॥
নিয়ে আমার যুগল আঁখি
শ্যামের পানে চাহ দেখি,—
ভাল লাগে কি কালো লাগে
আমার চোখে দেখে বলো॥

(লাঘোশা নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট হতে গান দুটি ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করেছিলেন)

গান রচনায় রঙ্গলালের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন সেকালে গানের মজলিসে রঙ্গলাল রচিত গান পরম সমাদরে গীত হত। দেশময় ভিক্ষুক, বাজিকর প্রভৃতিরা রঙ্গলাল রচিত গান গেয়ে ভিক্ষা

করত। সে সমস্ত গানের বেশীর ভাগই আজ হয়ত আর উদ্ধার করা যাবে না। জানা যায় রঙ্গলালের কবিতা পূরণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তদানিন্তন স্কুল পরিদর্শক স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। হাস্যোদ্দীপক গান রচনাতেও তিনি অভ্যস্থ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল লিখেছিলেন—,

"বেঁচে গেলুম অ'লো দিদি একাদশীর দায়ে।
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে॥"

(সংসদ বাঙালী চরিত অভিধান)

রঙ্গলালের সাহিত্য কীর্তি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু "বিশ্বকোষ" রচনার পরিকল্পনা ও তার বাস্তব সূচনাই সম্ভবত রঙ্গলালের সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে—সেই মহান কীর্তির স্রষ্টাকে আজ দেশবাসীর কাছে নূতন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

॥ ৬ ॥

১২৭৮ হতে ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রঙ্গলাল দাঁড়কা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিক্ষকতার সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসাও করেছেন। সেই সময়ে বীরভূম জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে। ইতিপূর্বে রঙ্গলাল নিজেও এ রোগে মারাত্মক ভাবে ভুগেছেন—বলা চলে যমের দুয়ার হতে ফিরেছেন। তাই এই রোগ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন প্রচুর তেমনি এ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশলও তিনি আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন তৎকালীন সুবিখ্যাত চিকিৎসকদের নিকট হতে। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা তখন সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার ছিল। ম্যালেরিয়া দমনের কার্য্যকর কোন ঔষধ মানুষের হাতে ছিল না—এ ব্যাপারে মানুষ অনেকটা অসহায় ছিল। মহামারী আকারে এ রোগ দেখা দিলে মানুষ তখন স্থানান্তরে যেয়ে আত্মরক্ষা করত—সমৃদ্ধ জনপদও জনশূন্য হয়ে পড়ত।

রঙ্গলাল পাল্কী করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। তিনি ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যখন সর্বাধিক ব্যস্ত তখন এ রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঔষধ 'কুইনাইন' আবিষ্কৃত হয়। ঔষধটি জনসাধারণের কাছে

অপরিচিত। কিন্তু বহু টাকার বিনিময়ে রঙ্গলাল তাঁর অঞ্চলে কুইনাইন আমদানী করে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় অভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করেন। দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল—রঙ্গলাল সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—তিনি যমের হাত থেকেও মানুষকে কেড়ে নিয়ে আসতে পারেন। চিকিৎসা ব্যাপারে রঙ্গলাল এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে—শেষ পর্যন্ত তাকে শিক্ষকতার কাজও ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে রঙ্গলাল প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অর্থ তাঁর প্রয়োজন ছিল—তা' তিনি অকল্পিত পরিমানে সংগ্রহ করলেন কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। স্বভাবে তিনি বিদ্যানুরাগী—কেবলমাত্র অর্থের মালিক হয়ে তিনি তুষ্ট থাকবেন কি করে বরং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে জ্ঞানের প্রসার প্রচেষ্টাই হবে তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি এবার "বিশ্বকোষ" নামীয় এক বিপুলকায় অভিধান গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনের এক দুঃসাহসিক কাজে মনোনিবেশ করলেন। এ কাজের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও পাণ্ডিত্য উভয়ই তাঁর রয়েছে। সাহিত্য কীর্তি-সৃষ্টি কার তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও অর্থের সদ্ব্যবহার করতে চান—দেশের এক বিরাট প্রয়োজন মিটাতে চান। তাই বীরভূম থেকে ছুটে এলেন কলিকাতায়—স্থাপন করলেন সর্বাঙ্গ-সুন্দর ছাপাখানা। প্রকাশিত হতে লাগল বঙ্গসাহিত্যের বিস্ময় 'বিশ্বকোষ'। অদম্য উৎসাহ ও অমানুষী পরিশ্রম করে চলেছেন রঙ্গলাল—সহায়তা করছেন সহোদর ভ্রাতা সুসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড ২২ অধ্যায়ে সুচারুরূপে সমাপ্ত হল। এই সময়ে রঙ্গলাল দেখলেন যে—কলিকাতায় ছাপাখানা চালান অসম্ভব—অজস্র লোকসান হচ্ছে। এ ভাবে বেশীদিন চললে 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ ত হবেই না তিনিও সর্বসান্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু সমস্যার সম্মুখে নুয়ে পড়ার লোক নন রঙ্গলাল। তিনি ছাপাখানা তুলে নিয়ে এলেন স্বগ্রাম রাহুতায়। কাজ আবার চালু হল। এখানে এসেও আর এক সমস্যা দেখা দিল। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ চলে গেলেন বিলাতে। প্রধান সহযোগীর অভাবে আবার "বিশ্বকোষ" প্রকাশন বন্ধ হয়ে গেল। তখন নিরুপায় হয়ে মনের দুঃখে রঙ্গলাল ফিরে গেলেন লাঘোবায়—আবার শুরু করলেন চিকিৎসা ব্যবসা। কিছুকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত থেকে ফিরে এলে রঙ্গলাল রাহুতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। উভয় ভ্রাতা গভীরভাবে পরামর্শ করে দেখলেন যে কেবলমাত্র তাঁদের চেষ্টায় 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলন ও প্রকাশনের মত বৃহৎ কাজ সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এই সময়তে নগেন্দ্রনাথ

বসু, মাত্র ১৯ বৎসরের এক বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ যুবক রাহুতা এসে মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেন। রঙ্গলাল নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে আশান্বিত হলেন। যে ভাবেই হোক—তাঁর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন হোক একমাত্র এই আশায় রঙ্গলাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের স্বত্বও ছাপাখানা নগেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলেন। বলাবাহুল্য নগেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২২ খণ্ডে সাতাশ হাজার পৃষ্ঠায় 'বিশ্বকোষ' প্রকাশন সম্পন্ন করেন। রঙ্গলালের হস্তে যে মহান কীর্তির সূচনা তাহাই নগেন্দ্রনাথের হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। বিশ্বকোষের মাধ্যমে যে ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি রঙ্গলালের প্রাপ্য ছিল অবস্থা বিপর্যয়ে তাহাই নগেন্দ্রনাথ বসুর অতুল সৌভাগ্যের কারণ হল।

৭ ॥

রঙ্গলাল মুখ্যত আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তদুপরি তাঁর পুত্রাদিও ছিল না। ফলে রাহুতা তথা শ্যামনগর অঞ্চলের জনসাধারণ রঙ্গলালের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করার বা তাঁর অসামান্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আর সে কারণেই হয়ত ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যখন রঙ্গলাল সম্পর্কীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাহুতা গ্রামে আসেন তখন অনেকটা বিফল মনোরথ হয়েই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল —রঙ্গলালের জন্মস্থানে এসে তাঁর সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেননি। রঙ্গলাল সম্পর্কে তাঁর গ্রামবাসী তথা দেশবাসীর সে উদাসীনতা কালের ব্যবধানে আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রের তিন সাধক—"অন্নদা মঙ্গলের ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, "বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তক:" রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গ-সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব উদ্ভটরসের স্রষ্টা রঙ্গলালের সহোদর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ জন্মসূত্রে রাহুতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতচন্দ্র জীবন সায়াহ্নে দীর্ঘকাল গঙ্গা-তীরবর্তী রাহুতার সন্নিহিত মূলাজোড়ে বাস করেছিলেন। এই তিন সাহিত্য সাধকের অমূল্য সম্পদে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ।

যাদের দানে ও সাধনায় দেশ ধন্য হয়—জাতি সমৃদ্ধ হয় তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ তীর্থ-মর্যাদার অধিকারী। জাতীয় স্বার্থে সে সমস্ত পুণ্যস্থানের মর্যাদা রক্ষা করা প্রয়োজন—যাতে অনাগত দিনের সন্তানেরা তাদের সক্ষম পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সুযোগ পায়—তাদের অতন্দ্র-সাধনার জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গঠনের আদর্শ খুঁজে পায়। বর্তমান যুগে স্মরণ্য-ব্যক্তিদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ উপযুক্ত মর্যাদায় সংরক্ষণের রীতি আছে—বৎসরান্তে সে সমস্ত স্থানে প্রয়াত সাধকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়। কিন্তু এই তিন সাহিত্য সাধকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। শ্যামনগরে ভারতচন্দ্রের নামে একটি পাঠাগার আছে। রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের জন্মভিটা বা ভারতচন্দ্রের জীবন-সায়াহ্নের গাঙ্গেয় নিবাস মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি—নিঃসন্দেহে ইহা আমাদের জাতীয় দীনতার পরিচায়ক। আমাদের উদাসীনতার ফলে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ আজ অবলুপ্তির পথে ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক—ইহা আমাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

[জাতক, পূজা সংখ্যা, ১৩৯১ হতে]

সেবাব্রতী জীবন প্রেমিক রঙ্গলাল

স্মৃতি মোহন সরকার

যুগে যুগে কত কবি, কত সাহিত্যিক, আউল-বাউল, বৈষ্ণব সাধক আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের এই বীরভূমের রাঙা মাটির বুকে, কে তার সঠিক হিসেব রাখে।

আবার কত সাধক এই রাঙাভূমিতে জন্ম না নিয়েও, বীরভূমকেই তাঁদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে মনে-প্রাণে বরণ করে, আপন সাধনার নির্যাসটুকু এই মাটিতে নিঃশেষে মিশিয়ে রেখে চির বরেণ্য হয়ে রয়েছেন আমাদের কাছে। এমনিই একজন হলেন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ, 'বিশ্বকোষ প্রবর্তক' 'কাব্যরত্নাকর' রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। বিচিত্র আর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রঙ্গলাল। যদিও স্থানীয় ভাবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল 'মাস্টার' আর রংলাল ডাক্তার' নামে।

জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার সন্তান। কর্মসূত্রে তাঁর জীবন-প্রবাহ বড় বিচিত্রগামী হয়েছিল। অবশেষে ১২৭০ বঙ্গাব্দের এক শুভলগ্নে সুদূর চন্দন নগর থেকে বীরভূমের দাঁড়কা গ্রামে শিক্ষক হিসেবে রঙ্গলালের শুভা-গমন ঘটে। কালক্রমে, ময়ূরাক্ষী বিধৌত এখানকার সরস মাটির তিনি একান্ত আপনজন হয়ে উঠলেন।

অধিগত চিকিৎসাবিদ্যা, হৃদয়ে সুপ্ত সাহিত্যপ্রেম নিয়ে সগৌরবে এসেছিলেন সেদিনের সেই শিক্ষক রঙ্গলাল—মানব প্রেমের মূর্তিমান প্রতিভূ হিসেবে।

বীরভূমের সাহিত্য গগনে তখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে দীপ্তিময় হয়ে রয়েছেন দাঁড়কা থেকে মাত্র ৩/১০ মাইল দূরে কীর্নাহার গ্রামে 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' কাব্যের কবি স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং চহটার আপাত নীরস মাটির কোলে ভক্ত কবি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হলো ১২৭৬ বঙ্গাব্দে।

অদূরে ময়ূরাক্ষীর ওপারে, পাঁচ গুহুটিয়ার রেশম কুঠি তখন প্রাণ চঞ্চল এবং কর্মমুখর। ওখানকার খ্রীষ্টান গীর্জায় খ্রীষ্টবন্দনার গান, সন্নিহিত গ্রামগুলির হিন্দু মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার বাদ্য, মসজিদের আজান ধ্বনি এবং বৈষ্ণব আখড়া গুলির শ্রীখোল করতাল মুখর এই পরিমণ্ডল জীবন প্রেমিক রঙ্গলালকে করল বিমোহিত।

গুনুটীয়া রেশম কুঠির পরিচালক জন চিফ ছিলেন একজন সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ তাঁর আহ্বানে একদিন কুঠির প্রাঙ্গনে বঙ্গখ্যাত গায়ক কণ্ঠ মুখুজ্জের (নীল কণ্ঠ মুখোপাধ্যায়) কৃষ্ণযাত্রার আসর বসল। হেতমপুর রাজ বাড়ীর বায়না সেরে কণ্ঠ মশায় এলেন গুনুটীয়ায় তাঁর দলবল নিয়ে।

যথাসময়ে শুরু হয়ে গেল পালা গান। অকৃপণ চাঁদের আলো আর কুঠির বাগানের আম আমলকী অশোকের সুরভি জড়ানো বাতাস একাকার হয়ে একটি স্বর্গীয় শোভা রচিত হয়েছিল সেদিন। দূরবর্তী বহু গ্রামের যাত্রামোদী মানুষ একত্রে সেই যাত্রা গান উপভোগ করে গেছেন।

দাঁড়কা থেকে রঙ্গলাল মাস্টারও আমন্ত্রিত হয়ে সুহৃৎ-প্রতিম ওই গ্রামেরই পঞ্চানন রায় মশায়কে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই যাত্রা দেখবার জন্যে। কুঠির দেওয়ান আবাডাঙ্গা গ্রামের রামলাল মুখোপাধ্যায় ওঁদের সকলকে আসরে বসিয়ে দিয়েছিলেন খাতির করে। তাঁর আশে পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরাও সবাই এতদঞ্চলে তৎকালীন গণ্যমান্য। যেমন শাঁখপুর থেকে এসেছিলেন জমিদার বিপ্রদাস সরকার, ঝলকা গ্রামের ত্রিভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনগর থেকে নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায়, গুনুটীয়ার নীলাম্বর রায় প্রমুখ সব বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেদিন।

স্বীয় গুরু, গোবিন্দ অধিকারীর চরণ বন্দনা করে মধুকণ্ঠী নীলকণ্ঠ তাঁর গান শুরু করলেন:

হরি, তোমার অপার মহিমা কী দিব তুলনা তাহারই.

(ও শ্যাম গৌর চাঁদ) ছেড়ে বৃন্দাবান মথুরা স্বজন হয়েছে দ্বারের দ্বারী।'

দর্শক আসনে ভক্ত রঙ্গলাল তন্ময়, তদগত চিত্ত।

তাঁর সেদিনের সেই মনোহারী চিত্রটিকে আর এক বিদগ্ধ মানুষ, লাভপুর যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একদা প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য শশিভূষণ নিয়োগী (গুনুটীয়া) তাঁর দিন পঞ্জীতে বিধৃত করে রেখে যান।

এমনি ধরণের নানান ঘটনাক্রমে ভক্ত প্রবর রঙ্গলাল এখানকার অজস্র ভক্তের 'হৃদয়ের মানুষ' হয়ে উঠলেন। আর রোগ ক্লিষ্ট, জরা পীড়িত দরিদ্র মানুষ গুলিই রঙ্গলালের হলো প্রিয়জন। এবং তাদেরই মুক্তি সাধনায় তিনি হলেন পাগল সাধক।

সেবাধর্মের সঙ্গে বাণী সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ রঙ্গলালের জীবন বৃত্তের পূর্ণতা এইখানেই।

অবশেষে দাঁড়কা সীমানাবর্তী লাঘোষা গ্রামের মাটিতে শেষ শয্যা গ্রহণ করে ময়ূরাক্ষীর সরস পলিতে নিলেন স্বেচ্ছা সমাধি।

এই হলেন সেবাব্রতী, জীবন প্রেমিক রঙ্গলাল।

আমাদের হৃদয়োৎসারিত শ্রদ্ধা কুসুমে যেন চিরদিন তাঁকে আমরা এমনি করে অঞ্জলি দিয়ে যেতে পারি।

রচনা সূত্র :—১। শাঁখপুর গ্রামের স্বর্গীয় পরেশনাথ সরকালের ভিক্টোরিয়া প্রতিকৃতি মণ্ডিত পার্শি ভাষায় লেখা দিনলিপি।

২। প্রবন্ধোল্লিখিত স্বর্গত শশীভূষণ নিয়োগীর পৌত্র গুস্কুটীরা নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীচিত্তরঞ্জন নিয়োগী সংরক্ষিত তদীয় পিতামহের লেখা কাগজ পত্র।

প্রসঙ্গ ঃ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

ড. অমলেন্দু মিত্র

গ্রন্থপঞ্জীতে সাহিত্যসেবীদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সাহিত্য সেবীর লেখার সঙ্গে আমরা পরিচিত। শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ সাহিত্য সাধক শুধুমাত্র নামে টিকে আছেন। তাঁদের সাহিত্য কর্ম, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার বা সাহিত্য পরিষদে খোঁজ করলেও সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সাহিত্যসেবক মাত্রেই যে প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা নয়। অল্পশক্তি, মধ্যশক্তি শক্তিমান ও অতি শক্তিমান—লেখকদের এই কটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অতি শক্তিমান লেখক ছাড়া, সবাই ইতিহাস হয়ে যান। আমাদের দেশে গ্রন্থকারদের যাবতীয় রচনার পুরো পরিচয় সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের রেওয়াজ নেই। হাজার হাজার ছোট বড় নানা সাময়িক পত্রে, প্রকৃতই মূল্যবান বহু রচনা ছাপা হয়ে থাকে। সেগুলি আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। দেশের সরকার এইকাজ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে করতে পারেন। করতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রকৃত শিক্ষাদরদী, বা সাহিত্যামোদীর সংখ্যা কম। বেশীরভাগই শুধুমাত্র চাকরি করেন। ডক্টরেট ডিগ্রী না পেলে প্রমোশন হবে না বা প্রেষ্টিজ থাকবে না ; তাই যেনতেন-প্রকারেণ, যা তা' খাড়া করে তদ্বিরের জোরে ডিগ্রী জোগাড় করে আত্মগরিমায় গদগদ হয়ে ওঠেন। গণ্ডুষ জলে শফরী-নৃত্য এখন সাহিত্য সাধনার দৃশ্যমান চিত্র। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সমসাময়িক কালই, প্রাধান্যলাভ করে থাকে এবং সমাজের সবকিছুকেই রাজনীতির বিভিন্ন রঙের চশমার মাধ্যমে দেখা হয়। তাই দেখতে পাই যথার্থ প্রয়োজনীয় অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ বা পুনর্মুদ্রণের জন্য সরকারী আনুকূল্য মেলে না। মেলে দলের শ্লোগানবাহী রাজনৈতিক তকমাধারীর নিম্নমানের গ্রন্থ। কালের ধাপে সে সমস্ত বই কোনোদিনই টিকে থাকবে না তো বটেই, সমসাময়িক কালেও তাদের আদর হয় না। সাহিত্যে সমঝদার লোকের অভাব। পরকে মূল্যায়ান করার প্রবৃত্তি নেই। আত্মগরিমায় সকলেই গদগদ। স্বয়ম্ভু হয়ে উঠছে অযোগ্য অপদার্থরা। বেতার দূরদর্শনে ব্যক্তি পূজা ও অক্ষমদের বাহবাস্ফোটন চলছে। আমরা ক্লীবের দল তাই দেখে আহ্লাদে বিভোর হচ্ছি। সংস্কৃতি বলতে বুঝছি, সিনেমা, হিন্দী গান, খেলা ও বিকৃত কামগুঞ্জনকে।

দেশের এইরকম যখন অবস্থা তখন গতযুগের অমিত শক্তিধর কোনো সাহিত্য সেবীর মূল্যায়নের প্রচেষ্টা অসমসাহসিকতার লক্ষণ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার কাজে যাঁরা ব্যাপৃত হতে চান, সমাজ তাঁদের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি দেবে না—কেউ তাঁদের কার্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত কাজের কাজ করতে এগিয়ে আসবেন না। প্রতিষ্ঠাবানদের দ্বারস্থ হলে তুলাইন শুভেচ্ছাবাণী, (যা ফাঁকা আওয়াজেরই নামান্তর), অনুকম্পাভরে লিখে উদ্যোক্তাদের ধন্য করে থাকেন। এ মনোবৃত্তি ঘৃণ্য।

বীরভূম সাহিত্যসাধকদের দেশ। কত সাহিত্যসাধক অজ্ঞাত বনফুলের মত আপন মনে পথিপার্শ্বে ফুটে সাধ্যমত সৌরভ বিলিয়ে মাতৃভাষার যথাসাধ্য পূজা করে গেছেন, তার পুরো সালতামামি আজও করা হয়নি। এমনিই এক বিস্মৃত প্রায় বিলুপ্তনামা কবি-সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমের মাটিতে সাহিত্যের সৌরভ বিলিয়ে গেছেন। সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা প্রকাশ হত। ছাপা হয়েছিল অনেকগুলি গ্রন্থ। সেকালে সুনাম অর্জন করেছিলেন সমালোচকদের দৃষ্টিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রঙ্গলালের বই বা লেখা আজকের দিনে কেউ পড়তে চাইলেও পড়তে পাবে না। কারণ আমরা হতভাগ্য দেশের অধিবাসী। অবশ্য পড়তে চাইবেও না কেউ। তাঁর গ্রন্থাবলী পুরস্কৃত হয়নি, সিনেমা দূর দর্শনের পর্দায় রূপায়িত হয়নি। সেজন্য তিনি অকুলীন। লেখা নিয়ে তিনি ব্যবসায়ে নামেননি।

বন্ধুবর জনাব সিরাজুল হক নিঃস্বার্থভাবে বীরভূমের লুপ্তপ্রায় সাহিত্য সাধকদের লোকসমক্ষে আনার দুরূহ পুণ্য ব্রত গ্রহণ করেছেন। এটা এ যুগে প্রকৃতই বিস্ময়জনক। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখার মত। ইতোমধ্যে তিনি কয়েকজন সাহিত্যসেবকের স্মৃতি তর্পণ করেছেন। এখন ব্রতী হয়েছেন রঙ্গলালের পরিচিতি লোকচক্ষুর গোচরে নিয়ে আসতে। তাঁর সহায় নেই; সম্পদ নেই। উন্মাদের মত বিশ্বভুবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন, রঙ্গলালের সাহিত্যকর্ম ও জীবনচরিত। জানিনে তিনি সফল হবেন কিনা। তবে আন্তরিকভাবে কামনা করি খ্যাতি পুরস্কার বিহীন এই কার্যে তিনি সফলতা লাভ করুন। বীরভূমবাসী হয়েও আমি রঙ্গলাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—সেজন্য কবির বিষয়ে কোনো কথাই লিখতে পারলাম না। এ অজ্ঞতার জন্য লজ্জা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই রঙ্গলাল যজ্ঞের হোতা বন্ধুবর সিরাজুল হকের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে বক্তব্য শেষ করছি।

A TOMB THAT IS UNIQUE

For lack of adoration of the vanerable a tomb of exceptional rarity remained uncared for seventy eight years past. The interred personage did not belong to any religious faith whose followers customarily bury their mortal remains. Yet, the tomb is similar to a conventional one. The main structure is one foot and six inches high above the surrounding ground. About the middle of the structure there is a shelf, about nine inches in height resembling a wooden box-type coffin. The tomb is ten feet and two inches long from North to south with a breadth of seven feet and ten inches. It is rectangular in shape, the head-side being the north. In the outer wall on this side is affixed a narble slab with inscriptions giving the identity of the deceased along with a couplet from the holy Upanishada—

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে—ভগ্নেপি তাদৃশম্ ।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপ বিরাজতে ॥

In English rendering the couplet means "The ethereal space inside an earthen pot remains unchanged enen when the pot is broken ; in similar manner the soul remains unaltered when the body, its container, meets with its end." The tomb is brick-built—duly constructed with brick, morter and cement. The existense of the tomb among a people who customarily

perform the last rites of their dead-bodies on the funeral pyre is astonishing of course, and an instance of unthought of exceptionality. Naturaly, the curious question as to where the tomb is situated and who is buried in it is likely to arise in the mind. The burial place is not a common grave-yard, and so there are no remains of ruined or dilapidated graves, brick-built or mind-built, around this tomb. The village is agriculture based and is inhabited by Hindus of different castes and muslims. It is divided in to different localities with small vacant spaces between them. The tomb is in the Hindu-locality but in the outskirt of the village avoiding closeness to human habitatious. It is situated beside a village—road running from North to the south. A few yards to its north and northeast there are small plots of agricultural land. To its south there is a dilafidated temple shadowed by bamboo clumps. Adjacent to the tomb on the west side there is a small pond compared to the envirionment the burial ground is some what open and covered with grass. From May-June to October-November in particular it remains covered with a sheet of green grass. The environment is calm and quiet, but absorbed in painful meloncholy. Dry and torn leaves blown off the nearby trees, by rain and storm of different seasons and whire storm of Chaitra (March-April) and the dust thrown up by the hooves of home-coming

herds of cattle and flocks of goat and sheep at dusk and wheels of earts keep the place unclean. Who is there to care for its cleanliness ? Yet, with what boundless love for humanity and avowed self-dedication in the service of mankind did the person buried here-in come here one day one hundred and twenty years ago from now, and passing his whole life in the service of people and medical treatment of ailing ones took his final rest in this soil at the end of his life. At some later date one of his nephews (brother's son) came here and finished off the tomb with brick and morter-work, and affixed the identifying marble slab to it. The tomb remains in that state till now. In the devastating flood of the Mayurakshi in 1978 the tomb was faced with the changcs of demage. The tomb reminds me of the American litterateur Nathemial Hawthworn's saying, 'A grave, wherever found, preaches a short and pithy sermon to the soul'. Such a philosophic statement sets men thinking meditating and investigating into it. And This kind of thought and inquisitiveness inspired the famous erudite scholar —Late Sahityaratna Harekrishna Mukhopadhyay, the author of 'Birbhum Bibarani' and his friend Late Kabi bhusan Rai Nirmalshib Bandyopadhyay Bahadur Natya-Vidya-Bharti, once a reputed actor on the theatrical stage to pay a visit to this holy shrine about sixty five years ago from now. The road to this place

at that time was very difficult for a journey and they had to reach the village in a bullockcart. As a result of this visit a short account of Rangalal was given in the second part of the book 'Birbhum Bibarani' written by the said Sahitya-ratna Later on, in his book 'Goura-Banga Sanskriti' a full chapter was devoted to the delineation of Rangalal, and this has provided us with the opportunity of knowing him beter, otherwise, inspite of being a man of versetile genius nothing about him except his mere name would remain unknown to the society of cultured persons. Yet, he did not find a place in the books dealing with the lives of his contemporary respectable poets and authors like Rangalal Bandhopadhyay. gogendranath Bidyabhusan, Akshaychandra Sarker, Indranath Bandyopadhyay and Nabinchandra Mukhopadhyay. It is...matter of deep regret. Be that as it may, why should he remain so unknown even in the present time, even after forty years of attainment of independence, when in every part of the country is evinced national awakening with arrangement for adoration of our venerable predecessors and celebration of commemoration functions for them. It is absent in this case only. Associations have been formed with the object of preservation of the memory and formal celebration of commemorative functions of the great sons of mother Bengal —of the ancient poets Chandidas, Jnandas, Kashiram,

Krittibas, Bharatchandra and others. Similar steps have been taken for the preservation of memory and celebration of annivesary functions of modren literary celebrities like Saratchandra and Bibhitibhusan. It is proper that so it should be. But an integral outlook in this matter is likely to endow it with the glory of perfection The Universities are open to unlimited research work on various subjects. The topic under discussion is a suitable subject for researeh. But so far no sign of any research-worker's eager attraction or earnest attention on this subject has been noticed. For the sake of truth, though unpleasant, it may be said that research work in modern times in influenced moostly by mercenary motives. All research workers are attracted to subjects which are likely to fetch plenty of money. Let the country be inundated by the flood of research work on Rabindranath ; let a section of litterateurs—larned poets and critics—render the discourse on Rabindranath's works into a merchandise of art to provide them with an opportunity of earning sizable in come. I shall cherish no envy for them. But do we not have any national duty towards those others who contributed profusely towards enriching our traditional wealth in the field of ancient history' culture, science, literature, education and sculpture to make them more interesting and entertaining to us ? Particularly towards those of them

who are reglected ? Here in lies the cause of our pain —the pang of incom pleteness So, in order to get rid of this pang of lack of completeness, an exhaustive national investigation is ersenlial.

As the title of this article is "the Tomb that is Unique" let me now proceed to discuss as to whose tomb it is and where it is situated.

This holy tomb commemotes Kavyaratnakar Rangalal Mukhopadhyay, the originator of 'Viswa-kosh' (the Bengali Encyclopaedia), a great ascetic and a physician as efficient as Dhannantari, the proverbial medical practitioner. He remains outside the scope of any book on the history of Bengali literature or treatise dealing with the lives and works of Bengali writers devoting a full chapter on each writer. In some of these books is seen the incidental mention of his mere name or a line or so written about him. Yet he was a reputed litteratur of the nineteenth century and a personage of multifarious activities of his time. In the person of a single individual he combined the qualities and variours activties of a poet-litterateur, a dramatist, a physician of proverbial efficiency, a 'Tan trik' devotee in spirtual life, a great ascetic and an uncommonly brave victorions soldier in his fight against dire poverty. In his famous novel "Aragyo-Niketan" the great novelist Tarasankar Bandyopa-dhyay has depicted an extra-ordinary character. Since

Rangalal was professionally a physician the realistic author Tara Sankar Babu selected his physician's role to suit his purpose and sketched if faithfully. The role depicted in the novel is 'Ranglal doctor'. While reading the novel one is likely to be led the think, 'Is the actual existence of such a man possible ? The character is surely fictitious !' No, it is not at all a creation of imagination. Shortly after the novel was published, Tarasankar Babu in reply to a correspondent query wrote to him, "The character is absolutely realistic, the person depicted was a man of flesh and blood, In my area (of Labpur) once there lived such a man as delineated in the novel." About a centenary ago, in a malaria-infested, educationally and culturally backword interior village, far off from the city Rangalal kept himself engaged not only in the medical treatment of ailing people, but also in intricate research on anatomical and physiological metters by procuring dead bodies of men and dessecting them in his own dessection-laboratory. Is there any other instance of a man born in a high brahmin family of a strictly conservative society of those days venturing to engage himself in such thriling activities, particularly living in a rural environment ? Rangalal was a physician well-versed in the art of finding out the time of death of patients and declaring it well in advance. His diclaration was infallible, even to the

point of indicating the exact time of death of the patient. On the other hand, he treated and was able to bring round patients suffering from various comple-cated diseases, the reports of which have passed into tradition. Yet, he did not rcceive education from any medical School, college or university ; he did not get any opportunity for such education. He was a self-made man who acquired all knowledge by his own efforts He was a devotee of wisdom relying on his un-aided personal efforts. It may be aptly said that he converted himself into an academy of learning.

There-after, Tarasankar Babu discribed the cloth-ing and dress, conveyance used for attending calls to patients' houses, appearance and manners indicating the impressive personality etc. of Ranglal doctor, who had adopted a rural abode in the following manner, "Ranglal doctor came from his northerly village dresesd in trousers of 'Tasar-'silk and a coat buttoned upto the throat with a pocket-watch suspended with a cord. He used to make these visiting trips in a palan quin ....He was the first physician to introdu e allopathic system of treatment in this locality (in 1278 of the Bangali Era). A phys'cian of wonderful skill and a man of genius he was." And in this description of his appearance of attractive personality we get the sketch of a healthy strong man of fair complexion

with piercing looks, shining in dividuality, unshakable boldness and tremendous self-reliance.

This self-reliance enabled him to reach the summit of self-realisation, so that he could tell in the verse composed by him in his life-time and inscribed in the marble slab on his tomb,

"দয়াসিন্ধু-মহাযোগী বিশ্বকোষ প্রবর্ত্তক ।
জিয়চ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্ ॥"

Which means, "May Rangalal, the ocean of compassion, the great ascetic and the sponsor of 'Viswa-Kosh' be ever cherished in the heart of the people all over the world." Similar self-realisation and self-reliance is found in Madhusudan as expressed in his epic 'Meghnad Badh'. "I will creat this honey-comb, from which the people of Gouda will go on drinking nectar with pleasure." And in a poem of the rebel-poet Nazrul we find, "Let it be announced that I am a wonder of all times in the domain of the Lord of the universe and I had to tear asunder the great firnament, leave behind the Sun and the Moon, pierce through heaven and earth and cut open the throne of God to attain the eminence that I have done' or 'I will enclose the world in the fold of my palm to survey it.' The same voice of self-confidence —is sounded by Karna of Mahabharata when he says. "There is a divrity that controls our pedigree, but I am in posession of manly valour by my un-aided

efforts." Rangalal was not born in a privileged family, yet, inspite of his birth in a common family he he succeeded in attaining such manaliness by his personal efforts. An analysis of his life-history shows this

Ranglal was born on Tuesday, the 24th Asharr of 1250 of the Bengali Era in a village named Rahuta under Naihati Police station of the district of 24, Parganas His father's name was Biswambhar Mukhopadhyay and That of, his mother was Bhababundari Debi He lot his parents in his childhood ; unbearable poverty accompanied this bereavement. He was educated in the primary school and the Middle English School of his village There after, he continued his studies in Purulia High School in Manbhum under the care of his uncle. But he could not carry on his studies through all the classes of this school. So, here was the end of his student-life. Rangalal had as many as five brothers, he was the eldest brother The thought of maintaining them bewildered him, and he left home in quest of means of eaning. At the age of about twenty he at first took up the calling of a teacher in the Anglo-Vernacvlar school at the village. Baluti near Bally. After sometime, he was transferaed to Chandannagar as a teacher of Language & Mathematics. Inspite of being deprived of higher education in a college or academy for Higher education, he was

able to acquire vast knowledge in English, Bengali, Sanskrit and Mathematics by dint of his own efforts. wide infestation of malaria coupled with his personal experience of suffering from this disease filled his heart with a feeling of compassion for the persons suffering terribly from th s dire disease and he was attacted to the study and culture of medical seience with the purpose of woruing for its effective remedy. He made up his mind to learn this subject with a practical bias. He had alreaey fett tbis change of mind while he had been residing at Chandannagar possiblp under the influende of some unuпown power, and After Chandannagar he juirned Ichhapur School as a Sansurit teacher. At that time the country-wide terrible malaria fever infested Ichhapur as well. He left Ichhapur and came to Calcutta and accepted a service in the mint there. Here, too, there was no escape ; malaria chased him here also. So, he went to to his elder uncle Matilal Babu's house and after recovery from malaria joined service in the Police Department. He was ill at ease in this service and resigned it. At this time the suffering of people in the country wide infestation of malaria coupled with his personal experience of suffering from this disease filled his heart with a feeling of compassion for the persons suffering terribly from this dire disease and he was attracted to the study and culture of medical science

with the purpose of working for its effective remedy. He made up his mind to learn this subject with a practical bias. He had already felt this change of mind while he had been residing at Chandannagar possibly under the influence of some unknown power, and had received the help of his great well-wishers, the renowned allopaths Dr. Raman Chandra and Dr. I. Hangard in his training in medical science. There after he had received the affectionate notice of famous Homeopaths Dr. Rajendralal and Dr.

studied and cultured Homeopathy under them and thus had acquired efficiency in this system of medical treatement. Moreover, he had studied Ayurveda under hts friend the famous physician Lokenath Kabiraj and acquired much experience in this system of treatement also. As a result of his study of aud training in these three branches of medical science he became in his later life the famous self-made 'Rangalal doctor' as has previously been discussed.

During his stiy at Chandannagar Rangalal was weded to Jnanada Debi, daughter of Laxminarayan Pandit of Baidyabati.

On resigning his service in the police department Rangalal found himself over head and ears in financial difficulties. Maintenance of his family came to a stand-still. He was in extreme trouble concerning the upkeep of his brothers. To save him from this

distress his relative Harakall Mukhopadhyay, assistant inspector of Schools, Birbhum at that time gave him an appointment letter as Headmaster of the Anglo-Bengali school of Dwarka (Birbhum), a well-known village of that time and sent h imthere.

In the month of Bhadra of 1273 of the Bengali Era Rangalal came to Dwarka as a school-teacher. He was dressed as an ascetic with a hermit's gown of reddish-brown colour. Though he was young of age his face was covered with beard and monstache like that of an ascetic. In all probability he had at that time been initiated to the culture of 'Yogic' practice. Of course, he was a lover of literature and while at Dwarke his lonely culture of poetry became known to people. It may be mentioned impassing that at the time of his stay at Gazipur he had taken some lessons on 'Panchatantram', 'Hitopadesha', 'Srimat Bhagbata' and Panini from the famous learned man of that place zaminder Thakur Dutta. It was also at this time that he had studied poetry, drama and various other subjects likes Agam Puran' under Pandit Girija Datta Shastri of Brahmabarta near Kanpur and Pandit Mannulal Shastri, the junior and Pandit Mannulal Shastri, the senior of Nawgaon. So, he was known not merely as a school-teacher but was also easily established as a person of high quality and culture in the society of Dwarka. During his

teachership at this village a noteworthy event was the inspection of the school by the Divisional Inspector of Schools, the famous essayest Bhudeb Mukhopadhyay who was struck with wonders to observe Rangalal's exceptional skills in compossing verses instantly without previous thought. To examine his skill Bhudeb Babu continued putting in single lines of verses and Rangalal completed each verses with lines composed extempore. Bhudeb Babu realised that day that this young teacher was not an ordinary person, but a genious in the making. At Dwarka Rangalal established an association for discussion on religious topics. An intimate bond of friendship developed between him and the famous land lord family of this place, and Panchanan Ray and Mahatap Chandra Roy of this family, who appreciated his merits, arranged the publications of many of his Compositions in various respectable periodicals of Calcutta of that time. After Rangalal had served in this school for about five years the institution was closed down on account of an internal quarrel in the Roy-family, and Rangalal's stoy in this village came to an end. He gave up the calling of a teacher, built his residence in the nearby village of Laghosa, established his dispensary there and began practising as a physician. By dint of his proficiency in medicine he was able to establish a reputable practice

in an extensive area in the surrounding localities within a short time. He had already studied medical science profoundly and acquired ample experience in medical treatment. He was a medical practitioner and a practiser of 'Tantric' ways in spiritual life in the person of the same individual. In addition to this, his mental make up was that of a devoted literary worker. And the literary work has made him immortal as the spousor of 'Viswakosh', the encyclohacdia to be first written in any Indian language

It was the year 1290. Rangalal doctor was then residing in Birbhum. Spending plenty of money earned from medical practice he established a printing press in Calcutta. For want of proper management and supervision he incurred a huge loss in this venture. So, he wound up the printing work of Calcutta and brought the press to his native village Rahuta, and here in the 'Biswakosh Printing Press' the first part of his encyclopacdia 'Viswakosh' (Published in 1293 of the Bengali Era) and a portion of its second part was printed and published. Seeing the first publication of such a source-book in an Indian language even foreign litterateurs unhesitatingly showed it due regards. In this work he was assisted by his second younger brother the reputed author of several books in English and Bengali languages Trailokyanath Mukhopadhyay. The compilation and

sponsoring of 'Viswakosh', judged in selling of that time, a century back from now, was such a arduous (it may be said, almost unthinkable, because the work was done from an interior village) task, as is sure to strike one with wonder to think how it could be achieved. Some of the other books—poems, philosophy, Science, history, drama and......written by Rangalal are 'Chitta-Chaitanyodaya'. 'Bairagya Bipin Behari,' 'Haridas Sadhu'. 'Ram-Banabas', 'Sata Barsher Prakrita Banga,' 'Sarat Sashi' and Bignan Darshak. Besides these, many editorials in the reputable periodical of that time'Som Prakash were his contribution, and innumerable articles written by him in his own name and pseldonymousy were published in the journals 'Education Gazette', 'Kalpa-drum', 'Arya Darshan' etc. These were written a century ago, yet the style of his language is not far apart from the style of modern language, In other words, the language is not loaded with stiff Sanskrit-equivalent words or words derived from Sanskrit, so that it has not become the cause of the readers' head ache.. Such was the speciality of his language endowed with a quality of lucidity.

On reading the books and compositions of Rangalal Maharajadhiraj Mahatapchand, a patron of learring was so delighted that in keeping with his appreciativeness he was pleased to adorn him with

the title of 'Kavya-Ratnakar.' In these days there was no opportunity of winning Cash-reward or title from the judges of literary merit by utilising party influence and advertised by surrown……, none could even dream of such methods of evaluation of literary performance in those days. At that time proper evaluation of merit of the talented persons and men of genius was made by wise men of a Raja's assembly. And Rangalal was adjudged 'Kavya-Ratnakar' in their evaluation. It may be mentioned here that Raja Satyasaran of Bhu-Kailash was a loving appreciater of his poetry. Rangalal would personally go to his residence beside the river Ganges in Chandan-Nagar and read out his poems to the Raja The fondness for drama in the family of the Raja of Hetampur is well-known. It is heard that Rangalal's drama 'Ram Banabas' was written with a view to be enacted by the ameteur theatrical party patronised by the Raj family. The Raj-family highly esteemed him as a physician as well. He has also worked for sometime as a private tutor to the son of the Raja of Maliara in the distnict of Bankura. Besides these, there were various other sides in his life-history which are fit to be discussed If these are duly published, a perusal of these will apprise one with his……active life, which can not but fill one's mind with astonishnent. But I refrain from dilating

on the subject for the present, lest, I am afraid, this article becomes unduly

Rangalal came to Birbhum when he was only 23 years of age and lived here permanently till his death. In other words, Birbhum was the field of his literary, spiritual and medical activities for a period of 44 years. At the end of this period he breathed his last on the 17th Kartik of the Bengali Era 1316 at this village Laghosha to be buried here lamented by thousands of devotees who adoved him for his memo-orable qualities In compliance with his last wishes his deadbody was not crenated, but buried in the soil of Birbhum. Such was his unbounded compassion and affection for Birbhum, which he considered dearer than his life ! Bora so long ago at the village Rahuta under Naihati Police station in South Bengal illuminating the lap of his mother Bhaba-Sundari, he took his final peaceful rest on the lap of his second mother, the Earth, in Birbhum, the western-most district of Bengal, by the side of the river Mayurakshi flowing through the middle of the district. Thus the name of another adorable devotee of art and literature was added to list of the venerable votaries of goddess Saraswati (Goddess of Learning) of Birbhum where Joydeb, Chandidas and Jnandas (kandra, his place of birth was within the limit of Birbhum at his time) lived, displayed their poetic brilliance and died

Ours is an independent country now, and so renovated national awakening in all fields of activity is evinced in all parts of the land. It is now the indispensable duty of the people of free India and our national government to bring afresh within the purview of our remembrance those respectable and memorable, but totally forgotten, half-forgotten or neglected, ones of our worthy predecessors, whose contribution to the field of our education and culture, religion and spirituality, art and literature, and social progress has been quite substantial, and take proper steps for setting up and maintaining lasting memorials for them. The repair and maintenance of Rangalal's sacred tomb is essential and over-due. No less then five 'Pitha-Sthanas' (Places sanctified by association with the limbs of goddess Satee, Lord Siva's first consort) are situated in Birbhum ; moreover, Nanoor and Kendubilwa, the places of birth of poets Chandidas and Joydev respectively are situated in this district. These holy places are visited by thousands of pilgrims through out the year for paying their respectful obeissance. A broad road from Suri, the head-quarters of Birbhum, to Daskalgram runs through Labpur, About a mile to the west from here, adjacent to this broad road is situated the Gopalpur-Sekhampur halt Station of the A.K. Railways. About 4 miles to the direct north of this station is situated

this unique tomb, which may be reacheu by a village Path through agricultural fields. If this path is modernised, travellers from different parts of the country will be able to visit the tomb and pay their respectful homage. Thus another place of importance may be added to the list of our places of tourist-interest. Will our sympathetic public and the persons in control of our national government think over the matter ? Will our modern litterateurs of Birbhum, particularly the younger ones among them, leave aside for the time-being their craze for fame and money and attainment of self establishment by means of false propaganda and self-advertisement, and do a bit of their duty towards their worthy predecessors ?*

Translation from the article of Sirajul Hoque.

THE VEILED

Md. Bodruddoza Mallick, M. A. B. Ed. LL.B
Advocate, High Court. Calcutta, B. A. R.-9.

In my educational life from School to University I have had never heard, never read, never looked at, a even at glance a single word a single line about thegreat genius poet, writer author Rangalal Mukhopadhaya. Firstly I come to know about the poet, and his great literary works and his best contributions in Bengali Language from Jonab Sirajul Haque, Village-Bamnnigram, P. O. Labpur, P. S. Labpur, District Birbhum, Pin-731303.

All on a sudden on a fine morning of 30th. May, 1983 Jonab Sirajul Haque came to my resibence at Mohugram Paschimpara, P. O. Labpur, Birbhum and requested me to company with him and to take some snaps by my camera at village Laghosha where the stalwart of Bengali Language is buried rather banished under the grave with an epitaph of his own composition. Amidst Scorching sunrays at about noon I had to take some physeical troubles while I was moving on a Bi. Cycle upto Shashpur thereafter I had to walk on foot upto the graveyard of Laghosha which is at a distance of five miles north west from my residence. The camera was loaded with film. I took snaps one by one from Laghosha to Dwarka on

the bank of Mayurakshi River. Sorry to say that the photographs of thatday were not so satisfactory, in my opinion due to some climatic defects. So, again I had to run in the same course on 4th. June, 1983 to take the same snaps along with Jonab Sirajul Haque. We arrived at Laghosha and met one Centenarian pious old gentleman, Jonab Yakub Hossain who had witnessed in his life-time the living Poet and Doctor (Physician) Rangalal Mukhopadhaya and heared from his mouththe various interesting aspects of daily life of Rangalal Mukhopadhaya. Again I took some snaps of his tomb, the vaccdnt land with a tree where his residence was at Laghosha and took snaps of his school where he was a teacher and his used articles and utensils at Dwarka and those photographs were good, in my opinion. The used articles and utensils are preserved by Nandarani Debi in her Taramandir at Dwarka.

I come to know only from Jonab Sirajul Haque that there was a Rangalal Mukhopadhaya at Laghosha who was firstly a teacher at Dwarka English-Bengali School thereafter he changed his profession, practiced Medicine and very soon he became a well reputed three Methods physician in this district who dedicated his life in the service of Malaria affected patients of this locality, inspite of that he did not stop his culture of writings on various faculty of Bengali language.

He was the first author who ventured to write an Encyclopaedia in Bengali language (Viswakosh) and he was the first man who tried to find out the causes of disease upon a person and the cause of death after desection of the corpse at that time.

And after that I come to know a little about Rangalal Mukhopadhaya from the writings of various Writers of "BIRBHUMI" a Literary Magazine of Rangalal Memorial Edition, 1388 B. E, Falgun which I teink the best works of Birbhum Sahitya Parishad. In this matter every where I find that Jonab Sirajul Haque of Bamnnigram a lifededicated literary worker is the only active pioneer and he is in the seashore like a child to collect pretty pebbles, the scattered works of Rangalal Mukhopadhaya from the graveyard of Laghosha to Viswa-Varati and National Library in Calcutta.

Knowing a little about Rangalal Mukhopadhaya I put the questions to many noted literary workers, Professors, of Bengali Language in the Universities, Novelists Dramatists of the first row in Calcutta but this gives me much pity to say that none can say about this particular Rangalal Mukhopadhayaas he was in practice. Each and Every one only says "Rangalal Bandopadhaya", the poet. I was highly horrified at the depth of their knowledge of legendary Rangalal Mukhopadhaya. Rangalal Mukhopadhaya had left

behind him so many wise literary works which are full of lore but all are captived in the shelves of some libraries like Viswavarati and National Library in Calcutta, and none has touched his works uptill now inspite of that so many persons have become the authority of Bengali language. Rangalal Mukhopadhaya's works are banished by the jealous and foppish Modern Authors of Bengali Language of the present days. At that time the literar workers were divided in to two groups, one is "Araya Darshan" and the another is "Bangadarshan". Rangalal Mukhopadhaya belonged to "Araya Darshan". I think that the literary workers of "Bangadarshan" group were his rivalry groups and they have ignored and sabotaged him since various organs of press and platform and publicity was within the rip of the leader of the "Bangadarshan" group and as such his works are excommunicated and stiel veiled. A group of literary workers of Birbhum Sahitya Parishad those who have made a pilot to Jonab Sirajul Haque has taken an active step though painful in every respect, is going to discover like the discovery of America. The discoverers, the committee members of Viswakosh Prabartak Rangalal Mukherjee smriti samity", Labpur, Birbhum are like the sailors on a ship on the sea of Rangalal's works. After a painful, expensive, long-linged search of whole works of

Rangalal Mukhopadhaya", Jonab Sirajul Haque now shouts like Columbus. Hurrah ! " I have got the trace of complete works of Rangalal Mukhopadhaya" and we are also shouting in the same chorus, "Yes, We have discovered Rangalal Mukhopadhaya, Hi-Fi-Hurrah ! Hi-Fi-Hurrah !

It is strange and astonishing matter to me while I come to know that no one is interested in his valuable contributions in Bengali Language, No one is interested to unveil his works and to introduce his writings in any curriculum of educational institutions, especially in Bengali ; Apart from the British Government in India the successive the successive Governments of Post-Independence period of Bengal had never tried to focus upon his works from their torch light of educational and cultural affairs. When many Ph. D Degree holders have chosen their subject on common matters, even on "The causes of prostitution in ancient India" but they fail to select and or to choose as topics of research "The works of Rangalal Mukhopadhaya". This is I think horrible on the part of the research scholars of Bengali Language as well as on the part of the Universities of Bengal.

At his own instance, the life-long pain-staking literary worker Jonab Sirajul Haque inspite of various troubles, the Pilot has opened the grave of works of the great author of "VISWAKOSH" in Bengali

Language, Rangalal Mukhopadhaya and has began to desect his thoughts and activities at full length and trying his best to unveil him in the world of literary works of Bengal which is a precious one.

Rangalal Mukhopadhaya was born at Rahuta on 24th. Asharh 1250 Bengali Era corresponding to 27th. June 1843 under Naihati Police Station in the District of North 24 Parganas and finally he settled at Laghosha, P. O—Dwarka, P. S—Labpur, District—Birbhum which is situated on the bank of Mayurakshi River. 7 (seven) Miles east from Sainthtia' An Eastern Railway Station as a residentiary ; in our eyes after completion of all his annecdotes he breathed last and lied on his back for ever under the grave thereby on 17th. kartick 1316 B. E. I have gone through a few pages of his "VISWAKOSH" in Bengali Language and it has become a quite astonishing matter to me to observe his depth of knowledge which he cherished and cultured in such a rustic remote village Laghosha which was parallel to dark continent of Africa at that time. This leads me to think over some questions :—where from he got so many such books of various languages and various subjects ? where he studied ? What library he used ? Who was his guide in this matter ? In the conclusion, beyond doubt he is a strange, a man of extraordinary merit,

a Genius, an Aparajita flower of a village of Bengal which was bloomed at Laghosha, Five miles north-WEST from Labpur Police station and hardly Four Hundred Yards south from the main embankments of the Mayurakshi River, on the West side of the main road which enters in to the village. He is lying under the green wood tree trees, here he seess no enemy but winter, folod and rough weather and passing his days peacefully in the company of "Hampden and Chromewell" of Thomas Gray's Elegy and "The village School Master" of Oliver Goldsmith.

On the whole, we, the people, the educationists of Birbhum District are really fortunate enough whereas we have embraced so many distinguished strangers those who were not actually born in the district of Birbhum but the distinguished strangers were in our love and loved Birbhum, chosen very heartily Birbhum as their field of works, Library and a place of Meditation of their thoughts which passion and faculties they possessed and as such enlightend and highlightend the educational and cultural sphere of Birbhum and last of all they have become ours own like Chandidas, Joydeu, Vidya-vati, Nabinchandra Mukherjee and so many others and illfated, neglected Rangalal Mukho-padhaya. They came' They saw, They conquered

us through love and taught us. We feel proud for them. We are glorified and dignified in their appearence and closecontact at Birbhum.

Now my last submission is before the educationists of Bengal, the intelligentsia of Bengal, The Chancellor of the Universities of Bengal, the present Government of Bengal to reprint has all works, to introduce his writings in various curriculum in educational Institutions, to make it a topics of research for the research scholars in the Universities, to organise various symposium on his thoughts, to cireulate it widely, to recognise him publicly and widely, to make his tomb as a protected area, to preserve his used his used articles and utensils in the Museum in Calcutta, to createpost of Lecturer in the Universities in his name, to materialise his thoughts, to make him immortal in the realm of Bengali Language and literature, this will be my and our best homage and honour to him. Notwithstanding we remain highly indebteb to him.

Longlive Rangalal Mukhopadhaya through his works and thoughts amongst us generation after generation.

Please, Hurry up, Double up, to unveil the strange, "The Hidden Treasury", "The Golden Treasury" of Rangalal Mukhopndhaya.

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা

১. কামদেব

|

২. শ্রীধর

|

৩. জগদানন্দ

|

৪. রামকৃষ্ণ

|

৫. শ্রীনন্দন

|

৬. বিশ্বেশ্বর

|

৭. রামনাথ

|

৮. বিনোদ

|

৯. ভবানীচরণ

|

১০. উদয়নারায়ণ

|

১১. বিশ্বম্ভর (+ ভবসুন্দরী)

|

১২. রঙ্গলাল

বংশ তালিকাটি ড. বারিদবরণ ঘোষ মহাশয় তৈরী করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সম্পাদক



রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

স্কেচ ঃ আশিস মান্না

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সিরাজুল হককে লেখা বিদগ্ধজনের চিঠিপত্র

P—17 A Asutosh Choudhuri Avenue,
Calcutta - 19
24/3/88

প্রীতিভাজনেষু

আপনার চিঠি ও আবেদন পেয়েছি। আপনি একটি সৎকাজে হাত দিয়েছেন। এর জন্য আমার সাধুবাদ জানবেন। কিন্তু বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার পক্ষে কিছু লেখা অসম্ভব। আমাকে মাফ করবেন।

আমার আদাব জানবেন। ইতি

বিনীত

অন্নদাশঙ্কর রায়

Wakil Ahmed
Ph. D (Dacca) D. Lit. (Cal.)
DIRECTOR
CENTRE FOR ADVANCED
RESEARCH IN HUMANITIES

LECTURE THEATRE
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA—2, BANGLADESH
Phone :

সুজনেষু,

আপনার দুটি পত্রই পেয়েছি। বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখার জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এখানে যে ক'য়টি লাইব্রেরী আছে, অনুসন্ধান করে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থ সেগুলি থেকে উদ্ধার করতে পারিনি। আপনি যদি কোন একটি গ্রন্থের কপি আপনার সংগ্রহ থেকে পাঠান, তবে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করতে পারি। আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে শরীক হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। ইতি—

ওয়াকিল আহমদ

৮-৩-৮৮

আচার্য	বিশ্বভারতী	শান্তিনিকেতন
রাজীব গান্ধী	প্রতিষ্ঠাতা	পশ্চিমবঙ্গ
উপাচার্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
নিমাই সাধন বসু		

রাখীপূর্ণিমা ৩২শে শ্রাবণ

ভিসি। এম-১ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

যোগীবর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি থানার রাহুতা গ্রামে এক সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন ও সাধনাস্থল ছিল বীরভূমের লাভপুর থানায় অধীন ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে লাঘোষা গ্রামে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্যনিকেতন উপন্যাসের 'রঙলাল ডাক্তার' এতদ্ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অতি নিকটজন ছিলেন। রঙ্গলাল এখানে প্রবাদ পুরুষ। সকলের সুখে দুঃখে তিনি অতি কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন কাব্যরত্নাকর। বীরভূমের এই প্রত্যন্ত লাঘোষা গ্রামে বসে, তিনি প্রথম বাংলা ভাষার বৃহৎ অভিধান 'বিশ্বকোষের' সংকলনের কাজ শুরু করেন।

'বিশ্বকোষ প্রণেতা' রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্তিক লাঘোষা গ্রামেই দেহ রাখেন। তাঁর জীবন ও সাধনার সার সংগ্রহ তুলে ধরেছেন —"বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিরাজুল হক। শ্রীযুক্ত হক কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে কাব্যরত্নাকরের যে জীবন ও সাধনার কাহিনী প্রকাশ করেছেন তা ব্যাপক সমাদর লাভ করবে বলে আমি আশা করি।

নিমাই সাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৩০শে চৈত্র/১৩৯৪

বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ।

প্রীতিভাজনেষু,

বেশ কিছুদিন আগে আপনাদের কাছ থেকে সাদর একটি আমন্ত্রণ লিপি পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি। এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

'লাভপুর' নামটি মনের মধ্যে আলোড়ন জাগালো,—তারাশঙ্করের লাভপুর থেকে চিঠি এলো,—এ যে কতো আনন্দের কতো সম্মানের ব্যাপার তা' কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

* * *

আপনারা যে কাজে হাত দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ। এবং প্রয়োজনীয়। আপনাদের সে কাজ সফল হোক এই কামনা করি।

রঙ্গলাল স্মৃতিসমিতিতে বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে বুঝতে পারলাম। এরকম প্রয়াস আনন্দদায়ক এবং শুভ।

স্মৃতি সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

প্রীতি শুভেচ্ছাসহ

আতাউর রহমান

বাড়ি নং ২৫/বি

সড়ক নং ১ [এক]

ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা। ১৩-৩-৮৮

সুজনেষু,

আপনার পত্র পেলাম। আমারই দুর্ভাগ্য যে রঙ্গলাল মুখার্জির কোন বই আমার পড়া নেই। কেবল তাঁর সংকলিত বিশ্বকোষের নাম শুনেছি। এখানে দুষ্প্রাপ্য বলে তাও চোখে দেখিনি।

এতো দূর থেকে প্রত্যাশা নিয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। অথচ সে প্রত্যাশা পূরণের যোগ্যতা অর্জন করিনি বলে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত।

আশা করি, সপরিজন কুশলে আছেন। আমার সালাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আমাকে স্মরণ করার জন্য ধন্যবাদ।

বিনীত

আহমদ শরীফ

জনাব সিরাজুলহক
লাভপুর।

২৯/ই ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় আবাস, ঢাকা—২
২৯-৯-৮৮

মাননীয়েষু,

আপনার ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র একই সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল। হাতের কাজ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় পাঠাগারে গিয়ে দেখলাম রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় নামের এন্ট্রি নেই ক্যাটালগে। আশা ছিল কোনো একটি বই পেলে সেই বিষয়ে লিখব।

ঢাকার রামমোহন লাইব্রেরীটি পাকিস্তান আর্মি নষ্ট করে দিয়েছিল। রংপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর অথবা রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে কোনো বই থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এখন সময় কম। তাছাড়া বন্যায় পথঘাটের এমন ক্ষতি হয়েছে যে রাজশাহী যাবার রেললাইন ঠিক হতে তিন মাস সময় লাগবে বলে লিখছে কাগজে। স্বাভাবিক চলাফেরা কবে শুরু হবে ঠিক নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে জানিয়ে দেওয়া ভালো যে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কৌতুহল জাগলেও তা মিটাবার পথ এখন পেলাম না। লেখাও অসম্ভব হল। আপনাদের প্রচেষ্টা সফল হোক, এই শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদান্তে—
সন্‌জীদা খাতুন

রোজভিলা
বর্ধমান—৭১৩১০১

৫-১২-৮৩

প্রিয়ভাজনেষু,

আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিনি, কারণ শোনার পর লিখবো বলে। শুক্রবার দিন কলেজ স্ট্রীটে ডঃ করনের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর সঙ্গেও আপনার গ্রন্থনা ও পরিবেশনের চমৎকারিত্বের প্রসঙ্গ কথা হল। আমি শ্রোতা হিসেবে কৃতার্থ বোধ করলাম। এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্য আপনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন। প্রীতি জানবেন।

বিনীত
বারিদবরণ ঘোষ

রোজভিলা
বর্ধমান-৭১৩১০১

২৭. ১০. ৮৮

আপনার ১৮. ১০. ৮৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আমার শারদ শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার মত এমন একজন নিবেদিতচিত্ত মানুষ আর দেখি না। আশা করি মাইক্রোফিল্মের Transcription এর কাজ ধীরে এগোচ্ছে। এটি অনেক সময় নেবে।

প্রচ্ছদের ব্লক হয়েছে জেনেছি। আপনার হিসাব মতো রঙ্গলালের অন্য ছবি উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবো। মডার্ণ রিভিউ ১৯১৬ সালের অনেক আগেই ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই May 1916 সংখ্যার খোঁজ করছি। আপনি National Libraryতে গিয়েও পাবেন। যদি পান তবে আলোকচিত্র তুলিয়ে নিয়ে আসবেন। হুনেসের ছবির সন্ধান পাওয়া কষ্টকর নয়। এ বিষয়ে আপনি সন্ধান পাবেন।

লণ্ডনের ঠিকানা আপনি আমাকে দিতে ভুলে গেছেন। প্রয়োজনও নেই। এদেশেই সন্ধান পাওয়া যাবে।

আপনার উদ্যোগ সর্বপ্রকারে জয়যুক্ত হবে—এ বিশ্বাস আছে। রঙ্গলাল পুনশ্চজীবিত হোন্—আপনাদের উদ্যোগে।

সপ্রেম নমস্কারান্তে—
বিনীত
বারিদবরণ ঘোষ

রোজভিলা, বর্ধমান-৭১৩১০১
৪. ৩. ৮৯

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আপনার রঙ্গলাল প্রীতি প্রবাদস্থলীয় হয়ে থাকবে। জন্মান্তরে বিশ্বাস করিনা, বিশ্বাস করি না রক্ত সম্পর্কেও। কিন্তু আপনার চেয়ে বড়ো আত্মীয় কি রঙ্গলালের আর কেউ ছিলেন? জীবনটাই দেখছি তাঁর জন্যে উৎসর্গীকৃত করে দিয়েছেন। আপনাকে সাধুবাদ দিই, অভিনন্দিত করি। এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আচরণযোগ্য, শিক্ষণীয় বলে মনে হয়। আপনি আমাদের শ্রদ্ধার আসর চিরস্থায়ী হয়ে রইলেন।

এখন একটু পরিশ্রম করুন। শরীর সুস্থ থাকলে তবেই আরও কাজ করতে পারবেন অবশ্য এ-ও বিশ্বাস করি—কাজের মধ্য থেকেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনি স্বভাবত সুজন—তাই আপনার পাশে আপনার শুভার্থীরা এসেই পড়েন।

আমার শ্রদ্ধা জানবেন। সাবধানে থাকবেন। বিনীত—

বারিদবরণ ঘোষ

৬. ৬. ৮৯

প্রিয়জনেষু,

আপনার চিঠি বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি, কিন্তু আমার ছোট মেয়ের পায়ে একটি কঠিন অপারেশান হওয়ায় কোন অবকাশ পাইনি। আজ নার্সিংহোমে বসেই আপনাকে লিখছি।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বংশ তালিকায় যে পুরুষে এসে রঙ্গলাল পৌঁছেছেন, সেটিকেই গুরুত্ব দেওয়ার নিয়ম কোনো বংশলতিকা নির্মাণে। যাইহোক, আপনার এটিকে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। হতেই পারে আমার ভুলত্রুটি। সাহিত্যের কারাবারী হিসেবে আমার যেটুকু মনে হয়েছিল করেছি। আপনি পরবর্তী গবেষণায় যদি আরও কিছু সংযোজনযোগ্য মনে করেন, আমার দেওয়া। বস্তুতঃ সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত, তালিকাটির পরিবর্তে সেই নতুন তালিকাটিকেই দেবেন।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সবিশেষ পরিচয় আমি জানি। তাঁর 'বঙ্গভাষার লেখক' বইটিকে নানা সময়ে আমরা ব্যবহার করে থাকি। 'সাহিত্য সংসদ'-এর সঙ্গে আমার কিছুমাত্র যোগ নেই। আপনাদের সভা ১লা অক্টোবর হবে জেনে আনন্দিত। তার পূর্ণাঙ্গ সফলতা প্রার্থনা করি। নির্মলকাকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। প্রীতি নমস্কার জানবেন।

বিনীত

বারিদবরণ ঘোষ

ন, শান্তিনিকেতন

১৮ মার্চ ১৯৮৯

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

চিঠি পেলাম। আমার আগের চিঠিটা খুবই উষ্ণ। ক্ষোভের কারণটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। এই বয়সে—এই সহযোগিতাশূন্য সীমাহীন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা আপনার মোটেই সইবে না। অতএব যথাসত্বর স্মারক পত্রিকা ছাপা শেষ করে অনুষ্ঠান শেষ করুন এবং মূর্তিটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্ম যথাকরণীয় করে—এবার থেকে বিশ্রামে থেকে সাহিত্যচর্চা গবেষণার কাজ করুন। আজকের দিনে যে কোনো সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পিছনে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতসেবীদের কোনো মানসিক দায়িত্ব নেই। আছে শুধু ধান্দা। সেই কারণেই, রঙ্গলালের অসমাপ্ত কাজ যতটুকু করতে পেরেছেন—সেইটুকুই কোনোমতে শেষ করে ফেলুন। নিজেকে এইভাবে ক্ষয় করবেন না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার সুস্থতাই আমার একমাত্র কাম্য।

ভবদীয়

সৌম্যেন অধিকারী

শান্তিনিকেতন / ২৬ জানুয়ারী ১৯৮১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

রঙ্গলাল Mould হয়ে শুয়ে আছেন। সিমেণ্টের ব্যবস্থা হলে তিনি উঠে বসতেন। অনেকদিন দেখা নেই। কলকাতার কাজ হয়েছে? শরীর সুস্থ তো? আমি ৭ দিন পর বিছানা ছেড়ে উঠলুম। আপনার খবর বা চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বেগে আছি। স্মারকপত্রিকা কতদূর? অবিলম্বে এক বস্তা সিমেণ্টের ব্যবস্থা করুন। তাহলে দায়িত্বমুক্ত হতে পারি।

নমস্কারান্তে

সৌম্যেন অধিকারী

সৌম্যেন অধিকারী Soumyen Adhikari
শান্তিনিকেতন Santiniketan
ভূম পঃ বঙ্গ Birbhum W. Bengal

২৬-২-৮১

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার ক্রমশ-সুস্থতার খবর পেয়ে ভালো লাগছে। বিশ্রামে থাকুন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রস্তুতিগত কাজকর্ম—যা বর্তমানে করণীয়—সে সম্পর্কে অবহিত করুন। একাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁদের কর্তব্য।

রঙ্গলাল শেষ। তিনি এখন ৪৮ ঘণ্টা জলে থাকবেন। অন্যান্য পতির কাছে জেনে নেবেন।

গত পরশু আরামবাগ থেকে ফিরেছি। বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছি শিল্পী হিসাবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করলুম। আমার আলোচনা (রামমোহন ও আগামী দিন) সকলের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এটাই শ্রমের পুরস্কার ও তৃপ্তি। ছাপার কাজ কতদূর? সম্ভাব্য তারিখ কি স্থির হয়েছে? বিশ্রাম নেবেন। আমার শরীর খুব ভালো না। রক্তচাপ বেড়েছে। অন্যান্য খবর জানাবেন।

নমস্কার।

প্রীত্যন্তে

সৌম্যেন অধিকারী

কাটোয়া/কাছারী রোড,
২০।১২।৮৭

স্নেহভাজনেষু,

দোওয়া-এ-খায়ের জানাচ্ছি। সম্প্রতি কয়েক হাত ফিরে আপনার "বিনম্র আবেদন" পত্রটি পেয়ে শোকৃরিয়া জানাচ্ছি। আপনি অনেকগুলি মহৎ কর্মের সঙ্গে আর একটি সৎকর্মে হাত নিয়েছেন। আপনি সত্যিকার কর্মী মানুষ। দেশ সমাজ এবং সাহিত্যপ্রীতি আপনাকে অনেকের প্রিয় করে তুলেছে। দেশ স্বাধীন হলেও দেশের মানুষের মন ময়লা মলিন হয়ে আছে। হিংসা-বিদ্বেষ স্বার্থ এবং সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষে আকাশ বাতাস ভরপুর। আপনার মহৎ প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা। কিন্তু স্বার্থ যেখানে, গরীবের নেতারা যেখানে আমীর হতে যাচ্ছেন, নাচে-গানে খেলায় বিলাসীতায় কর্মহীন বেকার যুবকদের মাতিয়ে।তাতিয়ে রাখতে চাচ্ছেন সেখানে স্মরণীয় ও বরণীয় রঙ্গলালের স্থান পাওয়া শক্ত। তথাপি হতাশ হলে আমাদের চলবে না।……আপনি অনেক কিছু করলেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ আমরা আপনার কর্মগুলিকেও স্মরণ করি না।……আপনাকে মোবারকবাদ জানাই।

নিত্যশুভার্থী

এম. আবদুর রহমান

শ্রীহরি

ব্যানার্জিপাড়া
বুড়ো শিবতলা
পোঃ নবদ্বীপ
জেঃ নদীয়া
১২।১২।৮৮

মান্যবরেষু

আপনার পত্র পেয়ে প্রীত হয়েছি।………রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করছেন জেনে আশ্বস্ত হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি।……যেভাবে আপনি রঙ্গলালকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাঁর যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তার জন্য বঙ্গসাহিত্যপ্রেমী মাত্রেরই আপনার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন। আপনাদের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।……………নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

শিতিকণ্ঠ বাচসপতি রোড,
পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া
ফোন-৭৪১৩০২
১৫।১২।৮৩

মান্যবরেষু

আপনার পোঃ কার্ড যথাসময়ে পেয়েছি এবং আকাশবাণীতে প্রচারিত আপনাদের অনুষ্ঠানও শুনেছি। অনুষ্ঠান খুবই ভাল লেগেছিল। বিগত যুগের সাহিত্যসাধক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্ত্তি প্রচারের যে মহান ব্রত আপমারা গ্রহণ করেছেন, সেজন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই আপনারা কৃতজ্ঞতাভাজন।

নমস্কার জানবেন।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীহরি

ব্যানার্জী পাড়া, বুড়ো শিবতলা
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা : নদীয়া
ফোন : ৭৪১৩০২
১৪ই বৈশাখ ১৩৯৬

মাননীয়েষু

নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন। নববর্ষ আপনাদের সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের আধার হয়ে উঠুক। এই কামনা করি।

আপনার বহু পুরাতন একখানা চিঠি কাগজপত্রের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করায় এই চিঠি লিখছি। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে রবিকরোজ্জ্বল বঙ্গসাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করার আপনাদের সাধু প্রয়াস কতটা সফলতা লাভ করলো জানতে ইচ্ছা হয়। স্মারকগ্রন্থের কাজ কতটা এগুলো, কবে নাগাদ প্রকাশিত হতে পারে জানালে খুশী হব। সাধু কাজে বিঘ্ন অনেক, কিন্তু সব বিঘ্নই অপসৃত হয়ে যায়।

রঙ্গলালের রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন জেনে তৃপ্তি পেলাম। উদ্যোগ কতটা ফলবান হোল জানাবেন। পঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ রচনাবলী ছাপতে পারে কিনা চেষ্টা করেছেন নিশ্চয়ই। আপনাদের কুশলসহ সকল সমাচার জানাবেন।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

'দেহলি' তেলেনি পাড়া

জেলা-হুগলী

মান্যবরেষু

ফোন-৭১২১২৫

সিরাজুল হক

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলাম। আপনার শরীর বেশ দুর্বল এবং বয়সও হয়েছে। এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে, উপযুক্ত বিশ্রাম না নিয়ে—ঘোরাঘুরি করা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। উপদেশ নয়—আপনার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃত দেশকর্মী সত্যই বিরল। রবীন্দ্র সদনে অল্পক্ষণই আলাপ হয়েছে তাতেই আপনার নিষ্ঠা ও শ্রম, রঙ্গলাল সম্বন্ধে আন্তরিকতা……হৃদয় স্পর্শ করে।

আপনার আকস্মিক অসুস্থতা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। সাবধানে থাকবেন। ১৫/২ তারিখে বেলা ২টো থেকে ৩টে পর্য্যন্ত এক সম্পাদককে বসিয়ে রেখেছিলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলে। আপনার লেখাটি কপি করে এবং সামান্য পরিমার্জনা করে, ছোট কিংবা বড়ো, কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁকে দিয়েছি। তিনি লেখার সঙ্গে রঙ্গলালের একটি ছবি চাইছিলেন। তা' যখন হল না, শুধু লেখাটাই কোনো পত্রিকায় প্রকাশ পাবে।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। আহার ও বিশ্রাম নেবেন ঠিক মতো। যে কাজে হাত দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করতে হলে শরীর ও মন সুস্থ থাকা দরকার। বলতে পারেন এটা আমাদের দাবী।

আশা করি পরবর্ত্তী সাক্ষাৎকারে আপনাকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ দেখব। কুশল কামনা করি। প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। ইতি

সম্রাট সেন

৩।৩।৮৯

দেহলি, তেলিনীপাড়া

জেলা-হুগলী

৩০-৬ ৮৯

সিরাজুল হক ॥

আপনার পূর্বের চিঠি, দুর্ভাগ্যবশত পাইনি। আপনি একটি দুরূহ কর্তব্য কাজে নিষ্ঠ হয়েছেন। একাজ একা আপনার নয় দেশের ও দশের কাজ। আপনাকে যে প্রবল অর্থসংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে সেটা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি এবং এজন্তে আমার নিজের পক্ষ হতে কিছু করতে পারছিনা বলে খুবই

ব্যথিত। পরামর্শ দেবার মত যোগ্য ব্যক্তি আমি নই, আমি নিতান্তই মসীজীবী এবং স্বল্প বেতনের গ্রন্থাগার কর্মী। আপনার মতই আমিও এক কঠিন কাজে স্বেচ্ছায় ব্রতী হয়েছি। বিপ্লবী ও কবি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়-এর জীবনী ও তৎসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, চিঠি, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পর সমস্যা দেখা দিল প্রকাশনার ব্যাপারে। কোনো প্রকাশকই রাজী না হওয়ায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের শরণাপন্ন হই। তাঁদের দপ্তরে পাণ্ডুলিপি জমা দেবার পর, সম্প্রতি তাঁরা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন যদিও সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধাংশের কম।...আপনি এই চেষ্টা করতে পারেন। ওরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই অনুদান প্রকল্পে সামিল হতে পারলে কিঞ্চিৎ সুরাহা হতে পারে। প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। কুশল কামনা করি।

সম্রাট সেন

পুনঃ—আপনার প্রবন্ধটির সঙ্গে আমারও একটি লেখা জমা দেওয়া আছে। যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

ঘরোয়ায় আমার লেখাটি আপনার ভাল লেগেছে এজন্য আনন্দিত।

Labpur
22-1-89

To

Sirajul Haque,
Secretary,
Biswakosh Prabartak Rangalal Smriti Samity Labpur

Dear Sri Haque,

I am glad to learn that you are going to publish a souvenir of the writings of the celebrated poet litterature Late Rangalal Mukherjee the noted initiater of Biswakosh. His commemoration celebration including the publication of this souvenir will be a great achievement. He is remembered here as a wonderful physician, but he should be honoured and cherished in own hearts as a great literary creator as Nell. Your endeavours in this direction descrves commendatior from all cultued Indians, particularly Bengalees.

Yours Sincerehy
Apurba Krishna Sinha
Retired Headmaser

কর্ণিকার, শ্রীপল্লী
পোঃ শান্তিনিকেতন
ফোন ৭৩১২৩৫
১.৩. ১৯৮৩

প্রিয়বরেষু,

সিরাজুল সাহেব, আশা করি শারীরিক এবং পারিবারিক কুশল।…রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কবিতা কাল সত্যব্রত দত্তকে দিয়ে এসেছি কৃষ্ণগোপালকে দিতে। এরকম একজন মহৎপ্রাণ মানুষ এ অঞ্চলে ছিলেন জানতুম না, কঙ্কাবতীর জন্য ত্রৈলোক্যনাথ বঙ্গবিখ্যাত হয়েছেন, ইনি তাঁর চেয়ে উঁচুদরের মানুষ। আজ চারিদিকে ক্ষুদ্রতার 'মেকীর' রাজত্ব এর মধ্যে এরকম একজন খাঁটি মানুষের জীবনকথা প্রচার হওয়া দরকার। আপনারা তাঁর স্মৃতিসভা করছেন, খুব আনন্দের কথা। আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য যথা সময়ে আপনার হাতে পৌঁছুবে আশা করি। ডাকে পাঠানোর চেয়ে হাতে আগে যাবে ভেবে কৃষ্ণকে ভার দিয়েছি।…আপনারা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতর্পণের দ্বারা নিশ্চয়ই বড়ো হবেন। আদর্শভ্রষ্ট দেশে আজ বড আদর্শের কথা প্রচার হওয়া বড়োই দরকার।…

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। কবিতাটি পেলে জানাবেন।

প্রীতিবদ্ধ

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Narayan Chaudhuri

FLAT E/8 C. I. T. BUILDINGS
MADAN CHATTERJEE LANE
CALCUTTA-700007
date 19. 3. 1983

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৮/৩ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

আপনারা বীরভূম জিলার সাহিত্যানুরাগী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় বাংলা বিশ্বকোষের প্রবর্ত্তক মনীষীপ্রবর ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ৭৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণ-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিচ্ছেন জেনে আনন্দিত হলাম। ওই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনাও আপনাদের আছে

জেনে আরও হৃষ্টবোধ করছি। আপনাদের এই দ্বিবিধ উদ্যমেরই আমি সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আমার কাছে স্মারকগ্রন্থের জন্য রঙ্গলালের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ চেয়েছেন। প্রবন্ধ পাঠিয়ে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারলে সুখী হতুম কিন্তু প্রয়াত মনীষীর জীবন ও কর্মকৃতির সম্পর্কে আমি এমন বিস্তারিত কিছু জানি না যার উপর ভিত্তি করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে পাঠাতে পারি। রঙ্গলাল সম্পর্কে আমার দুটিমাত্র তথ্যসূত্র সম্বল এবং সে দুটি তথ্যসূত্রের উল্লেখ আছে আপনার পত্রে। এক, ৺সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি'র সংশ্লিষ্ট অংশ, এবং দুই, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে সৃষ্ট রঙ্গলাল ডাক্তার চরিত্র। এ ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর দপ্তরে 'ভারত-কোষ' নামীয় কোষগ্রন্থ প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আসি যখন ওই প্রকল্পের কার্যনির্বাহী সম্পাদক পদের দায়িত্বে ছিলাম তখন পরিষদের গ্রন্থাগারে রঙ্গলাল সম্পাদিত "বিশ্বকোষ-এর একটি খণ্ড নাড়াচাড়া করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ব্যস, এই পর্যন্ত আমার রঙ্গলাল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমা। তাঁর রচিত কোন বই-ই আমার দেখার বা পড়ার সুযোগ হয়নি। এত স্বল্প জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ওই মনস্বী সম্পর্কে প্রবন্ধের আকারে কিছু লিখতে যাওয়া সাজে না। কাজেই আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলুম না বলে দুঃখিত। আমার অক্ষমতা মার্জনা করবেন।

প্রসঙ্গতঃ লিখি আপনি 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের রঙ্গলাল ডাক্তার চরিত্রটিকে তাদৃশ গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন বলে মনে হলো। আপনি লিখেছেন—"বিশ্বকোষের প্রবর্তক, বর্ধমানরাজ কর্তৃক 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি ভূষিত রঙ্গলাল শেষমেষ একটা উপন্যাসের চরিত্র।" আপনার এই মনোভাব আমি সমর্থন করতে পারলুম না। তারাশঙ্করের অঙ্কিত রঙ্গলাল ডাক্তার চরিত্র অত্যন্ত সজীব ও বলিষ্ঠ একটি চরিত্র। কোন সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক ব্যক্তি যখন উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রূপে সেই কাল্পনিক রচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান করে নেয়, বুঝতে হবে সে-মানুষটির প্রতি উপন্যাসকার গভীর সম্ভ্রম জানাচ্ছেন এবং তাঁকে ভাবী কালের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন, তারাশঙ্কর এই কাজে অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেছেন, তাঁর সৃষ্ট রঙ্গলাল ডাক্তার চরিত্র 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের সম্পদ্। উপন্যাসে এই অনন্ত চরিত্রটি রূপায়ণের জন্য বীরভূম জিলাবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই তারাশঙ্করের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সত্যি কথা বলতে কি, হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণের স্মৃতি

এতদিনে আমার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে কিন্তু আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের অন্যতর চরিত্র রঙ্গলাল ডাক্তারের ছবি আমার মনের পটে আজও জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। এইখানেই শিল্পের জোর। যে উদ্দেশ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে দু'আঁচড়ে সিদ্ধ করা যায়, দিস্তা-দিস্তা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেও কি তার ধারেকাছে পৌছুনো যায় ?

রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ছিলেন, এই তথ্যটি আপনাদের স্মরণ অনুষ্ঠানে যথোচিত রূপে বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ ওই বহুমুখীপ্রতিভাধর অক্লান্তকর্মা দুই ভাই দুইয়ে মিলে একটি সত্তা ছিলেন। বিশ্বকোষ কোষগ্রন্থের ত্রৈলোক্যনাথের অবদানও নির্মিতিতে বড় কম ছিল না।

রঙ্গলাল সম্পর্কে স্বল্প দু'-চার কথা লিখলাম। প্রয়োজনবোধে এই পত্র আপনারা আপনাদের স্মরকগ্রন্থে মুদ্রিত করতে পারেন। নমস্কার।

ভবদীয়

নারায়ণ চৌধুরী

ফাল্গুনী : ৩৬/৪

কলিকাতা-৭০০০১১

২৬/২/৭৮

মাননীয়েষু,

আপনার ১১. ২. ৭৮ তারিখের পত্র এবং মুদ্রিত আবেদনপত্র পড়ে সবই অবগত হলাম।······রঙ্গলাল সম্পর্কে আমার নিজের জানাশোনাও খুবই কম।······ অনুসন্ধান করার মত শারীরিক অবস্থাও নেই। তাই রঙ্গলাল সম্পর্কে কিছু লিখতে সাহস পাই না। আশা করি তরুণ ও উৎসাহী গবেষক বন্ধুরা রঙ্গলাল সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উদঘাটন করে রঙ্গলাল শতবার্ষিকী সংখ্যাটি আকর্ষণীয় করে তুলতে সমর্থ হবেন। আমার আন্তরিক ও অভিনন্দন জানবেন। ইতি

ভবদীয়

নেপাল মজুমদার

NITYA NARAYAN BANERJEE
67 Ekdalia Road, Calcutta-19
Phone : 46-2749

Dated 22. 2. 88

প্রিয় সিরাজুল,

তোমার ১২. ২. ৮৮ এর পত্র দিল্লী ফেরত কলিকাতা আসিয়াছে। দিল্লীর ঠিকানা ৬।৭ বৎসর পূর্বের। যাই হোক ডাকঘর কৃপা করিয়া পত্রটি যথাস্থানে পাঠাইয়াছে।

৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই।......আমার শিক্ষক ছিলেন লাঘোষার রায়রঞ্জন সেন। তাঁহার কাছেও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু শুনি নাই। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখার ধৃষ্টতা না করাই ভাল।

বীরভূমের কবি ও সাহিত্যিকদের বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে বর্তমানের আলোকে আনার চেষ্টা করিতেছ, ইহা খুবই আশা ও আনন্দের কথা। কীর্তিমান পূর্ব পুরুষদের যারা শ্রদ্ধা করে না, তারা হতভাগ্য। মঙ্গলময় তোমাদের এই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত করুন। তোমাদের জয় হোক।......

শুভাকাঙ্ক্ষী

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোন : ৩৫-৩৭৪৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

১৩ আশ্বিন' ৯৫

তারিখ ....

৩১. ৯. ১৯৮৮

সূত্র : ১২৯/৯৫

জনাব সিরাজুল হক

সম্পাদক : বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল

মুখার্জী স্মৃতিসমিতি

গ্রাম : বামনি গ্রাম

পো : লাভপুর, বীরভূম,

সমীপে।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৯. ৯. ৮৮ তারিখের পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে, 'বিশ্বকোষ' প্রবর্তক এবং 'শরৎশশী' 'বিজ্ঞানদর্শক' 'হরিদাস সাধু' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রতিভা জ্যেষ্ঠ রঙ্গলাল এবং তাঁহার অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ। আপনারা সেই-অন্যতম কবি-সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন জানিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। রঙ্গলাল তাঁহার অনুজের সহিত একত্রে বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড (পৃ, ৩-৬৯৬ পর্য্যন্ত) সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাহার পর ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, রঙ্গলালের বহু রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। সেগুলি যদি আপনারা একত্রে এক খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন তাহা হইলে একটি যথার্থ কাজ হইবে। আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই।

নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

কানাইচন্দ্র পাল

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

SIBNARAYAN RAY
Editor Jijnasa
Bengali Quarterly

AC 158 Salt Lake
Sector I, Calcutta-700 064

২৭/৩/[redacted]

সবিনয় নিবেদন,

আমি কিছুকাল কলকাতায় ছিলাম না। আপনার চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ দিতে দেরী হল।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে নিবন্ধ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এরকম গুণী ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য আপনারা উদ্যোগী হয়েছেন—এই প্রচেষ্টার জন্য আপনাদের সাধুবাদ দিই।

শুভার্থী

শিবনারায়ণ রায়

প্রিয় সিরাজ সাহেব,

৬/১২/৮৩

সেদিন আকাশবাণীতে আপনাদের অনুষ্ঠান খুব খুশিমনে শুনেছি। খুবই তথ্যপূর্ণ ও গতিময় হয়েছে। অবশ্য আপনার কণ্ঠটি আগে থেকে না জানা থাকলে ধরতে পারতাম না। গানের অংশটিও উত্তম হয়েছে—পল্লী সংস্কৃতির মান অনুসারী। সবাইকে অভিনন্দন।......

শুভাকাঙ্খী

মনকুমার সেন

কেন্দ্রিয় কার্য্যালয় :

আনন্দ ভবন

১৮ আনন্দগড়

কলিকাতা—৭০০০৫৬

জেলা কার্য্যালয় :

কবিভবন, মির্জাপুর, পোঃ রায়পুর

[বোলপুর] জেলা : বীরভূম।

পিন কোড : ৭৩১২০৪

গ্রামীন সাহিত্য সম্মেলন [রেজিষ্টার্ড]

GRAMIN SAHITYA SAMMILAN [REGD]

A Brotherhood of Rural writers & Poets

'বিশ্বকোষ' প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়কে আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসমতো জাতির লিখিত ইতিহাসের কোন্ কোণে আমরা ফেলে রেখেছি তা বোধ করি আমাদের নিজেদেরই মনে নেই। এ শুধু লজ্জাই নয়, সেবাশ্রিত জ্ঞানের যে অহংকার ভারতীয় সংস্কৃতিরই মূল কথা তাঁর প্রতিও এ এক মারাত্মক উদাসীনতা। বাংলার আদি কোষগ্রন্থ প্রণয়নের দুঃসাধ্য কর্মের জন্য তো বটেই, প্রতিবেশী গ্রামবাসী তথা দেশবাসী হাজার হাজার মানুষের নিরন্তর সেবায় চিকিৎসাব্রতী রঙ্গলাল সার্থক জীবনের দিগন্তকে আভাসিত করে পথচলার আলোকে চিরন্তন... তিনি আমাদের নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু সে স্মরণের ব্যবহারিক ব্যবস্থা কতটুকু? শিক্ষা আজ নগরচালিত, এবং নগরপালকদের অনেকটা সখের গবেষণার মতো; আর, সেবা ও, ঐ নৈর্বক্তিক ও মূলছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার ফলে, বর্তমানে অর্থের দাস। সেবাই মানুষকে চিহ্নিত করে, সেবাবুদ্ধি ছাড়া জীবনও অর্থহীন, সামাজিক-পরিণাম বর্জিত। প্রয়াত মনীষী ও সেবাব্রতী রঙ্গলালকে একটু বলিষ্ঠ ও ব্যবহারিকরূপে স্মরণমননের সুযোগ করে নিলে বিদ্যা-অবিদ্যার এই ভেদটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে পারে। নতুন করে এই দিকে যে উদ্যম রঙ্গলাল স্মৃতিসমিতি [লাভপুর, বীরভূম] দেখালেন, তাতে আমাদের প্রত্যেকের অকুণ্ঠ সহযোগ উচ্চারিত হউক আমাদেরই গুণবোধের পালা হিসাবে। আজকের পরিস্থিতিতে উদ্যম বা উদ্দীপনার মূল্য যদি আমরা দিতে পারি। আমাদের লজ্জার বোঝা কিছুটা নামবে, কর্তব্যের চেতনা কিছু বাড়বে।

মনকুমার সেন

গ্রামীন সাহিত্য সম্মেলন

২২শে শ্রাবণ, ১৩৯৫

কবি ভবন

মির্জাপুর, পোঃ রায়পুর, বীরভূম।

P. R / X erox / 465

P. G. MAITRA
B. Com., M. A. Dip-lib. Sc (Cal.)
Assistant Librarian,
Government of India,
National Library,
Calcutta-700027

Phone 45-5381
Residence
P 115, Bidhan Park,
Calcutta-700090

Dated 4. 1. 89

শ্রদ্ধেয় হক সাহেব,

আপনি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।······আপনি যে মহৎ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সার্থক হবে।

আমি আপনার অনুরোধে 182 qc, 879. 4 volume আবার stock থেকে আনিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু আমি খুবই দুঃক্ষিত এ বিষয়ে কিছু করা যাবে না। যদি হাতে লিখিয়া কিছু করিতে চান তবে হয়ত সম্ভব হতে পারে।···

আশা করি মাঝে মাঝে আপনার সাথে যোগাযোগ হবে। আপনার মত এইরূপ কর্মঠ মানুষ দীর্ঘজীবি হউক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

পাঁচুগোপাল মৈত্র

শ্যামনগর

২৫শে ফেব্রুয়ারী /৮৯ সকাল ন' টা

শ্রীসিরাজুল হক মহাশয়,

মাননীয়েষু,

আপনি আমাদের এখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় চলে গেলেন। তারপর আপনার কোন খবরাখবর আমি পাইনি। আপনার শারীরিক অবস্থাটা জানিয়ে একটা চিঠি দিলে আমার চিন্তা একটু লাঘব হয়।...আশা করি ইতিমধ্যে আপনার শারীরিক উন্নতি ঘটেছে এবং যে মহৎ কাজে আপনি ব্রতী হয়েছেন তা' আবার পূর্ণ উদ্যমে শুরু করেছেন। আপনার শুভ প্রচেষ্টার জন্য ৺ রঙ্গলালের উত্তরপুরিরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে। আপনি এ বয়সে আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রবাদকল্প পিতামহের স্মৃতিরক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্যে আপনাকে বিশেষ সাধুবাদ জানাচ্ছি।......ধন্যবাদ এবং নমস্কারান্তে—ইতি

শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ

প্রকাশক

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

২৫ এপ্রিল ১৯৮৮

জনাব সিরাজুল হক সমীপে,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১২ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হল বলে মার্জনা করবেন।

বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞানতপস্বী রঙ্গলাল সম্পর্কে আপনার উৎসাহের জন্য আপনাকে সাধুবাদ দিই, তাঁর রচনাবলী প্রকাশে সাহিত্য সংসদ উৎসাহিত হবে কিনা এখুনি বলা সম্ভব হচ্ছে না, তবে যদি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে পারেন আমি কর্তৃপক্ষ যাতে উৎসাহিত হন, নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখব।

এই চিঠি পেয়ে আপনি যেন নীরব হয়ে যাবেন না। আপনার বক্তব্য অবশ্যই জানাবেন।

আশা করি কুশলে আছেন। নমস্কার নেবেন। ইতি

গোলোকেন্দু ঘোষ

ইডেন বেসমেণ্ট কোয়ার্টার্স
মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল,
কলিকাতা-৭০০০৭৩.

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি ও সাহিত্যিক

সিরাজুল হক সম্মানণীয়েষু,—

আপনার চিঠি পেয়েছি ৩০।১১।৮৩ তারিখের বিকেলে। অথচ ঐদিনই সন্ধ্যা ৬-৩৮ মিনিটে আপনাদের প্রোগ্রাম। আপনার নিবিড় অন্তরঙ্গতার জন্য অন্য কোথাও যেতে পারিনি। বাসায় আমরা সকলে মনোযোগ সহকারে শুনেছি।

আপনার গ্রন্থনা যে অতি চমৎকার হয়েছে, তা' বলা-ই বাহুল্য। 'দাঁড়কা গ্রামের কথা'য় এত যে মূল্যবান ও অজানা কথা বলেছেন, তা' আপনি বলেই সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মিলনের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রাম যথেষ্ট অর্থবহ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের বিষয় যে সমস্ত তথ্য জানা গেল এবং পদ্মসুন্দরীর বিষয়টি-ও আমাদের কৌতুহল নিবারণ করল। হাজার বছরের পুরাণো গ্রাম দাঁড়কা গ্রাম। সেখানে তো ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থাকবেই। মসজিদের সংখ্যা জানলাম ৬টি, কিন্তু মন্দির ক'টি ছিল বা আছে, সে বিষয়ে বললে দুটো দিক সমানভাবে বলা হতো। আউল বাউলের রাঙামাটি বীরভূম। তার তুলনা তারই বুকে বাউলের উদাস গানে। ভাল লাগলো বাউল গানটি'—'মাঝি যখন নৌকায় চড়ে'। মুরশিদী গান 'রোজহাসরে তরাবে হাবিবুল্লাহ্'। শ্যামাসংগীত—'কালোর রূপে জগৎ আলো। এ-সব অপূর্ব হয়েছে। অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন ভালো। আপনার বলায় যে দীপ্ততা ও সংযত আবেগ ছিল, তা ভাষ্যকার হিসাবে নতুন করে আপনাকে স্বাগত জানাতে হয়। সেই স্বাগত ও অভিনন্দনই আপনাকে জানালাম প্রীতি ভালবাসা শ্রদ্ধার সংগে।

শ্রদ্ধান্তে
শ্রীমুন্সী
১।১২।৮৩

SANTOSH MUKHERJEE, M. SC., LL.B. PHONE : RESIDENCE : 29-9422
ADVOCATE 29-3977
OFFICE : 23-0135
"BIRLA BUILDING"
9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700 001

৫-৭-৮৮

মাননীয়েষু,

আপনার চিঠিতে ভুল ডাকঘর নম্বর থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গতকাল হাতে এসে পৌঁছেছে।

আপনারা, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি পালন উপলক্ষে কিছু প্রস্তাব নিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে এই মহাত্মার সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য অবগত নই। বীরভূমের মাটিতে বহু মহাত্মা জন্মেছেন ও আজও বর্তমান আছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরা শ্রদ্ধেয় হবার চেষ্টা করি।

বিশেষ করে বর্তমান পরিবর্তিত পল্লীসমাজে এই উদ্যোগ বহুজন প্রত্যাশা পুরণ করবে। অর্থের অনটন, সর্ব কালে সর্ব সমাজে সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার সম্ভাবনা রাখে। উদ্যোক্তাগণ যদি অন্তরে গভীর আবেগ নিয়ে লক্ষ্যের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারেন সব অন্তরায় অপসারিত হয়ে যায়। এইভাবেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

রঙ্গলালের সমাধি বৃত্তান্ত আমার মনে বিশেষ কৌতুহল জাগিয়েছে ; একবার দেখবার ইচ্ছা রইল।

* * *

রঙ্গলালের জীবনীর পাণ্ডুলিপি হলে দেখবার আগ্রহ রইল। তাঁর সাহিত্য রচনাগুলি কি সংগ্রহ করতে পেরেছেন ? যদি পেরে থাকেন তাও দেখার আগ্রহ আছে। তাঁর জীবন-সাধনা কোন নতুন জীব-ধর্মের মহত্ব প্রকাশ করেছে কি ? সংঘাতের বদলে সমন্বয় দ্বারা জীবের মুক্তি অথবা সিদ্ধিলাভ হয় এই ধরনের একটা আবছা ধারণা মনে বেধেছে।

কোন সময় সাক্ষাত হলে মনে হয় উপকৃত হব। আমার সাদর প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন ও তা আপনার সহকর্মীদের জানাবেন।

ইতি
বিনীত
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রী সিরাজুল হক্‌

বামনী গ্রাম

পোঃ লাভপুর

মহাশয়

আপনার ২২-২-৮৮ তারিখের পত্র পেলাম। আমার দ্বারা আপনাদের কিছু উপকারে লেগেছে জেনে সবিশেষ প্রীত হলাম। রঙ্গলালকৃত সাহিত্য সংকলন করবেন জেনে খুব ভালো লাগল। আপনি বা আপনার প্রতিনিধি কেউ এলে নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা পাবেন।

রঙ্গলাল বইগুলির পুনঃমুদ্রণ প্রয়োজন—কয়েকটি গ্রন্থাগার ছাড়া পাওয়াও যায় না।

বর্ত্তমানে আমার পারিবারিক ও অফিসের বিভিন্ন কাজের চাপের ফলে প্রবন্ধ পাঠাতে পারলাম না—আশাকরি এর জন্য কিছু মনে করবেন না।

প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

আরতি চট্টোপাধ্যায়

২৮।৮।৮৮

এল ১৪/১

শকুন্তলা হাউজিং, কলিকাতা-৬১

মাননীয়েষু

আমার সালাম জানবেন। আপনার শারীরিক সুস্থতার খবর পেয়ে চিন্তামুক্ত হলাম। এই বয়সেও সাহিত্য বিষয়ে আপনার যে আবেগ তা আশ্চর্যের। এরই জন্য আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনার মত ত্যাগী সমাজসেবী সমাজে বিরলপ্রায়।

আপনি যে দীর্ঘ প্রচেষ্টা নিয়ে বিশ্বকোষ প্রবর্তকের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে লিপ্ত আছেন তা' সত্যই প্রশংসনীয়। জানিনা এই সমাজ আপনার কী মূল্যায়ণ করবে। গুণের কদর করার মত গুণীজনের অভাব রয়ে গেছে সমাজে।

আপনার সাহিত্য সাধনার দ্বারা সমাজ উপকৃত হোক।...

আপনার স্নেহধন্যা

মনিরা খাতুন

১৩-১২-১৯৮৮

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতি

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ

সভাপতি : ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক : সিরাজুল হক

সদস্য :

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীনির্মলকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅরবিন্দ রায়

শ্রীঅধ্যাপক সুভাষ মহান্তি

মহঃ বদরুদ্দোজা মল্লিক

শ্রীমতী কল্যাণী রাণো

মহঃ নূরুল হুদা

শ্রীবসন্ত কবিরাজ

শ্রী মহাদেব দত্ত

শ্রী সুব্রতনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীআনন্দ পাল



পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনার্থে রঙ্গলালের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্রীসহ
ডানদিকের প্রথম স্থানে রঙ্গলাল স্মৃতি সমিতির অন্যতম সদস্যা ও সুলেখিকা শ্রীমতী কল্যাণী রাণো।



১৩৯৫ সালে ২৪শে আষাঢ় রঙ্গলালের জন্মদিনে লাভপুর হতে পদযাত্রীদের লাঘোষা গ্রামে
রঙ্গলালের সমাধিপাশে উপস্থিত। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

সংসদ প্রকাশিত

অভিধান গ্রন্থমালা

- **Samsad English Bengali Dictionary**
  শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত পরিবর্ধিত ৫ম্ সংস্করণ (৭৫·০০)
- **Samsad Bengali English Dictionary**
  শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সংশোধিত পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (৬০·০০)
- **সংসদ বাঙ্গালা অভিধান**
  শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ (৫৫·০০)
- **Samsad Students English Bengali Dictionary**
  শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত (২৭·৫০)
- **Samsad Students Bengali English Dictionary**
  গোলকেন্দু ঘোষ ও ডঃ শিবানী রায় সঙ্কলিত ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত সংশোধিত (২৫·০০)
- **Samsad Common Words Dictionary**
  অঞ্জলি বসু সঙ্কলিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী ইংরেজী অভিধান-২য় সংস্করণ (১৬·৫০)
- **বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—(দু' খণ্ডে)**
  জ্ঞানেন্দ্রমোহন সঙ্কলিত (প্রতি খণ্ড ১১০·০০)
- **সংসদ সমার্থ শব্দকোষ**
  অশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত-বাংলা ভাষায় থিসরাস-২য় সংস্করণ (৫৫·০০)
- **সংসদ ব্যাকরণ অভিধান**
  অশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত (যন্ত্রস্থ)
- **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**
  অঞ্জলি বসু সঙ্কলিত পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (৭০·০০)

হিন্দী সাহিত্যের অসামান্য কথাকার প্রেমচন্দের
ছোট গল্পের সাবলীল অনুবাদ আটটি খণ্ডে পড়ুন।

'গোদান'

এর অনুবাদ ও হিন্দী গ্রন্থের জন্য যোগাযোগ করুন।

কালজয়ী সারস্বত মহাজন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের
স্মরণ উৎসব উপলক্ষে প্রণাম জানাই

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

সভাপতি : পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন

লাভপুর, বীরভুম

বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪৭তম স্মরণোৎসবে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

প্রণব রায়

সভাপতি
লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি বীরভূম।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের
উদ্যোগে ঃ—



আধুনিক উন্নত মানের ঘানিদ্বারা, খাঁটি
সরিষার তৈল প্রস্তুত করেছে
বীরভূম জেলা পরিষদ।

এম আবদুর রহমান জাতির গর্ব। তাঁর
বই প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

তাঁর অমর গ্রন্থ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা ১৪্, ২য় সং এক লাইন

এম. আবদুর রহমানের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থ : ১. সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খান ১. সাত্তার স্মৃতিকথা ৩, নিয়াক্য রসুল সিরাজী ৪. বিদ্রোহী ফকির নায়ক মজনুশাহ ৫. শহীদবীর তিতুমীর ৬. স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রামী সপ্ত সাংবাদিক ৭. মনীষী মওলানা আকরম খানা ৮. স্বাধীনতা সংগ্রামী সপ্তবীর ৯. দেশপ্রেমিক কবি সাহিত্যিক

নজরুল বিষয়ক : ১০. কিশোর নজরুল ১১. ছোটদের নজরুল ১২. রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

কাব্য : ১৩. মহাত্মা গান্ধী ১৪. কারবালার বাণী ১৫. ফরিয়াদ ইতিহাস ও মহৎ জীবনকথা : ১৬. দাতা মহবুব শাহ ১৭. হুজরত কেরমানী ১৮. সুফি মহিলা তিন রাবেয়া ১৯. বীরাঙ্গণা কবি সরোজিনী নাইডু ২০. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ইতিহাস ২১. সেবক সাহিত্য সংসদের ইতিকথা ২২. পয়গম্বর প্রিয়া ২৩. বীরভূমির সিংহাসন (নাটক)। আরও কয়েকটি প্রকাশের পথে।

গল্পগ্রন্থ : এ মান্নাফের—হিসেব নিকেশ ১২্ সৈয়দ আবদুল বারির চৌরীগাছার মেয়ে ১২্

উপন্যাস : ইবনে ইমামের-পরিবর্তন ১০্ নুরুল ইসলাম মোল্লার দর্পণে আপন মুখ ১০্ জিতেনকুমার দাসের—ঝরাকুসুম ১৪্

ধর্মগ্রন্থ : এ. টি. এম. রফিকুল হাসানের ইসলামী জানবার কথা ১২.